প্রাচীন যুগের ইতিহাস লেখার নেপথ্য-কথা

শ্রীবিবস্বান 'আর্য'

পরিবেশক
বাসুদেব পাবলিশিং হাউস
১, বিধান সরণী, ব্লক ৫ ও ৬ জি
কলিকাতা—৭০০০৭৩

প্রকাশিকা
শোভা চট্টোপাধ্যায়
৬৭/২/১ কলেজ রোড,
বোটানিক্যাল গার্ডেন
হাওড়া-৩

প্রথম প্রকাশ—১৩৬৭

প্রাপ্তিস্থান :
মৌসুমী প্রকাশনী,
১এ কলেজ রো, কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ-পরিচিতি—
পৃথিবীর তিনটি প্রাচীন মানচিত্র। প্রাচীনকালের হেকাটাইয়ুস, এরাটোস্থেনিস ও টলেমির অঙ্কিত বলে প্রচারিত। উৎস : Science for the Citizen —by Lancelot Hogben

মুদ্রক :
শ্রীমনোমোহন পাল
বাসুদেব প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১, বিধান সরণী,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

উৎসর্গ

বাংলার বিদ্বৎসমাজকে

সূচীপত্র

প্রাচীন লিপি প্রসঙ্গ

প্রসঙ্গ : সিন্ধু-সভ্যতা

প্রসঙ্গ : বৈদিক সাহিত্য

সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনত্বের মিথ

কিছু সংযোজন

ভূমিকা

স্বনামধন্য কোনও পণ্ডিত ব্যক্তিকে দিয়ে বইয়ের ভূমিকা লেখানোর একটা রেওয়াজ চালু আছে। বিশেষ করে অপরিচিত লেখকেরা সে-রেওয়াজ মেনে নেন। মেনে নেন বৈষয়িক কিছু সুবিধার আশাতেই। বলে রাখা ভালো এ-বই সে-জাতের নয়। বস্তুত পণ্ডিতদের বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করার জন্যই এ-বই লেখার উদ্যোগ। তাঁদের শরণাপন্ন হওয়ার জন্য নয়।

ইতিহাস অন্বেষণের সূত্রে বেশ কিছু অপ্রীতিকর তথ্য সংগ্রহ করেছি। অপ্রীতিকর কারণ সে-সব তথ্য প্রচলিত ধ্যান-ধারণার পরিপন্থী। পরিপন্থী সযত্নলালিত বদ্ধমূল নানান সংস্কারেরও।

সুমহান সভ্যতাসংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হিসাবে ভারতের তথা ইতিহাসগর্বী সব দেশের ঐতিহ্যবিলাসী পণ্ডিতদের অতীত সম্পর্কে গর্ব-বোধের শেষ নেই। অতীত সম্পর্কে কম গালভরা কথা তাঁরা লেখেননি। ধর্মীয় চিন্তার শাশ্বত অবদান কিংবা রাষ্ট্র সম্পর্কে দুনিয়ার প্রাচীন সব মনীষীর চিন্তাভাবনা নিয়ে ওঁরা কম গবেষণা করেননি। গবেষণা কম করেননি প্রাচীন সব ভাষা সম্পর্কে। গবেষণা কম করেননি প্রাচীন যুগের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনা তথা অবস্থা সম্পর্কেও। বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার নামে এঁরা সকলেই কিন্তু একই পথে ঘোরাফেরা করেছেন। ভাববাদী, বস্তুবাদী এমনকি মার্ক্সবাদী পণ্ডিতদেরও কেউই ঐ ঐতিহ্যাবগাহন মানসিকতা থেকে মুক্ত ছিলেননা—মুক্ত নন। মৌর্যযুগে ধান চাষের আগে সিম চাষের প্রাচীম কাহিনী পড়ে মার্ক্সবাদী পণ্ডিতও উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন। নাইট্রোজেন-আত্মীকরণের তথ্যটা আদ্যিকালের ভারতীয়দের জানা ছিল —এই তথ্য 'আবিষ্কার' করে তিনিও কম উল্লসিত হননি। আসলে বানানো অতীতের চর্বিতচর্বণের মধ্য দিয়ে ঐতিহ্যাবগাহী পাণ্ডিত্যের

আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। আত্মপ্রকাশ ঘটেছে কারণ প্রাচীন যুগের *ইতিহাসকে পণ্ডিতেরা সকলেই* প্রামাণ্য বলে মনে করে বসেছেন। প্রাচীন সব ভাষা—প্রাচীন সব লিপি—প্রাচীন সব ধর্ম—প্রাচীন সব সভ্যতার বানানো ইতিহাসটাকে ওঁরা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করে নিয়েছেন বলেই। ঐ 'ইতিহাস' প্রামাণ্য কিনা তা বিশ্লেষণ করেছি। বিশ্লেষণ করেছি ঐ 'ইতিহাস' রচনার পশ্চাতে অবস্থানকারী নেপথ্য পণ্ডিতদের ক্রিয়াকাণ্ড। বিশ্লেষণ করেছি ঐ 'ইতিহাস'-রচনার বিরাট কর্মযজ্ঞ পরিচালনার নেপথ্য প্রযোজকদের ভূমিকা। সে-বিচারে ভুলচুক কিছু হয়েছে কিনা—তা পাঠকদের বিবেচনার জন্যই রাখছি। তথ্য যা কিছু পেয়েছি তা অকুণ্ঠভাবেই জানাবার চেষ্টা করেছি। সেসব তথ্য গ্রহণযোগ্য কিনা তা পাঠকবর্গই স্থির করবেন। তবে একটা কথা স্বীকার করে নেওয়া ভালো। পণ্ডিতদের দীর্ঘদিনের নিরলস প্রয়াসে এবং নানান রাষ্ট্রের প্রচারমাধ্যমের কল্যাণে বেশ কিছু ধ্যান-ধারণা শিক্ষিত জনমানসে পোক্ত হয়ে বসে আছে। বসে আছে জগদ্দল পাথরের মত। সে-অচলায়তন একা আমার পক্ষে সরানো সম্ভব কিনা জানিনা। তবে চেষ্টা করতে ক্ষতি কি ?

অতীতে সমুদ্রমন্থন করে আদৌ কোনও অমৃত উঠেছিল কিনা কিংবা ওঠা সম্ভব ছিল কিনা জানি না তবে আধুনিককালে অতীত মন্থন করার অভিনয় করে 'প্রাচীন যুগের ইতিহাস'-নামক 'অমৃত' যে তৈরী হয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। অতীতে অমৃত নাকি মানুষকে অমর বানাতো। আধুনিক ঐ 'অমৃত' নিজেকেই অমর বানিয়েছে। অর্থাৎ ঐ ইতিহাসটাকেই। প্রাচীন যুগের অর্বাচীন ইতিহাসটা বেঁচে আছে। বেঁচে আছে অক্ষয় আয়ু নিয়ে। মৃত্যুর লক্ষণ নেই। ইতিহাসের পণ্ডিত, ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিত, দর্শনের পণ্ডিত আর ধর্মের পণ্ডিতদের যৌথ প্রয়াস ঐ ইতিহাসটাকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বেঁচে থাকার অধিকার কি সত্যিই ঐ ইতিহাসের আছে ? এই প্রশ্নটাই এ-বইয়ের আলোচ্য।

নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পাঠকবর্গ আমার বিচার-বিশ্লেষণ অনুধাবন করবেন এইটুকুই প্রত্যাশা।

ব্যক্তিগত আর্থিক সামর্থ্যের কথা চিন্তা করে বইটা পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ করতে পারিনি বলে দুঃখিত। আপাততঃ অংশত প্রকাশ করছি। বাকি অংশ পরে প্রকাশ করব।

পণ্ডিতেরা এতদিন উল্টোপুরাণ শুনিয়ে এসেছেন। সোজা পুরাণটা সকলের সহ্য হবে কিনা জানিনা। তবে ভরসা এই আজকের বাঙ্গালী পাঠক যথেষ্ট সংস্কারমুক্ত। ঐতিহ্যবিলাসী বেদবেদান্তনির্ভর কিংবা বাইবেল-কোরান-পুরাণ-ত্রিপিটকবিশ্বাসী ধর্মধ্বজী সংস্থাগুলোর আবেদন মানসিক নিম্নবিত্তদের মধ্যেই সীমিত। শিক্ষিতসমাজে তা নিঃসন্দেহে ক্ষীয়মাণ। এবং সেইটুকুই ভরসা।

গ্রন্থপঞ্জী (১ম অংশ)

Corpus Inscriptionum Indicarum—
Inscriptions of Asoka—E. Hultzch (ed.)
Kharosti Inscriptions—S. Know (ed.)
Epigraphia Indica—Various editors
The Purana Text of the Dynasties of the Kali Age—F. E. Pargiter
Kautilya's Arthasastra—Ed. R. Shamasastry
Bharatiya Lipimala (in Hindi)—G. S. Ojha
History of Civilization of Ancient India —R. C. Dutt
Tamil Epigraphy—A Survey —N. Subrahmanian & R. Venkatraman
The Script of Harappa and Mohenjo daro —G. H. Hunter
New Light on the Most Ancient East —V. Gordon Childe
The Indus Civilization—Sir R. E. Mortimer Wheeler
Mohenjo Daro and the Indus Civilization —Sir J. Marshall
History of Sanskrit Literature —A. A. Macdonell
History of Sanskrit Literature—A. B. Keith
History of Indian Literature—M. Winternitz Translated by S. Kelkar

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস হিসাবে আজ পর্যন্ত যা কিছু লেখা হয়েছে তার পুরোটাই মিথ্যা। সত্যের ছিটেফোঁটাও ঐ 'ইতিহাসে' নেই। যদিও ভারতের প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ 'ইতিহাস' গুরুত্ব দিয়েই পড়ানো হয়—যদিও দেশীবিদেশী দিকপাল সব ঐতিহাসিক প্রচণ্ড পরিশ্রম স্বীকার করেই ঐ ইতিহাস লিখেছেন তবু বলব ওটা ইতিহাসই নয়—বানানো গল্প। এবং সর্বৈব মিথ্যা। গবেষকেরা ঐ বিষয়ের ওপর যেসব গবেষণা করে ডক্টরেট পেয়ে আসছেন সে সবই ভ্রান্তিবিলাস। আর কিছুই নয়। আসলে প্রচণ্ড একটি মিথ্যার বেসাতির নাম ঐ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস। তথ্যপ্রমাণের বহর আছে—শিলালিপি, প্রত্নমুদ্রা, তাম্রফলক, স্থাপত্যনিদর্শনের অভাব নেই। লিখিত নজীর দেখানোর ব্যবস্থাও পাকা। বিদেশী পর্যটকদের বিবরণীও কিছু কম নেই। ইতিহাসের উপাদানসমৃদ্ধ উৎসগ্রন্থও সুপ্রচুর। সবই মজুদ, তবু বলব সবই মিথ্যা এবং এর চেয়ে বড় মিথ্যা হয় না। বলব কারণ সে প্রমাণ পেয়েছি। ঐ ইতিহাস তৈরীর পেছনে যে কি বিরাট চক্রান্ত কাজ করেছিল তার হদিশ পাওয়া গেছে। তথ্যপ্রমাণ দেওয়ার জন্যই এই বই লেখার প্রয়াস।

মোটামুটি খ্রীস্টপূর্ব সাড়ে ছ' শ' অব্দ থেকে এক হাজার খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কালপর্ব ভারতেতিহাসের প্রাচীন যুগ বলে চিহ্নিত। অত্যুৎসাহীদের কাছে 'হিন্দুযুগ' হিসাবে পরিচিত এই যুগের রাজনৈতিক ঘটনাপরম্পরা, সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা, দার্শনিক বা ধর্মীয় চিন্তাভাবনা তথা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রসঙ্গে ঐ ইতিহাসে যা কিছু পরিবেশিত হয়েছে তার সবটাই অনৈতিহাসিক। সবটাই কল্পিত। আসলে সুপরিকল্পিত একটি গল্পকে ইতিহাস বলে প্রচার করা হয়েছে। এবং আমরা সেই গল্পকে ইতিহাস মনে করে আনন্দ পেয়েছি। এই হচ্ছে ঘটনা। সুসংগঠিত সুসংহত প্রয়াসের মাধ্যমে তৈরী করা ঐ গল্প লেখার পেছনে যেসব মিথ্যার চক্রী নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন তাঁদের কেউ সনাক্ত করতে পারেননি এইটাই আশ্চর্যের।

সর্বৈব মিথ্যা ঐ গল্পের কয়েকটা মিথ্যার নমুনা দিয়েই শুরু করা যাক। প্রাচীন কালে বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ, সূত্র, ধর্মশাস্ত্র, জ্যোতিষ-শাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ এ সবের কিছুই রচিত হয়নি। যদিও ঐ ইতিহাস বলছে ঐসব বইয়ের বেশীর ভাগই প্রাচীন কালে লেখা। কিছু আবার প্রাগৈতিহাসিক যুগে 'রচিত'। ও-সব কবে লেখা হয়েছে সে প্রশ্নে পরে আসছি। প্রাচীন কালে চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, কণিষ্ক, হর্ষবর্ধন, সমুদ্রগুপ্ত ইত্যাদি নামের কোনও রাজা ছিলেনই না—যদিও ইতিহাস ঐ সব নামেরই নামাবলী। ছিল না মৌর্য, কুশান, গুপ্ত ইত্যাদি হরেক নামের সাম্রাজ্য—যদিও ঐ সব সাম্রাজ্যের উত্থান আর পতনের গল্পটাই ইতিহাসের অনেকখানি দখল করে বসে আছে। ছিলনা কপিলাবাস্তু, কেরলপুত্র, পাটলিপুত্র, কৌশাম্বী, শ্রাবস্তী নামের কোনও জনপদ। যদিও শ্রুতিসুখকর ঐ সব নাম জড়িয়ে কবিতাও কিছু কম লেখা হয়নি। সংস্কৃত সাহিত্যের জন্মই তখনও হয়নি। হয়নি প্রাকৃত পালি কোনও সাহিত্যেরই। ছিলনা ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, গ্রন্থ ও ওয়াত্তেলুত্তু নামক কোনও লিপি—যদিও এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকার খণ্ডগুলো ঐ সব লিপিতেই বোঝাই। আসলে কোনও লিপিরই জন্ম তখনও হয়নি। ষড়দর্শনও ঐ প্রাচীন যুগে লেখা হয়নি—যদিও ইতিহাসে ঐ দর্শনের খণ্ডনমুণ্ডন সম্পর্কে অনেক তথ্যই পরিবেশিত হয়েছে। আর্যভট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্তরাও ছিলেন না ঐ যুগে—যদিও এঁদের জ্ঞান-সাধনার বিবরণে ঐ ইতিহাস উজ্জ্বল। হিন্দুধর্মের জন্মও তখনও হয়নি। হয়নি বৌদ্ধ জৈন কোনও ধর্মেরই। হিন্দুধর্মকে যাঁরা সনাতন ধর্ম মনে করে আত্মশ্লাঘা বোধ করেন তাঁরা কিছুটা ক্ষুব্ধ হবেন। সংস্কৃত ভাষার সুপ্রাচীনত্ব সম্পর্কে যাঁরা নিঃসন্দিগ্ধ তাঁরাও হয়ত ক্ষুণ্ণ হবেন। হওয়াটা বিচিত্রও কিছু নয় কারণ পুষে রাখা ধারণার ভিত ধ্বসে পড়লে ক্ষোভের কারণ ত ঘটেই। তবে মজার কথা এই যে সত্য প্রকাশ হয়েই পড়ে। কেউ না চাইলেও। মনঃপুত হওয়ার দায় ঐ ইতিহাসের থাকতে পারে—সত্যের নেই।

মোহমুক্ত দৃষ্টি নিয়ে ইতিহাস অন্বেষণের সূত্রেই সত্যের সন্ধান পেয়েছি। ধর্ম সম্পর্কে কোনও রকম মোহ রেখে ইতিহাস বোঝার চেষ্টা অর্থহীন। অর্থহীন কারণ ঐ ইতিহাসে সুপরিকল্পিত ভাবেই ধর্মের প্রাচীন প্রচলনের গল্প লেখা হয়েছে। লেখা হয়েছে সভ্যতা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঐ ধর্মের প্রচণ্ড অবদানের গল্পটাও। ধর্ম সম্পর্কে কিছুমাত্র দুর্বলতা পুষে রেখে ঐ গল্পগুলোকে সনাক্ত করা যায় না। খ্যাতনামা পণ্ডিতদের বক্তব্যকে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়ে এগুতে গেলেও মুশ্‌কিলে পড়তে হয়। কারণ সত্যিকথা বলতে কি ইতিহাসের পণ্ডিতেরা ছদ্মবেশে এস্‌টাব্লিশমেণ্টেরই অংশ। এবং অংশ বলেই রাষ্ট্রের তৈরী করা ইতিহাসের কাঁচা মালের প্রামাণ্যতা সম্পর্কে এঁরা এতটা আস্থাশীল। এঁদের ওপর নির্ভর করতে গেলে এগুনো যায় না। ঘুরপাক খেতে হয়। মিথ্যার চারদিকে আবর্তন করতে হয়। কেন্দ্রে পৌঁছনো সম্ভব হয় না। সম্ভব হয় না জেনেই এঁদের সম্পর্কে কোনও মোহ পুষে রাখিনি। নিজের বিচারবুদ্ধির ওপর আস্থা রেখেই এগোবার চেষ্টা করেছি। সে চেষ্টায় সফল হয়েছি কিনা সেটা বিচারের দায়িত্ব পাঠক সমাজের ওপরেই রাখছি।

মিথ্যার অনেক মজা

মিথ্যার অনেক মজা। মিথ্যাকে বিরাট হতে হয়। বিরাট বানাতে হয়। মিথ্যার ডালপালা গজায়। ডালপালা গজানোর ব্যবস্থা করতে হয়। ঝাঁকড়ামাথা মিথ্যাকে সত্যের মহীরুহ বলে প্রচার করার অনেক সুবিধা। মিথ্যাকে বেঁচে থাকতে হলে বিরাট কলেবর নিয়েই বাঁচতে হয়। কলেবর যত বড় হয় বিশ্বাসযোগ্যতা ততটা বেড়ে যায়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নামক মিথ্যাটা বেঁচে আছে কারণ এটা একটা বিরাট মিথ্যা। বিরাট কলেবর। অসংখ্য ডালপালা। এর বিরাটত্বের স্বার্থে প্রতিবেশীত বটেই এমনকি দূরবর্তী বেশ কিছু দেশের নাম জড়িয়েও গল্প লেখার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। সুদূর গ্রীস থেকে 'আলেকজাণ্ডার'কে

ভারতে আসতে হয়েছিল। আসতে হয়েছিল সুদূর চীন থেকে 'ফা হিয়েন', 'হিউ-এন্ সাঙ', 'ইৎ-সিং' দের। 'ইবন বতুতা', 'আলবেরুনি' দেরও ভারতপর্যটনে আসতে হয়েছিল। আসতে হয়েছিল ঐ ইতিহাসের ডালপালা বাড়াতে। কলেবর বাড়াতে। মিথ্যার প্রমাণ রাখতে হয় পর্বতপ্রমাণ। আর ঐ পর্বতপ্রমাণ 'প্রমাণ' থেকেই সত্যকে বার করে নিতে হয়। ঐ 'প্রমাণের' অসারত্ব প্রমাণ করে—অসংগতিটাকে তুলে ধরে—আর ঐ 'পর্বত' বানানোর নেপথ্য শিল্পীদের সনাক্ত করেই পাওয়া যায় সত্যের সন্ধান। সে সত্য মোটেই বিরাট আকৃতির কিছু নয়। ছোট্ট একটি বাক্যেই তা প্রকাশ করা যায়—প্রাচীন ভারতের ইতিহাসটা আদ্যন্ত মিথ্যা একটি কাহিনী।

মিথ্যার ডালপালা বাড়ালেই কাজ শেষ হয় না। শেকড়বাকড়েরও দরকার হয়। মিথ্যাটাকে পোক্ত সত্য করে তুলতে ঐ শেকড়ের ভূমিকাও কম নয়। শেকড়ের কাজ করে ধর্ম। 'কালেক্‌টিভ আনকন--সাসে' ধর্মের আবেদনটা খুবই বেশী, আর তাই ঐতিহাসিক সব মিথ্যার সঙ্গে ধর্মের মিশেল দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। কল্পিত অশোকের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের নাম জড়ানোর ব্যবস্থা হয়। প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাসে বহুদেববাদী ধর্মের প্রচলনের গল্প তৈরী করতে হয়। এতে মিথ্যাটা পবিত্র হয়ে ওঠে। মিথ্যাটা পোক্ত সত্য হয়ে ওঠে। ধর্ম সম্পর্কে মানুষের দুর্বলতা অপরিসীম। ধর্মের নামে যে কোনও মিথ্যা বাঁচিয়ে রাখা যায়। এবং রাখা যায় বলেই ঐতিহাসিক মিথ্যার আন্তর্জাতিক কারবারীরা ইতিহাসের সঙ্গে ধর্মের ভেজাল দেওয়ার ব্যবস্থাটা একটু বেশীমাত্রাতেই করে রেখেছেন।

অনেকে প্রশ্ন করে বসবেন মিথ্যার তত্ত্ব নিয়ে কেন পড়লাম। এর প্রয়োজন আছে বৈকি। সুসংগঠিত সুসংহত মিথ্যার চরিত্রলক্ষণ নিয়ে কিছু আলোচনা আগেই সেরে রাখা ভালো। মিথ্যাকে বিরাট বিশাল বানানোর সার্বদেশিক আয়োজনের স্বরূপ বুঝে নিতে সুবিধা হবে বলেই বক্তব্যটা রাখলাম।

মিথ্যার অষ্টোত্তর শতনাম। অস্তিত্বহীনের নামের বহর থাকে। যিনি কস্মিনকালেও ছিলেন না তাঁর নামের বৈচিত্র্য দেখবার মত। শ্রীচৈতন্য, গৌরাঙ্গ, নিমাই—একই 'অঙ্গে' কত নাম! এছাড়া 'অমুক রাখিল নাম তমুক-নন্দন'-মার্কা সাতাশ গণ্ডা নামের বন্যা বইয়ে দিলে ত' কথাই নেই। ভূতুড়ে নামের মালিকের অস্তিত্বের ষোলো আনা প্রমাণ তৈরী হয়ে গেল। মিথ্যার কারিগরদের বাহাদুরী আছে বৈকি! মিথ্যার অষ্টোত্তরী শতনামের লীলাখেলা কি তাঁরা কম দেখিয়েছেন? একশ' আট খানা উপনিষদ, বিশখানা স্মৃতি ,আঠারো দুগুণে ছত্রিশ খানা পুরাণ—বইপত্র কি তাঁরা কম বানিয়ে নিয়েছিলেন? সংখ্যার ব্যাপারে সত্যিই যে তাঁরা 'সাংখ্যতীর্থ' হয়ে উঠেছিলেন —এটা বলার দরকারই পড়ে না। আর ঐ সংখ্যার বিশালত্ব দেখে পণ্ডিতেরা চমকে গেলেন! অতগুলি বই কি মিথ্যা হতে পারে? অতগুলি বইয়ের সবই যে কারসাজি এটা বিশ্বাস করতেও যে কষ্ট হয়। পণ্ডিতেরা সবই বিশ্বাস করে বসলেন।

ভাবতে অবাক লাগে প্রাচীন ভারতের তৈরী করা ইতিহাসকে ভিত্তি করে পণ্ডিতেরা কত তত্ত্বই না লিখেছেন। কত পণ্ডশ্রমই না করেছেন। কেউ বৈদিক সাম্যবাদের গল্প শুনিয়েছেন—কেউবা কীর্তন করেছেন উপনিষদের সেই আরণ্যক সংস্কৃতির মহিমার কথা। কেউ ইতিহাসের দর্শন লিখেছেন —কেউ আবার বানানো অতীতের অর্থনৈতিক ছবি থেকে মানুষের অর্থনীতির ক্রমবিকাশের তত্ত্বও খাড়া করেছেন। কেউ বা নেপথ্য পণ্ডিতদের কল্পিত সুপ্রাচীন ভাষাকে ভিত্তি করে নানান ভাষা-তাত্ত্বিক তত্ত্বও তৈরী করে নিয়েছেন। এঁদের পরিশ্রমের প্রশংসা করতেই হয়। সহজ সরল বিশ্বাসে ইতিহাসের কাঁচা মালকে আগ-মার্কা ভেবে এঁরা প্রচণ্ড পরিশ্রম যে করেননি—তা নয়। ভস্মে ঘি ঢালার কাজটা ভালোই হয়েছে। কাজের কাজ কিছু হোক আর না হোক ধূম্রজাল যে সৃষ্টি হয়েছে তা মানতেই হয়। আর ঐ ধূম্রজালকেই পাণ্ডিত্যের বহিঃপ্রকাশ মনে করে অনেকে পুলকিত হয়েছেন। পুলকিত

হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। দরাজ হাতে ডক্টরেট বিলি করার মধ্য দিয়ে সে পুলকের প্রকাশ ঘটেছে।

বিরাট বিশাল মিথ্যার পুরো প্রমাণ এ-বইয়ের ক্ষুদ্র পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়। আংশিক প্রমাণ দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে প্রয়াস। বাকি প্রমাণ থাকবে এ-বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে। ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ বলে প্রচারিত বেদউপনিষদের প্রাচীনত্বের 'মিথ'টার স্বরূপ উদঘাটন-প্রাচীন লিপিগুলোর উদ্ভাবনরহস্য প্রকাশ এবং সংস্কৃত (তথা পালি—প্রাকৃত) ভাষাগুলোর ওপর প্রাচীনত্ব আরোপের খেলার পরিচয় থাকবে এই খণ্ডে। এ ছাড়া হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর তথাকথিত প্রাগার্য সভ্যতা 'আবিষ্কারে'র পিছনে যে কারসাজি ছিল—যে প্রচণ্ড মিথ্যা ঐ 'সিন্ধুসভ্যতা' সম্পর্কে পণ্ডিতেরা পরিবেশন করেছেন—তার পরিচয়ও এ-বইয়ে থাকবে। ইতিহাসের উৎসগ্রন্থগুলো রচনার পিছনে যে কত বড় প্রতারণা তঞ্চকতা কাজ করেছে তা দেখাব দ্বিতীয় খণ্ডে। বেদাঙ্গ, জ্যোতিষ, স্মৃতি, পুরাণ, রামায়ণ. মহাভারত, 'সুপ্রাচীন' সাহিত্য, ষড়দর্শন এবং সুপ্রাচীন 'বিজ্ঞান' সম্পর্কে আলোচনা থাকবে দ্বিতীয় খণ্ডে।

ইতিহাসের প্রামাণ্যতা সম্পর্কেই আগে আলোচনা করব। বেদ-উপনিষদ তথা প্রাচীন সাহিত্যের ঐতিহাসিকত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে পরে। ইতিহাসের নামীঅনামী রাজারাজড়ার নামধাম বা কীর্তিকলাপের বিবরণ দেওয়ার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। কারণ ঐ ইতিহাসটা কিছু সত্য এবং কিছু মিথ্যার সংমিশ্রণ নয়। ওটা অবিমিশ্র মিথ্যা। কোন নামের ওপর ব্যক্তিসত্তা আরোপ করার প্রশ্নই ওঠে না। আসলে মিথ্যা বানাতে গিয়ে কাল্পনিক চরিত্র গড়া হয়েছিল অনেক। চরিত্রগুলোর 'কাউকে' দিগ্বিজয়ী সাজানো হয়েছিল—'কাউকে' ধর্মের পৃষ্ঠপোষক বানানো হয়েছিল। আবার 'কাউকে' জ্ঞানীগুণীদের তোয়াজ করার ভূমিকায় রাখা হয়েছিল। অসংখ্য সব চরিত্র—বিচিত্র সব কাণ্ড-কারখানা। 'কাউকে' অত্যাচারী বানানো হয়েছিল—'কাউকে' প্রজাবৎসল সাজানো হয়েছিল। সবই রাখা হয়েছিল ঐ ইতিহাসে। সবই বানানো

—সবই তৈরী করে নেওয়া। সব মিলিয়ে সর্বাঙ্গ সুন্দর নিটোল একটি মিথ্যা গড়ে উঠেছিল—নাম প্রাচীন ভারতের ইতিহাস। ঐ ইতিহাসের কাঁচা মালের প্রামাণ্যতা সম্পর্কেই আলোচনাটা সীমাবদ্ধ রাখব। ঐসব কাঁচা মাল খাঁটি কিনা বিচার করব। আর ঐ সম্পর্কে কারসাজি কিছু করা হয়েছিল কিনা—উৎসগ্রন্থের মধ্যে প্রতারণা কি মাত্রায় করা হয়েছিল—এইটাই জানাবার চেষ্টা করব। ইতিহাসটাকে নস্যাৎ করতে ঐ কাঁচামাল-সম্পর্কিত আলোচনাটাই যথেষ্ট। গুপ্ত-বর্ধন-কনিষ্ক-হুবিষ্কদের প্রসঙ্গটা নেহাৎ-ই অপ্রাসঙ্গিক।

ইতিহাসের কাঁচা মাল

প্রাচীন ইতিহাসের কাঁচা মাল বলতে কি বোঝায়? প্রাচীন শিলালিপি, তাম্রফলক, মুদ্রা, স্থাপত্যনিদর্শনের মধ্যে প্রাপ্ত লেখ এবং প্রাচীন পুঁথি এই সবই বোঝায়। ভারতে প্রত্নলেখ যা কিছু পাওয়া গেছে তা সবই ঐ ধরণের। প্রাচীন পুঁথি হয়না। পুরানো যুগে 'রচিত' বলে প্রচারিত গ্রন্থগুলোকে উৎসাহের আধিক্যে এত প্রাচীন যুগে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে যেযুগের পুঁথি আজকের দিনে খুঁজে বার করার প্রশ্নটাই আজগুবি। আজগুবি কারণ পুঁথি লেখার এমন কোনও উপকরণ হয় না যা দীর্ঘ দু-তিন হাজার বছর অক্ষয় অস্তিত্ব নিয়ে থাকতে পারে। শিলালিপিও দু-তিন হাজার বছর অক্ষত থাকার কথা নয়। থাকার কথা নয় তাম্র ফলকেরও। কারণ সে-যুগে তামা থাকার প্রশ্নটাই ছিল আজগুবি। আজগুবি ধাতব মুদ্রা থাকার প্রশ্নটাও। অথচ মজার কথা এই যে পণ্ডিতেরা এইসব আজগুবি কাণ্ডকারখানাকেই ইতিহাসের কাঁচা মাল বলে মেনে নিয়েছেন। মেনে নিয়েছেন নির্দ্বিধায়।

সন্দেহ করার মতন আরও কিছু ব্যাপার ছিল। শিলালিপিগুলো যে সব অঞ্চলে পাওয়া গেছে বলে প্রচার করা হয়েছে তা সবই দুর্গম দুরধিগম্য। ব্যাপারটাকে কেউ সন্দেহ করেননি। যদিও করা উচিত ছিল। জনগণের বিজ্ঞপ্তির জন্য অমুক রাজা শিলালিপি বানিয়ে নেওয়ার

ব্যবস্থা নিলেন আর ওগুলোকে রাখার আয়োজন করলেন এমন সব জায়গায় যেখানে জনমনিষ্যির যাতায়াতই ছিল না। এমন কাণ্ড হল কেন? এ-সব প্রশ্ন কেউ-ই তোলেননি।

প্রশ্ন আরও আসছে। ঐ ধরণের সন্দেজনক 'প্রত্নলেখ'-সমন্বিত কাঁচা মাল গুলোকে সংগ্রহ করতেন কারা? কারাই-বা ঐসব নিদর্শনের ফটো তুলে বিপুলায়তন বই লেখার আয়োজন করতেন? সন্দেহজনক ঐ কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ার টাকাপয়সা আসত কোত্থেকে? টাকা জোগাতেন ব্রিটিশ সরকার। কিন্তু কেন? কোন মহান উদ্দেশ্য কি ঐ কাজের পিছনে ছিল? বিপুলায়তন ঐ বইয়ের নামটাই বা কি? এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা। ঐ এপিগ্রাফিয়া সম্পর্কে কিছু আলোচনা সেরে রাখা যাক।

এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা

'এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা'র বিপুলায়তন খণ্ডগুলোর গুরুত্ব ইতিহাসের উৎসগ্রন্থ হিসাবে সবচেয়ে বেশী। ওগুলো নাকি ইতিহাসের বেদ। বেদের মতই পবিত্র—বেদের মতই প্রামাণ্য। এপিগ্রাফিয়ার ওপর নির্ভর করেই ইতিহাস রচিত হয়। দেশীবিদেশী সব গবেষককে ঐ 'মহাভারত' থেকেই মালমসলা জোগাড় করে নিতে হয়। ওর বাইরে যাওয়ার উপায় নেই। আর ঐ বইয়ের তথ্যসম্পর্কে সন্দেহ করাটাও রীতিবিরুদ্ধ। এবং রীতিবিরুদ্ধ বলেই পণ্ডিতেরা অম্লানবদনে ঐ আকরগ্রন্থের সব কিছুই বিশ্বাস করে বসেন। না করে উপায়ও নেই। কারণ ঐ গ্রন্থকে অস্বীকার করে ইতিহাস লিখলে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডিত্যের আসরে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। এখন প্রশ্ন হল: পবিত্র ও প্রামাণ্য ঐ উৎসগ্রন্থগুলো লিখতেন কারা? প্রাচীন লিপি সংগ্রহ করে সম্পাদনা করতেন কারা? কারা-ইবা ঐসব নিদর্শনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতেন? সালতামামি আরোপ করতেন কারা? তথ্যদৃষ্টে দেখা যাচ্ছে ঐ এপিগ্রাফিয়ার সঙ্গে যাঁরা জড়িত

থাকতেন তাঁরা দিকপাল পণ্ডিত হিসাবে পরিচিতি লাভ করতেন। তাঁদের পাণ্ডিত্যের গভীরতা নাকি প্রশ্নাতীত ছিল। এবং প্রশ্নাতীত ছিল বলেই কিনা জানিনা তাঁদের মধ্যে অনেক রায়বাহাদুরের সন্ধান মিলছে। বলে রাখা ভালো ঐ খেতাবটা ব্রিটিশ সরকারের নানা অভিসন্ধির সঙ্গে জড়িত ভদ্রলোকেরাই পেতেন। এ ছাড়া জড়িত থাকতেন নামী-অনামী আই সি এস আমলারা। ভাবতে অবাক লাগে এইসব আমলারা একদিকে শাসনের নামে শোষণের স্টীমরোলার চালাতেন, অন্যদিকে আমাদের উজ্জ্বল অতীতের সুমহান ঐতিহ্যের ছবি নিরলসভাবে এঁকে যেতেন। আরও মজার কথা ঐসব 'জেনারালিস্ট'রা (পল্লবগ্রাহী ?) অবলীলায় আর্কিয়লজির 'স্পেশালিষ্ট' সেজে বসতেন। এমন পণ্ডিতি কায়দায় তাঁরা লিখতেন যে অবিশ্বাস করার যো থাকত না। সত্যিই বুঝি তারা শাস্ত্রটিতে বিশেষজ্ঞ। একদা-প্রশাসক-পরবর্তীকালে-ভোলপাল্টে-প্রত্নতাত্ত্বিক-সেজে-বসা পণ্ডিতদের কেউ সনাক্ত করতে পারেননি এইটাই আশ্চর্যের। এঁদের সততায় পূর্ণ আস্থা রেখেই আমাদের ঐতিহাসিকেরা ইতিহাস লিখেছেন। এবং সেইজন্যই বিপত্তিটা ঘটেছে।

কিছু রায়বাহাদুর বা আমলা ছাড়া কিছু অমুক চন্দ্র তমুক বি. এ-ও ছিলেন ঐ এপিগ্রাফিয়া লেখার কর্মকাণ্ডে জড়িত। তাঁরাও বেশ কিছু প্রত্নলিপির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। দিয়েছেন বেশ মাতব্বর সেজেই। এপিগ্রাফিয়ায় এঁদের লেখা কম নেই। ভাবতে অবাক লাগে ঐসব 'প্রত্নতাত্ত্বিক'দের লেখার ওপর ভিত্তি করে তত্ত্ব তৈরী করেছেন নামী ঐতিহাসিকেরা সবাই। না করে নাকি উপায় ছিলনা। বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি পেতে গেলে যে ঐসব 'বিশেষজ্ঞ'-দের সিদ্ধান্ত মেনে নিতেই হয়। ইতিহাস নামক চক্রান্তের জাল যে বিশ্বজোড়া। আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ইতিহাস বিভাগ যে ঐ জালেরই অংশ। রাষ্ট্র ইতিহাসের ভূতুড়ে উপকরণ বানিয়ে রাখবে আর ঐ উপকরণভিত্তিক ইতিহাসের পঠন পাঠনের ব্যবস্থা রেখে বিশ্ববিদ্যালয়-

গুলো মিথ্যার ধারক ও বাহক সেজে বসে থাকবে—এইটাই যে দস্তুর। এর ব্যত্যয় হওয়ার যে যো নেই। রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিথ্যাটাকে চাউর না করে রাখলে যে মিথ্যার জোর কমে যায়। তাই ঐ ব্যবস্থা। তাই 'ট্র্যাডিশন' বেঁচে আছে। বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। রাখা হয়েছে রাষ্ট্রের সুস্পষ্ট নির্দেশে। অশোক শিলালিপির নতুন ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছিলেন একজন এপিগ্রাফিস্ট। তাঁকে রাষ্ট্রের তরফ থেকে জানানো হল ঐ কর্মটি করা যাবেনা। হুল্ট্‌স্‌ সাহেব যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাই মেনে নিতে হবে। অন্য কোনও ব্যাখ্যা চলবে না। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ প্রমুখের ইচ্ছায় এপিগ্রাফিস্ট্‌কে হুল্ট্‌স্‌-এর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বক্তব্য রাখতে হল। ব্যাপারটা কি? সরকারী কর্মচারী ঐ এপিগ্রাফিস্টের অধিকার ছিলনা নতুন কিছু বলার—নতুন কিছু ব্যাখ্যা দেওয়ার। ছিলনা কারণ ব্রিটিশ সরকারের উত্তরসূরী স্বাধীন ভারত সরকার যে মিথ্যাটাকে বাঁচিয়ে রাখার এজেন্সী নিয়েছিল। নিয়ে আছে। যেমন নিয়ে রেখেছেন ভারতের জাঁদরেল সব ঐতিহাসিকই। রাষ্ট্রপোষ্য জ্ঞানী গুণীদের কেউ ঢাউস-সাইজের 'ভারতীয় দর্শন'-এর বই লিখেছেন যে দর্শনের অস্তিত্বই ছিল না। কেউ আবার বৈদিক যুগ এবং উপনিষদের যুগের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। ব্রহ্মচর্যের বিজ্ঞাপন লিখেছেন। বানপ্রস্থের সার্টিফিকেট দিয়েছেন। যে ব্রহ্মচর্য বা বানপ্রস্থের ব্যবস্থা ভারতবর্ষে কস্মিনকালেও চালু ছিল না। চার আশ্রমের ফরমুলাটা যে ব্রিটিশপোষ্য ভারতীয় পণ্ডিতদের তৈরী করে নেওয়া—একটা প্রাচীন গল্প লেখার সুবিধা হবে বলেই যে ঐ ফরমুলাটা উদ্ভাবন করা হয়েছিল—এই সোজা কথাটা ভারতের জ্ঞানীগুণীরা চেপে গেলেন। মিথ্যাটা বেঁচে থাকল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তথাকথিত চাতুর্বর্ণ্যের বর্ণাঢ্য আয়োজনের প্রশংসায়ও কেউ কেউ ডগমগ হয়ে উঠেছিলেন। অন্যে পরে কা কথা। স্বয়ং নরেন্দ্রনাথ দত্তও প্রথাটিকে 'Greatest institution that God has given to India' বলে বসেছিলেন। ঐ প্রথাটাও যে তথাকথিত ঈশ্বরের বানানো কিছু ব্যাপার নয়—ওটাও যে মহাপ্রভু

ব্রিটিশের ভাড়াটে পণ্ডিতদের তৈরী করে নেওয়া 'তত্ত্ব'—এই সোজা কথাটাও কেউ বোঝার চেষ্টা করেনি। (প্রমাণ পরের একটি অধ্যায়ে রাখব।)

এপিগ্রাফিয়ার স্বরূপলক্ষণ

এপিগ্রাফিয়ার স্বরূপলক্ষণ নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। ইতিহাসের কাঁচা মাল যোগায় ঐ এপিগ্রাফিয়া। কাঁচা মাল অর্থে শিলালিপি, প্রত্নমুদ্রা, ভূমিদান লেখ বা তাম্রলিপি (সুন্দর নাম তাম্রশাসন) ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। অর্থাৎ প্রাচীন বলে প্রচার করা যায় এমন কিছু লিখিত সাক্ষ্য নিয়েই তার কারবার। ভারতে প্রাপ্ত প্রাচীন বলে প্রচারিত শিলালিপির অধিকাংশই তথাকথিত প্রাকৃত ভাষায় লেখা। কিছু ঐ সংস্কৃতে। অধিকাংশের মাধ্যম তথাকথিত ব্রাহ্মীলিপির নানান রূপ—কিছু নানান কায়দার খরোষ্ঠী। শিলালিপির অধিকাংশই অসম্পূর্ণ বাক্য। কোথাও পদের অর্ধেক প্রকাশিত—অর্ধেক উহ্য। কোথাও বা শব্দের ভেতরেই কয়েকটা অক্ষরের ঘাটতি। কোথাও আবার ভাবেরই অভাব। এপিগ্রাফিস্টরা অসম্পূর্ণ বাক্যকে সম্পূর্ণ করেছেন নানান শব্দ যোগান দিয়ে। অনেক ক্ষেত্রে শব্দের ভগ্নাংশও যোগান দিয়েছেন তাঁরা। শব্দ যোগান দেওয়ার আধিদৈবিক ক্ষমতা তাঁরা পেলেন কোত্থেকে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দরকার বোধ করেননি তাঁরা। ভাবের অভাবও তাঁরা মিটিয়েছেন কল্পিত সব শব্দ প্রয়োগ করে। শিলালিপির শব্দভাণ্ডারের মধ্যে আর যাই হোক বৈচিত্র্যের অভাব নেই। বিচিত্র সব ব্যক্তির নাম। বিচিত্র সব স্থানের নাম। সবই আছে। বেশ কিছু ব্যক্তির নাম কামগন্ধী। অতীতকালে নাকি ঐ-গন্ধী নামের প্রচলনটা একটু বেশী মাত্রায় ছিল। এছাড়া বিশেষণে সবিশেষ নামও প্রচুর। সুদূর দক্ষিণ ভারতে সুদূর অতীতে যে সংস্কৃত নামের ছড়াছড়ি ছিল এটা প্রতিপন্ন করার প্রচণ্ড আয়োজন করা হয়েছে ঐ এপিগ্রাফিয়ায়। সর্বভারতীয়তা নামক একটা আইডিয়া

যে ভারতে সুদূর অতীতে গড়ে উঠেছিল এবং সে আইডিয়া প্রসারের পুণ্য পবিত্র মাধ্যম যে ঐ সংস্কৃত ভাষাটাই ছিল এটা বোঝানোর দরকার একটু বেশী মাত্রায় বোধ করেছিলেন ইতিহাসের কাঁচা মাল তৈরীর কর্মকাণ্ডে লিপ্ত নেপথ্য শিল্পীরা। না হলে ভারতে প্রাপ্ত প্রত্নলিপির তিনভাগের এক ভাগ (পঁচাত্তর হাজার প্রত্নলিপির মধ্যে পঁচিশ হাজার) কেবল ঐ তামিলনাড়ুতে পাওয়া গেল কেন ? একটি মজার তথ্য দিয়ে প্রসঙ্গটা শেষ করব। তামিলনাড়ু থেকে প্রাপ্ত প্রত্নলিপির বেশ কিছু তামিল ভাষায় লেখা। এবং সেইসুবাদে তামিল ভাষাটাও অত্যন্ত প্রাচীন বলে প্রচার করার ব্যবস্থা হয়ে গেল। প্রচারটা এমনভাবে করা হল যাতে মনে হয় ঐ ভাষাটা প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে ভারতের তাবৎ ভাষাকে বুঝি হার মানিয়ে বসে আছে। প্রচারটা এমন ভাবে করা হল যাতে মনে হয় ভারতের অন্য অঞ্চলে তখন বুঝিবা ভাষাগত ভ্যাকুয়াম বিরাজ করছিল। জাল শিলালিপির ওপর ভিত্তি করে ভাষার ওপর প্রাচীনত্বের সার্টিফিকেট ঝোলাতে গেলে গোলমাল ত' কিছু বাধবেই।

এপিগ্রাফিয়া প্রসঙ্গে ফেরা যাক। তথ্যদৃষ্টে দেখা যাচ্ছে ঐ এপি--গ্রাফিয়া লেখার কাজে বেশ কিছু সন্দেহজনক চরিত্রের লোক (রায়-বাহাদুর বা বশংবদ আমলা এবং বি. এ-পাস 'প্রত্নতাত্ত্বিক' ইত্যাদি) জড়িত ছিলেন। জড়িত ছিলেন দেশীবিদেশী বেশ কিছু পণ্ডিতও। অনেকে প্রশ্ন করে বসবেন এর থেকে সিদ্ধান্তটা কি আসছে।

সন্দেহজনক চরিত্রের লোক কিছু লিখলেই তা সন্দেহ করতে হবে বা পণ্ডিত ব্যক্তি লিখলেই তা বিশ্বাস করে নিতে হবে—এ ধরণের কথা অর্থহীন। অর্থহীন কারণ দেশে দেশে সন্দেহজনক লোক বা পণ্ডিত ব্যক্তি দুটোই আসলে 'কমডিটি'। দুটোরই কেনাবেচা হয়। সন্দেহজনক লোক কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সন্দেহ করার মত কাজ করে বসেন। পণ্ডিত ব্যক্তিও বিকিয়ে যান। রাজ্যের মিথ্যাসৃষ্টির কাজে কিংবা ঐ মিথ্যাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব নিয়ে দেশেবিদেশে সেমিনার করে বেড়ান। ইতিহাস নামক আন্তর্জাতিক চক্রান্তের শরিক হয়ে পড়েন

ঐ পাণ্ডিত্যবিলাসীরা। রাষ্ট্রের সুনজরে থেকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকার ভূমিকা নিয়ে এঁরা আখের গুছিয়ে নেন। মিথ্যা বেঁচে থাকে, বেঁচে থাকে অক্ষয় পরমায়ু নিয়ে। পণ্ডিতেরা নিজেদের মধ্যে তর্কযুদ্ধের অভিনয় করেন। উনিশ শতকে লেখা একটা নির্ভেজাল জাল বই সম্পর্কে কোনও পণ্ডিত রায় দিলেন ওটা খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে লেখা। কেউ বললেন, না, ওটা খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের। কেউ বললেন লেখাটা খাঁটি তবে লেখকের নামটা খাঁটি নয়। আর এক পণ্ডিত বললেন লেখকের নামটা অত্যন্ত খাঁটি—তবে তার আরও দশখানা নাম ছিল। বিচিত্র উদ্ভট সব সিদ্ধান্ত! পণ্ডিতেরা কেউ জার্মানীর, কেউ ফ্রান্সের, কেউ ঐ ইংল্যাণ্ডের, কেউবা রাশিয়ার। এমন নিপুণ চক্রান্ত সুনিপুণ নিষ্ঠার সঙ্গে পণ্ডিতেরা করে আসছেন যা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়। মজার কথা কোনও তথ্য সম্পর্কে ত্রৈমত্য চাতুর্মত্য পাঞ্চমত্য থাকা সত্ত্বেও সে-তথ্য ইতিহাসে বহাল থাকে। এবং ইতিহাস নাকি একটা বিজ্ঞান! সে যাই হোক, আগের কথায় আসা যাক। সন্দেহ জনক চরিত্রের লোক বা পণ্ডিত ব্যক্তি যিনিই লিখুন, কে লিখেছেন সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে তিনি কি লিখেছেন—তিনি কি বলতে চেয়েছেন। সত্য তথ্য পরিবেশন করার নামে মিথ্যা বলেছেন কিনা—চলতি একটা মিথ্যাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব নিয়েছেন কিনা—এইটাই দেখতে হয়। রায়বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায় বা কোনও বিদ্যাসাগর কিংবা দিকপাল কোনও পণ্ডিতের লেখা যদি সন্দেহজনক মনে হয় তবে ঐ লেখা থেকেই ভদ্রলোকদের সনাক্ত করতে হবে। জনশ্রুতির গৌরব বা অপবাদ কোনটাকে গুরুত্ব না দিয়েই তা করতে হবে। মোহমুক্ত না হলে চোখ খোলা রাখা যায়না।

শিলালিপি কি আদৌ প্রামাণিক?

ইতিহাসের উপাদান হিসাবে শিলালিপির গুরুত্ব খুবই বেশী। অন্ততঃ পণ্ডিতেরা তাই মনে করেন। শিলালিপির বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে কেউ-ই সন্দেহ প্রকাশ করেননি, যদিও করা উচিত ছিল। রোদ-বৃষ্টি

ঝড়ের তাণ্ডব সহ্য করে উন্মুক্ত জায়গার শিলালিপিযুক্ত পাথর যে খোদাই-করা অক্ষরগুলোকে অম্লান রেখে তিন চার হাজার বছর অক্ষয় অস্তিত্ব নিয়ে থাকতে পারেনা—এই সোজা কথাটার ওপর গুরুত্ব কেউ-ই দেননি। দেননি আর একটি প্রশ্নের কোন সদুত্তর। তিন-চার হাজার বছর আগে বানানো তথাকথিত শিলালিপিগুলো কি দিয়ে খোদাই করা হয়েছিল? তখন কি ছেনি-হাতুড়ির রেওয়াজ ছিল? আর রেওয়াজ ছিল বললেই কি সেটা মেনে নেওয়া যায়? যায়না কারণ নানান ধাতুর প্রাচীন অস্তিত্বের গল্পটাই আজগুবি। ঐ গল্পটা যে কত আজগুবি সে প্রশ্নে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে। আপাততঃ শুধু এইটুকুই বলব পণ্ডিতেরা শিলালিপির বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে কোনও সন্দেহ প্রকাশ করেননি কারণ ঐ আজগুবি গল্পটাকে ওঁরা সকলেই বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন। বিশ্বাস করেছিলেন তথাকথিত সভ্যতার প্রত্ন-উপকরণের মধ্যে ছেনি-হাতুড়ির নিদর্শনের ছড়াছড়ি দেখে। শিলালিপির প্রসঙ্গে ফেরা যাক। শিলালিপির বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে কেউ সন্দেহ করবেনা —এ-বিশ্বাস মিথ্যার চক্রীদের ছিল। এবং ছিল বলেই জাল শিলালিপি তৈরী করে রাখার বিরাট কর্মযজ্ঞে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়ে-ছিলেন। ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন নানান দেশে ইতিহাসের পাথুরে উপাদান বানিয়ে রাখার তাগিদে। শিলালিপির অনেক সুবিধা। পরিকল্পিত সালতামামি আরোপ করতে—জাল বা খাঁটি অক্ষরে পরি-কল্পিত এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য লিখে রাখতে—রাজ্যের মিথ্যাকে কিছুটা স্থায়ী বানাতে ঐ শিলালিপির জুড়ি নেই। পরিকল্পিত কিছু লিপি খোদাই করে রাখলেই চলে। পরবর্তীকালে প্রচণ্ড পণ্ডিত প্রভূত পরিশ্রমের পর পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। লিপির মর্মোদ্ধার করে বসেন। পরিকল্পিত লিপির সুপরিকল্পিত 'রহস্য'-উন্মোচন করে পণ্ডিত বাহবা কুড়োন। এ-ধরণের পণ্ডিতের সংখ্যা দুনিয়ায় কম নয়। এঁদের পাণ্ডিত্যের নাকি সীমাপরিসীমা ছিলনা! নাম-ডাকের বহর-ওয়ালা এইসব পণ্ডিত না থাকলে যে দুনিয়ার প্রাচীন ইতিহাস-ই

লেখা সম্ভব হত না। ভাগ্যিস ঐ পণ্ডিতেরা জন্মেছিলেন।

বোবা পাথরকে বাঙ্ময় করে তোলার এই খেলাটা কোথায় প্রথমে চালু হয়েছিল সে-খবর ইতিহাসে নেই। তবে বুঝতে কষ্ট হয় না ঐ মহান খেলাটার পিছনে প্রাচীন এসিয়া বা আফ্রিকা নামক সুসভ্য দুটি মহাদেশের কোনও অবদানই ছিলনা। ছিল সেই মহাদেশের যে মহাদেশ দুনিয়ার প্রাচীন ইতিহাস বানানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। প্রাচীন ইতিহাস নামক মিথ্যার স্রষ্টিকর্তা ঐ ইউরোপের পণ্ডিতদের মাথা থেকেই শিলালিপি বানিয়ে রাখার মতলবের জন্ম হয়েছিল। দুনিয়ার কোনও প্রাচীন শিলালিপিই প্রাচীন নয়—যদিও প্রাচীন বলেই ওগুলোকে প্রচার করা হয়—যদিও প্রাচীন বলেই পণ্ডিতেরা ওগুলোকে মেনে নেন। 'প্রাচীন' শিলালিপি যে প্রাচীনকালে তৈরী করা হয়নি—এবং ওগুলো যে আধুনিক কালে বানিয়ে নেওয়া হয়েছে তার প্রমাণ হিসাবে শুধু এইটুকুই বলব প্রাচীন শিলালিপির বেশীর ভাগ শিলালিপিতে এমন সব লিপি ব্যবহার করা হয়েছিল যেসব লিপির অস্তিত্বই ছিলনা। (প্রমাণ ক্রমশঃ প্রকাশ্য) কিছু 'প্রাচীন' শিলালিপিতে আধুনিক কালের প্রচলিত লিপিও ব্যবহার করা হয়েছিল। করা হয়েছিল বিভ্রান্তি স্রষ্টির চেষ্টা হিসাবেই। অস্তিত্বহীন ভূতুড়ে লিপিগুলোর প্রসঙ্গ পরে আলোচনা করব।

প্রত্নলেখের সালতামামি

শিলালিপি বা তাম্রশাসনে সালতারিখ খোদাই করে রাখারও ভালো আয়োজন হত। কোথাও 'অমুক রাজার রাজত্বের এত-তম বর্ষ'—কোথাও আবার শকাব্দ বা অমুকাব্দ খোদাই করে রাখারও ব্যবস্থা থাকত। শুধু সালতারিখ বানিয়ে রেখেই মিথ্যার কারবারীরা ক্ষান্ত হতেননা। সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু তথ্য তাঁরা সরবরাহ করতেন। অতিরিক্ত তথ্য হিসাবে তিথি বা নক্ষত্রের বিবরণও দেওয়া হত। সংক্রান্তি বা গ্রহণের খবরও বাদ পড়তনা। ব্যবস্থাটা যে নিখুঁত নিঃছিদ্র ছিল এটা মান[illegible] হয়ে

যেত। শিলালিপি তাম্রশাসনটাকে প্রাচীন সাজানো গেল—তাছাড়া তখনকার দিনের মানুষ যে জ্যোতিষশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন এই প্রচণ্ড মিথ্যাটিকেও ইঙ্গিতে জানানোর ব্যবস্থা হয়ে গেল। প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় কল্পিত মহাপুরুষদের প্রায় সকলেই পূর্ণিমা-জাতক—কেউ আবার ঐ পূর্ণিমাতেই 'দেহ' রক্ষা করেছেন।

শিলালিপি বা তাম্রশাসনে সালতামামি খোদাই করে রাখার ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রেই রসসৃষ্টির চেষ্টা হত। সহজ কায়দায় সালতারিখ খোদাই না করে রাখা হত ধাঁধা। একটি শিলালিপিতে 'কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ'—নামক একটি উদ্ভট শব্দ পাওয়া গেল। কিছু পণ্ডিত ধাঁধার জট খুলে জানালেন ওটা ৮৮৮ শকাব্দ না হয়ে যায়না। সবাই সে তথ্য মানবেন কেন? পণ্ডিতেরা দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেলেন। একদল বললেন, হ্যাঁ, ওটা অকাট্য ৮৮৮ শকাব্দ ত' আর একদল বললেন, না, তা হতেই পারেনা। মক-ফাইট চলল। এক দলে ছিলেন রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ এবং আরও কয়েকজন পণ্ডিত—অন্যদলে ছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতেরা। ব্যাপারটা কি? উভয় শিবিরের তাবৎ পণ্ডিতই ছিলেন ভাড়াটে। (প্রমাণ ক্রমশঃ প্রকাশ্য) আসলে ওরা সকলেই ছিলেন ব্রিটিশ-স্তাবক মিথ্যার সাকরেদ। বিভ্রান্তি আনার কাজে প্রত্যেকেই যাঁর যাঁর কর্তব্য করে গেছেন। করে গেছেন ন্যস্ত দায়িত্ব হিসাবেই। ইতিহাসে ছুটো মতই চলছে!

অনেকে প্রশ্ন করে বসবেন 'কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ'—শব্দের অর্থ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মতপার্থক্য থাকার ব্যাপারটাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখলাম কেন। কারণ আছে বৈকি। শিলালিপি, তাম্রশাসন বা প্রাচীন গ্রন্থে 'শকাব্দ' শব্দের ভুরি ভুরি প্রয়োগ হয়েছে। গোলমাল যে ঐ শব্দটিকে ঘিরেই রয়েছে। শক বলে কোনও জাতি যে ছিলই না। ছুনিয়ার ইতিহাস বানাতে গিয়ে অনেক কল্পিত জাতির অস্তিত্বের গল্প বানাতে হয়েছিল। শক সেই রকমই একটি 'জাতি'। বিস্তৃততর আলোচনা 'প্রাচীন ক্যালেণ্ডার'-পরিচ্ছেদে রেখেছি।

তাম্রশাসনের 'শিল্পী'

তাম্রশাসন যাঁরা খোদাই করতেন তাঁরা নিজেদের নামও বেশ যত্ন করেই খোদাই করে রাখতেন ঐ 'শাসনে'। শিল্পীর নাম থাকার দৌলতে তাম্রশাসনের বিশ্বাসযোগ্যতা বেড়ে যেত। ফটোগ্রাফারের নাম থাকলে ফটোর গুরুত্ব যেমন বাড়ে অনেকটা সেই রকমই। কিছু কারসাজি করা হলেও ফটো প্রামাণ্য হয়ে দাঁড়ায় ঐ নামের কৃপায়। সে যাই হোক, বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানোর আরও কিছু উপকরণ ঐ তাম্রশাসনে থাকত। দাতার উর্ধতন তিনপুরুষের নাম এবং কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি, গ্রহীতার নাড়ীনক্ষত্র, গোত্রপরিচয় তথা তস্য সমসংখ্যক পুরুষের নামধাম 'লেখার' ব্যবস্থা রাখা হত ঐ 'শাসনে'। আরও আছে। মহাভারতের তৎকালীন শ্লোকসংখ্যা 'লিখে' রাখারও দরকার পড়ত কোনও কোনও 'শাসনে'। খোদাই করার পারিশ্রমিকও খুব একটা কম ছিল বললে ভুল হবে। ক্রাউন সাইজের পাইকা হরফের চারপাতা তামিল বয়ান খোদাই করার জন্য যুদ্ধকেশরী পেরুম্‌বানাইকরণ পেয়েছিলেন একটি আস্ত বাড়ী, দু 'মা' জলাজমি আর দু 'মা' শুখা জমি। শিল্পীর নামেরও কিছু ব্যঞ্জনা ছিল বৈকি। তামিলভাষী অঞ্চলে যে সুদূর অতীতেও সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল এই প্রচণ্ড মিথ্যাটাও জানানোর ব্যবস্থা হয়ে গেল কল্পিত শিল্পীর নামকরণের বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে। আধা-সংস্কৃত আধা-তামিল নামটা বেশ ভালোই বানানো হয়েছিল।

উৎস : Tamil Epigraphy গ্রন্থের Select Inscriptions নিবন্ধ। গ্রন্থের লেখক এন. সুব্রাহ্মনিয়ান এবং আর. ভেঙ্কটরামন।

সার্ভে—আর্কিয়লজিক্যাল, না, অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল?

ভারতবর্ষের আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভের অফিসটাকে অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল মিউজিয়াম বানানো হয়েছিল কেন? ফ্রান্সের পণ্ডিত, জার্মানীর পণ্ডিত, নরওয়ের পণ্ডিত—সবই ছিল ঐ সার্ভের অফিসে। পণ্ডিতে পণ্ডিতে ছয়লাপ। নানান জাতির পণ্ডিতের প্রদর্শনী হয়ে উঠেছিল ঐ সার্ভে। ব্রিটিশ সরকারের অন্য কোনও কর্মকাণ্ডে ত' এত বিদেশী পণ্ডিতের দরকার পড়তনা। শুধু সার্ভের হয়ে এপিগ্রাফিয়া লেখার কাজে ওঁদের আনাগোনাটা কি সন্দেহজনক নয়? ইতিহাসের কাঁচামাল তৈরীর কর্মকাণ্ডে ঐসব পণ্ডিতের অক্লান্ত পরিশ্রমের পিছনে কার প্রেরণা কাজ করেছিল? ব্রিটিশ সরকারের? ফরাসী-জার্মান-নরওয়েজীয় পণ্ডিতের লেখার বিশ্বাসযোগ্যতা বেশী—নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ওঁরাই সবকিছুর ভালো ব্যাখ্যা দেবেন—এ-প্রত্যয় কি ব্রিটিশ সরকারের ছিল? বুঝতে কষ্ট হয়না একটা জলজ্যান্ত মিথ্যাকে পোক্ত সত্য বলে প্রচার করার কাজে ঐসব বিদেশী পণ্ডিতদের আনার দরকার পড়েছিল। দরকার পড়েছিল সর্বাঙ্গীন মিথ্যার বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানোর জন্যই। দেশে পণ্ডিতের দুর্ভিক্ষ—ইংল্যাণ্ডেও নাকি তখন সেই অবস্থা চলছিল। তাই বিদেশী ভাড়াটে পণ্ডিতদের আনাগোনাটা একটু বেড়ে গিয়েছিল। আর পণ্ডিত বলে পণ্ডিত! কেউ মিথ্যার সমুদ্দুর—কেউ-বা মিথ্যার সাগর। হুলট্‌স্, ফুয়েরের, বুহ্‌লার, স্টেন্ কনো কত নাম করব? বুঝতে কষ্ট হয়না অবিমিশ্র মিথ্যা কাহিনীর সঙ্গে ঐসব বিদেশী পণ্ডিতের নাম জড়ানোর খেলাটা পরিকল্পিতভাবেই খেলেছিলেন ইংল্যাণ্ডের মিথ্যার চক্রীরা। মিথ্যার আভিজাত্য বেড়ে গিয়েছিল ঐসব বিদেশীদের নাম জড়ানোর মধ্য দিয়ে।

প্রত্নলেখের বক্তব্য

বলে রাখা ভালো শিলালিপি, তাম্রশাসন বানিয়ে রাখার কাজটা ঐ

আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভের আনুষ্ঠানিক জন্মের অনেক আগেই সেরে রাখা হয়েছিল। সার্ভের ওপর যে দায়িত্বটা বর্তেছিল তা' ঐ বানানো ক্রিয়া-কাণ্ডের অনুশীলন-বিশ্লেষণের। সার্ভের লোকজনেরা দায়িত্বটা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছিলেন। ঢাউস সাইজের এপিগ্রাফিয়া-ইণ্ডিকার খণ্ডগুলোতে সে-নিষ্ঠার প্রমাণ তাঁরা রেখে দিয়েছেন। স্পষ্ট-অস্পষ্ট শিলালিপি-তাম্রশাসনের ফটো তুলে রাখা—পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়ার ব্যবস্থা করা—সবই ঐ এপিগ্রাফিয়ায় ছিল। আর ছিল সযত্নলালিত নানান মিথ্যার লিখিত সাক্ষ্যের প্রামাণ্যতা-প্রতিষ্ঠার অক্লান্ত প্রয়াস। বেদ-উপনিষদ-পুরাণ যে অত্যন্ত প্রাচীন কালে সুপ্রচলিত ছিল—তথাকথিত চাতুর্বর্ণ্যের ব্যবস্থা যে সুদূর অতীতেই ভারতে শুরু হয়েছিল—তথাকথিত চতুরাশ্রমের ফরমুলা যে অতীতে হিন্দুরা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন—হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন-আজীবক নানান ধর্মের জয়জয়কার যে প্রাচীন কালে ভারতে ঘটেছিল—এ-সব তথ্য বেশ পরিকল্পিতভাবেই রাখা হয়েছিল ঐ এপিগ্রাফিয়ায়।

শুধু প্রামাণ্য শিলালিপি বা তাম্রশাসনের পরিচয় দিয়েই সার্ভের লোকজনেরা ক্ষান্ত হননি। বেশ কিছু 'সন্দেহজনক প্রামাণ্য' শিলালিপি-তাম্রশাসনের খবরও তাঁরা দিয়েছেন। বলেছেন, এগুলো খাঁটি ও-গুলো জাল। বলেছেন, এ-রাজার অস্তিত্বটা প্রমাণসিদ্ধ—ঐ রাজার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ আছে। চন্দ্রগুপ্ত-অশোক-কনিষ্কেরা ছিলেন ঠিকই তবে নবরত্নের প্রতিপালক বিক্রমাদিত্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে নাকি সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান। সমূহ-মিথ্যার দু-একটা অংশকে অপ্রামাণ্য বা মিথ্যা বলে চালানোর চেষ্টাটা বেশ পরিকল্পিত ভাবেই নেওয়া হত। পণ্ডিতেরা ঐ চেষ্টাটাকে ইতিহাসকারদের সততার পরিচায়ক হিসাবেই মনে করে বসবেন এ-প্রত্যয় মিথ্যার কারবারীদের ছিল। এবং ছিল বলেই একটু বেশী মাত্রাতেই ঐ খেলাটা তাঁরা খেলেছিলেন। ইতিহাসের খানিকটা মিথ্যা—শিলালিপি-তাম্রশাসন অংশতঃ জাল বলার দরকার পড়েছিল ঐ জন্যই। এতে বাকি

বড় অংশের ঐতিহাসিকত্বের ভিতটা মজবুত হত। বিক্রমাদিত্যরা না থাকুন, অশোক চন্দ্রগুপ্ত ত' ছিলেন। দু-একটা শিলালিপি-তাম্রশাসন জাল হোক—অন্যগুলো ত' খাঁটি। কায়দাটা ভালো। এবং ভালো বলেই দুনিয়া জুড়ে কায়দাটা খাটানো হয়েছিল। ওল্ড টেস্টামেণ্টে শুরু করা ঐ কায়দার সুন্দর একটা নামও দেওয়া হয়েছে। 'সন্দেহজনক প্রামাণ্য' ঐ বক্তব্যকে বলা হয় apocryphal. ভূতুড়ে শব্দটা ইংরাজি অভিধানেও শোভা পাচ্ছে। বুঝতে কষ্ট হয়না মিথ্যার কারবারীরা উদ্ভট উদ্ভট তত্ত্ব তৈরী করার কাজে উদ্ভটতর সুন্দরকুৎসিৎ মার্কা শব্দ কম তৈরী করে নেননি। সন্দেহের অবকাশ থাকলে যে কোনও কিছু প্রামাণ্য হতে পারেনা এই সোজা কথাটাকে অভিধানকার গুরুত্ব দেননি।

পুঁথি—কারসাজির আর এক নাম

ইতিহাস তৈরী করার কাজে হাতে লেখা পুঁথির অবদান বিরাট। পুরানো বলে চালানো যায় এমন পুঁথি প্রাচীন ইতিহাসের প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হয়। আর তাই এর কদর খুব বেশী। পুঁথি যত বেশী পুরানো বলে চালানো যাবে তত বেশী তার ইজ্জত। পুঁথি এক জায়গায় পাওয়া গেলে নির্ভরযোগ্য হয় না। তাই নানা জায়গা থেকে তার নকল (অংশত হলেও আপত্তি নেই) জোগাড় করার অভিনয় করতে হয়। সে নকলগুলোতে কিছু পাঠভেদের ব্যবস্থাও রাখতে হয়। পাঠভেদ না থাকলে পুঁথির খাঁটিত্ব ক্ষুণ্ন হয়—তাই ঐ ব্যবস্থা। 'প্রাচীন' পুঁথি পেলেই হলনা। তার আবার কিছু প্রাচীন টীকাভাষ্যও বানিয়ে রাখতে হয়। কারণ টীকাভাষ্য ছাড়া পুঁথির প্রামাণ্যতা কমে যায়। টীকাকারের সংখ্যা যত বেশী হবে পুঁথির গুরুত্ব তত বাড়বে। আর উদ্ভট একটি (বা একাধিক) নাম কল্পিত টীকাকারের (বা টীকাকারদের) ওপর আরোপ করলেই হল টীকাকার (বা টীকাকারেরা) প্রামাণ্য হয়ে গেলেন। টীকাকারদের নামের ঔদ্ভট্যটাকে পণ্ডিতেরা প্রাচীনত্বের ইঙ্গিতবাহী বলে মনে করেন। তাই

ঐ ব্যবস্থা। আর একটা কাজ বাকি থাকল। কিছু নবীনতর পুঁথিতে ঐ সুপ্রাচীন পুঁথির তথ্য বা লেখকের নামের উল্লেখ করার ব্যবস্থা থাকলে সোনায় সোহাগা। আদি পুঁথির প্রামাণ্যতা সম্পর্কে পণ্ডিতেরা নিঃসন্দিগ্ধ হয়ে গেলেন। ভালো কথা। আসল কথাটাই বলা হয়নি। ঐসব পুঁথির দু-একটি নকল ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বা বিবলিওথেক নাশিওনালে কিংবা বার্লিনের কোনও লাইব্রেরীতে রাখার ব্যবস্থা করতে পারলে পুঁথির প্রাচীনত্ব এবং আভিজাত্য দুটোই পোক্ত হয়ে ওঠে। ভারতীয় পণ্ডিতেরা ঐসব দেশে গিয়ে পুঁথির নকল করে এনে দিগ্বিজয়ীর আনন্দ পেয়ে যান। কিছু বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হলে কি আর বলা যাবে? বলতে যাচ্ছেই বা কে? আর একটা মজার কথা বলেই পুঁথির প্রসঙ্গ শেষ করব। বিদেশের স্বনামধন্য লাইব্রেরীগুলোতে অস্তিত্বহীন পুঁথি পাঠালেও চলে। অস্তিত্বহীন পুঁথির প্রাপ্তিস্বীকার করতেও ওঁদের অসুবিধা হয়নি। হয়নি কারণ আন্তর্জাতিক চক্রান্তের শরিক হিসাবে ওঁরা সবাই একযোগেই প্রাচীন ইতিহাস নামক মিথ্যাটাকে বানিয়েছিলেন। মিথ্যাটাকে বাঁচিয়ে রেখে-ছিলেন। অস্তিত্বহীন বেদের পুঁথির ওপর নির্ভর করে ফরাসী পণ্ডিত বুর্নু' বা জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমুলারের 'গবেষণা' করতে কোনও অসুবিধাই হয়নি। এবং সে-পুঁথি নাকি ঐ বিবলিওথেক নাশিওনালেই ছিল! উপনিষদের অস্তিত্বহীন পুঁথি থেকে লাতিন অনুবাদ করেছিলেন দুপেরঁ সাহেব। তাঁরও যে কিছু অসুবিধা হয়েছিল এমন খবর পাওয়া যায়নি।

প্রাচীন মুদ্রা কি সত্যিই প্রাচীন? ওগুলো কি সত্যিই মুদ্রা?

প্রাচীন মুদ্রা সম্পর্কে বেশী কিছু লেখার দরকার বোধ করছিনা। কিছু বেঢপ সাইজের সোনা বা রূপো বা তামার চাকতির ওপর অস্পষ্ট কিছু ব্রাহ্মী বা খরোষ্ঠী হরফ আর কল্পিত সংবতের কিংবা অমুকাব্দের একটা সংখ্যা কিংবা বিচিত্র কিছু প্রতীকের ছাপ থাকলেই প্রাচীন বলে মনে করে নেওয়া যায়না। যায়না কারণ মূলেই গোলমাল। ব্রাহ্মী বা

খরোষ্ঠী লিপির অস্তিত্বই ভারতে ছিলনা। বলা বাহুল্য, ঐ-সব মুদ্রা মিথ্যার চক্রীদেরই তৈরী করে নেওয়া। স্বকপোল-কল্পিত তত্ত্বপ্রতিষ্ঠার তাগিদে মুদ্রাগত প্রমাণের 'মুদ্রাদোষ'। বড্ড বেশী মাত্রায় ব্যবহার করা হয়েছে। কল্পিত রাজারাজড়ার রাজ্যজয়ের গল্পগুলোকে ইতিহাস বলে চালাতে ঐ-সব 'মুদ্রা' যে যথেষ্ট কাজে লেগেছিল এটা মানতেই হয়। আর একটি কথা। ঐ-সব 'মুদ্রা'র খোঁজখবর যাঁরা দিতেন তাঁদের মধ্যে রায়বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায় বা কিছু সাহেব আমলাদের নাম পাচ্ছি কেন? সোনা-রূপোর প্রাচীন প্রচলনের গল্পটাই যে আজগুবি। সোনা-রূপার প্রাচীন মুদ্রার গল্পটা যে বানানো এটা কি বলার দরকার আছে? গল্পটা যে আজগুবি সে-প্রশ্নে পরে আলোচনা করব।

প্রশ্ন উঠবে এত বড় মিথ্যাটাকে কেউ ধরতে পারেননি কেন। দেশে কি পণ্ডিতের অভাব ছিল, না এখনো আছে? বিশ্লেষণী ক্ষমতা কি তাঁদের ছিল না? সত্যমিথ্যা যাচাই করার ক্ষমতা কি তাঁরা হারিয়ে ফেলেছিলেন? ইতিহাসে যে অতিরঞ্জন আছে—অতিকল্পনারও যে অভাব নেই এ-তথ্য ত' অনেক ঐতিহাসিকই আভাসে-ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়েছেন। সততার অভাবই যদি তাঁদের থাকবে তবে ঐ সত্যটা তাঁরা প্রকাশ করলেন কেন? তাঁদের ভুলটা কোথায় হয়েছিল? সবটাই যদি মিথ্যা হবে তবে ঐ ইতিহাসটাকে তাঁরা আংশিক মিথ্যা মনে করে বসলেন কেন? এ-সব প্রশ্ন আসছেই। উত্তর দেওয়ার আগে কিছু প্রশ্ন রাখা যাক। এক, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসটা লিখেছিলেন কারা? এত পরিশ্রম করে ইতিহাস লেখার দরকারটা পড়েছিল কেন? ইতিহাসের উপাদান সরবরাহ করার মনোপলিটা রাষ্ট্রের হাতে ছিল কেন? এ-সব প্রশ্ন পণ্ডিতেরা তোলেননি। দুই, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের কাঁচা মালে বোঝাই উৎসগ্রন্থ হিসাবে প্রচারিত বইগুলো প্রাচীন কালে কোন্ লিপিতে লেখা হয়েছিল? সুসমৃদ্ধ বৈদিক-সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত ভাষায় রচিত প্রাচীন গ্রন্থগুলোইবা প্রাচীনকালে কোন লিপিতে লেখা হয়েছিল? প্রাচীনকালে কি ভারতে আদৌ কোনও

লিপি প্রচলিত ছিল ? এ-প্রশ্ন নিয়েও পণ্ডিতেরা মাথা ঘামাননি। এবং ঘামাননি বলেই তাঁরা মারাত্মক ভুল করে বসেছিলেন। ইতিহাস রচনার পিছনে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভূমিকাকে তাঁরা ছোট করে দেখেছিলেন। প্রাচীন লিপির প্রশ্নটিকে তাঁরা যথোচিত গুরুত্ব দেননি। বিসমিল্লায় যে গলদ এইটাই তাঁরা ধরতে পারেননি এবং সেইজন্যই রাজ্যের গোলমাল তাঁরা করে বসেছেন।

ইতিহাস এবং রাষ্ট্রের ভূমিকা

রাষ্ট্র ইতিহাস লেখেনা। সরকারের আমলারা ইতিহাস লিখলে তা ঠিক ইতিহাস-পদবাচ্য হয় না। ইতিহাস লেখেন ঐতিহাসিকেরা। সরকারের প্রভাবমুক্ত ঐ-সব ঐতিহাসিক নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিছক সত্যানুসন্ধিৎসা থেকেই ইতিহাস লেখেন। অন্ততঃ প্রচারটা সেই রকমই থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকারের বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান নয়। চিন্তার স্বাধীনতা-ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর নানা বিরুদ্ধমত পোষণ করার স্বাধীনতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ঐতিহাসিকদের আছে। আছে অন্য অসংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিকদেরও। সবই ঠিক আছে। তবু দেশে দেশে এত জাতীয়তাবাদী ইতিহাস লেখা হ'ল কেন? এ-প্রশ্ন কেউ তোলেননি। এ-প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় ইতিহাসের কারিগর রাষ্ট্রপ্রভাবমুক্ত ঐতি-হাসিক হলেও ঐ ইতিহাসের কাঁচামালের যোগানদার কিন্তু ঐ রাষ্ট্রই। নিরবয়ব ঐ বিভীষণ রাষ্ট্র যে কি ভীষণ মিথ্যার কারবারী তা কল্পনাও করা যায়না। রাষ্ট্র মহাফেজখানা পুষে রাখে আর ঐ মহাফেজখানাকে জাল চিঠির এবং জাল লেখার আড়ৎ বানানো হয়। 'বার্ণার্ড শ' বা রবীন্দ্রনাথের লেখা' জাল চিঠিও ওখানে সযত্নে রক্ষিত হয়। আর্কিয়লজি-ক্যাল সার্ভে রাষ্ট্রের হাতেই থাকে। আর ঐ সার্ভের ওপরেই থাকে কাঁচামাল যোগান দেওয়ার সোল এজেন্সী। মিথ্যা তৈরী হয়। মিথ্যা বেঁচে থাকে। সে-মিথ্যা কাকপক্ষী টের পাবে এমন ব্যবস্থাও রাখা হয়না। নিশ্ছিদ্র নিখুঁত সব আয়োজন। ঐ মিথ্যাকে সনাক্ত করতে হয় মিথ্যার ভেতরের অসংলগ্নতা, পারম্পর্যের অভাব এবং ঐ মিথ্যার

পেছনে অবস্থানকারী সন্দেহজনক চরিত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে। এক কথায় মিথ্যার চরিত্রলক্ষণ দেখেই তাকে সনাক্ত করে নিতে হয়। নান্যঃ পন্থা। মোহমুক্ত দৃষ্টি নিয়ে ঐ মিথ্যাকে বিশ্লেষণ করতে হয়। তবেই মেলে সত্যের সন্ধান।

রাষ্ট্রের হাতে থাকে ইন্টেলিজেন্স। অপূর্ব গোপনতা রক্ষার নিশ্চিদ্র ব্যবস্থা থাকে ঐ ইন্টেলিজেন্সের কাজকর্মে। ইন্টেলিজেন্সের তৈরী করা মিথ এবং মিথ্যা বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকে অক্ষয় পরমায়ু নিয়ে। অনেক ক্ষেত্রে সে মিথ এবং মিথ্যা বেঁচে থাকে অন্য অনেক রাষ্ট্রের নাম জড়িয়ে। মজার কথা এই যে যেসব রাষ্ট্রের নাম ঐ মিথ্যার সঙ্গে জড়ানোর ব্যবস্থা হয় সে-সব রাষ্ট্রও বাঁচিয়ে রাখে ঐ মিথ্যাটাকে। তাঁরাও সে মিথ্যাকে ফাঁস করে দেন না। এবং ফাঁস করে দেন না সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কে তিক্ততা বেড়ে যাওয়ার মুহূর্তেও। এমনকি সাময়িকভাবে শত্রুভাবাপন্ন হয়ে পড়লেও শত্রুপক্ষের তৈরী করে নেওয়া মিথ্যাটাকে ফাঁস করে দেওয়ার চেষ্টা কোনও রাষ্ট্রই করেনা। সিদ্ধান্ত নিতেই হয় বেশ কিছু রাষ্ট্রের 'ইন্টেলিজেন্স' বিভাগের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও সমঝোতা আছে। এবং সমঝোতা আছে বলেই ক-রাষ্ট্র খ-রাষ্ট্রের মিথ্যা ফাঁস করেনা—খ-রাষ্ট্রও ক-রাষ্ট্রের মিথ্যাটাকে বাঁচিয়ে রাখার পরোক্ষ উদ্যোগ নেয়। মিথ্যা বেঁচে থাকে। মিথ্যাটা কালক্রমে ইতিহাস হয়ে বসে। এ-রকম ইতিহাসীভূত কয়েকটা মিথ্যার সন্ধান পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে কাঁচা প্রমাণ রাখার প্রচণ্ড আয়োজন দেখার সূত্রে। এ-সব কথা পলিটিকাল ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কে প্রযোজ্য। ইতিহাস নামক ইন্টেলেক্চুয়াল ইন্টেলিজেন্সের কাজকর্ম অনুরূপ গোপনতার সঙ্গেই সারা হয়। জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের কাঁচা মালের যোগানদার আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভে-গুলোর যোগসাজসে গড়ে ওঠে একটা আন্ত-র্জাতিক চক্র। সুপ্রাচীন ইতিহাস বানানোর উপকরণ-সৃষ্টির এবং উৎসগ্রন্থ লেখানোর মতলবের জন্ম হয়। সোনা-রূপোর প্রাচীন প্রচলনের প্রমাণ দেওয়ার উৎকট প্রয়াস—নানান ধাতবদ্রব্য ব্যবহারের

চাক্ষুষ প্রমাণ রাখার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সভ্যতার ইতিহাসটাকে সমৃদ্ধ সাজানো হয়। সাজানো হয় সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মালমসলা সরবরাহ করার মধ্য দিয়ে। মিথ্যা বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকে অক্ষয় পরমায়ু নিয়ে। এমনকি রাষ্ট্রের ইডিয়লজির বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে যাওয়ার পরেও ঐ মিথ্যা ফাঁস করা হয় না। 'ফা হিয়েন'-এর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কমিউনিস্ট চীনেও গবেষণা হয়। 'কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র' সম্পর্কে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার পণ্ডিতও মাথা ঘামান। অস্তিত্বহীন 'ফা হিয়েন' বেঁচে থাকেন সগৌরবে—'কৌটিল্য' নামক কল্পিত চরিত্রও জীবন্ত হয়ে ওঠে। সোনার প্রাচীন প্রচলনের গল্প সোভিয়েত রাশিয়ার আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভের তরফ থেকেও বানিয়ে নেওয়া হয় (বিস্তৃত বিবরণ পরের একটি অধ্যায় রেখেছি')।

ইতিহাস এবং জাতীয়তাবাদ

ইতিহাসগর্বী সব দেশের ইতিহাসই জাতীয়তাবাদী। এ-সব ইতিহাসের মোদ্দাকথা 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি'। গ্রীসের ইতিহাস পড়ুন, ঈজিপ্টের-টা দেখুন। 'রোম', মেসো-পটেমিয়া, ভারত, চীন, সিরিয়া, টিউনিসিয়া ইত্যাদি ইতিহাসগর্বী যে কোনও দেশের ইতিহাস পড়লে ঐ তথ্যটাই পাওয়া যায়। তথ্যটা এমন কিছু মূল্যবান নয়—কারণ ওটা স্বতঃসিদ্ধ হিসাবেই এসে যাচ্ছে। তবে এর থেকে যে অনুসিদ্ধান্তটা আসছে সেটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এ-সব ইতিহাসই তৈরী করা হয়েছে জাতীয়তাবাদ-নামক আইডিয়ার জন্মের পরে। বলা বাহুল্য ঐ আইডিয়াটা এমন কিছু প্রাচীন নয়। এবং সেটা প্রাচীন নয় বলেই সিদ্ধান্ত নিতেই হয় ইতিহাস লেখার পরিকল্পনার জন্মটা প্রাচীন কালে হয়নি। হয়েছে অর্বাচীন কালেই। প্রশ্ন উঠবে তবে কি প্রাচীন কালে লেখা বলে প্রচারিত ইতিহাসগুলো কিংবা ইতিহাসধর্মী লেখাগুলো প্রাচীনকালে লেখা হয়নি? এর উত্তরে বলতে হয় পুরানো 'ইতিহাস' গুলোর কোনটাই পুরানো যুগে লেখা হয়নি।

আর শুধু ঐ ইতিহাসই বা কেন—ঐ ইতিহাসের চেয়ে পুরানো বলে প্রচারিত মিথলজি বা পুরাণগুলোও ঐ প্রাচীনকালে লেখা হয়নি। হয়েছে আধুনিক কালেই। প্রাচীন ইতিহাসের তথাকথিত উৎসগ্রন্থ, প্রাচীন যুগের ওপরে ঐ যুগে লেখা সমস্ত ইতিহাসের বই এবং প্রাচীন কালে রচিত বলে প্রচারিত পুরাণ বা মিথলজির প্রথম প্রকাশকালের সালতামামি বিশ্লেষণ করলে ঐ সন্দেহটাই দৃঢ় হয়। দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠবে ঐ সব ইতিহাস বা পুরাণ যদি সত্যি সত্যি প্রাচীন কালে লেখা না হয়ে থাকবে তবে ওগুলো প্রাচীন বলে প্রচার করার দরকারটা পড়ল কেন? এ-প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় ওসব না লিখিয়ে রাখলে প্রাচীন ইতিহাস লেখার যে ভীষণ অসুবিধা হয়। লিখিত নজীর হিসাবে ঐসব 'ইতিহাস'-কেই যে খাড়া করার দরকার পড়ে। তৈরী করে নেওয়া 'নজীর' গুলোকে প্রাচীন বলে না চালালে ওসবের নজীরত্বই যে থাকে না। প্রাচীন ইতিহাস নামক প্রচণ্ড মিথ্যার প্রামাণ্যতার স্বার্থে যে ঐ নজীর লিখিয়ে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল এটা বুঝতে কষ্ট হয় না। এর পরেই আরেকটি প্রশ্ন উঠবে। ঐ ইতিহাস রচনা করেছিলেন কে বা কারা? এই প্রশ্নের উত্তরটাই সবচেয়ে মজার। গ্রীসের ইতিহাস গ্রীসের পণ্ডিত লেখেননি। ঈজিপ্টের ইতিহাস ঈজিপ্টের পণ্ডিত লেখেননি। অ্যাসিরিয়া, ব্যাবি-লোনিয়া, ভারত, চীন কোনও দেশেরই ইতিহাস সেদেশের পণ্ডিত লেখেননি। লিখেছিলেন দুনিয়ার ইতিহাসের স্রষ্টা ঐ ইউরোপ। জার্মানীর পণ্ডিত গ্রীসে ঘুরে আসতেন। ফ্রান্সের পণ্ডিত ঈজিপ্টে। ইংল্যাণ্ডের পণ্ডিত ভারতবর্ষে। 'সুসভ্য' সব দেশেই এঁদের সকলের যাতায়াত ছিল স্বচ্ছন্দ অবারিত। গ্রীসের 'ইতিহাস' লেখার পণ্ডিত করিতকর্মার পরিচয় দিয়ে 'ডিউটি' পেতেন ভারতে। একটা আন্তর্জাতিক চক্র গড়ে উঠেছিল। দেশে দেশে অর্কিয়লজিক্যাল সার্ভের প্রতিষ্ঠার সূত্রে ঐ চক্র দেশে দেশে base পেয়ে গিয়েছিলেন। আর ঐ সার্ভের সঙ্গে যোগসাজসেই গড়ে উঠেছিল ঐ মিথ্যার চক্রীদের কর্মতৎপরতা। এঁরা কিন্তু কেউই ঠিক ইতিহাস লিখতেন না। লিখতেন ইতিহাসের কাঁচা মাল। লিখতেন

তথাকথিত শিলালিপি-তাম্রশাসনের বয়ান। লিখতেন 'প্রাচীন কালে লেখা 'ইতিহাস'। লিখতেন পুরাণ যা প্রাচীনকালে লেখা বলে প্রচারিত হত। সবই যে তাঁরা নিজেরা লিখতেন এটা মনে করলে ভুল হবে। লেখানো হ'ত। স্থানীয় পণ্ডিতদের সহযোগিতা ছাড়া ঐ কাঁচামালের পাহাড় যে তৈরী হতেই পারতনা এটা বলাই বাহুল্য। পরিপূর্ণ গোপনতার মধ্যেই কাজকর্ম চলত। কাকপক্ষী টের পেতনা এমনই ছিল সে গোপনতা।

রাষ্ট্র এবং ধর্ম

রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের বিরোধের নানান গল্প চালু আছে। পৃথিবীর প্রায় তাবৎ দেশে অতীত কালে ঐ রাষ্ট্র বনাম ধর্মের প্রায়শই সংঘাত ঘটত। অন্ততঃ পণ্ডিতেরা তাই বলে থাকেন। ভারতেও সে-সংঘাত ঘটেছিল। যার নাম দেওয়া হয়েছে ক্ষাত্রশক্তির সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যশক্তির দ্বন্দ্ব। গল্পগুলোকে ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে প্রচার করা হয়েছে। প্রচারটা এমনভাবে করা হয়েছে যাতে মনে হয় ধর্ম একটি রাষ্ট্রনিরপেক্ষ শক্তি। রাষ্ট্রের সঙ্গে পাঞ্জা কষার ক্ষমতার দিক দিয়ে ধর্ম নাকি অত্যন্ত শক্তিশালী। রাষ্ট্রকে বেকায়দায় ফেলার ক্ষমতাও নাকি ধর্মের আছে। আরেকটি তত্ত্ব প্রচার করা হয়েছে যে তত্ত্বে বলা হয়েছে রাষ্ট্র ধর্মকে কাজে লাগায়। ধর্মের আফিম খাইয়ে মানুষকে নিষ্ক্রিয় বানানোর ব্যবস্থা হয়। এ-তত্ত্বের মধ্যে কিছুটা সত্যতা থাকলেও পূর্ণ সত্য হচ্ছে এই :—ধর্ম রাষ্ট্রনিরপেক্ষ কোনও সংস্থাই নয়—শক্তি ত' নয়ই। ওটা পুরোপুরি রাষ্ট্রসৃষ্ট এবং রাষ্ট্রনির্ভর একটি সংস্থা। দুনিয়ার কোনও ধর্মের তত্ত্বকথাই প্রাচীন কালে লেখা হয়নি যদিও প্রাচীনত্বের ছদ্মবেশ নিয়েই ঐ সব তত্ত্বকথার প্রকাশ এবং প্রচার ঘটেছে। রাষ্ট্র ধর্ম বানায়। যেমন রাষ্ট্র ইতিহাস বানায়। রাষ্ট্রের স্বার্থে ধর্মের উদ্ভাবনা। রাষ্ট্রের স্বার্থে ই ধর্মকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎসাহ দানের আয়োজন। রাষ্ট্র সুনিপুণভাবে ধর্মের প্রাচীনত্ব পবিত্রতার পরিমণ্ডল রচনা করে। অত্যন্ত গোপনতার

সঙ্গে ধর্মের নামে নানা মিথ্যা বানিয়ে রাখে। নানা মিথ্যা বাঁচিয়ে রাখে। রাষ্ট্রের হাতে কম পণ্ডিত থাকেন না। কোনও অসুবিধাই হয়না। বিনিময়ে ধর্ম নামক 'শক্তিশালী' সংস্থা রাষ্ট্রের প্রাচীনত্ব স্বীকার করে নেয়। রাষ্ট্র নামক আইডিয়াটা যে অতি সুপ্রাচীন এই তথ্যটা মেনে নেয়। ধর্ম বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকে রাষ্ট্র। দুটোই যেন আদ্যিকাল থেকে চলে আসছে। দুটোই যেন সনাতন—দুটোই যেন শাশ্বত। রাষ্ট্রের বানানো ইতিহাসেও ঐ দুই প্রচণ্ড মিথ্যাকে পুষে রাখার প্রয়াস নেওয়া হয়। রাষ্ট্রনির্দেশিত শিক্ষাব্যবস্থায় ঐ মিথ্যা ইতিহাসপড়ানোর আয়োজন হয়। আয়োজন হয় দেশে দেশে—রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে।

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র এবং জাতীয়তাবাদী ইতিহাস

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর ভাড়াটে ঐতিহাসিকেরা দুনিয়ার ইতিহাস লেখার ঠিকাদারী নিয়েছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই। অতীতকে উদ্ধার করার মহান কর্মকাণ্ডে তাঁরা নাকি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন নিছক সত্যানুসন্ধিৎসার তাগিদেই। আমাদের পণ্ডিতেরা অন্ততঃ তাই মনে করেছেন। ঐ 'সত্যানুসন্ধিৎসা'র পিছনে যে কোনও মতলব কাজ করেছিল এটা আমাদের পণ্ডিতদের বেশ কিছু বুঝেও না বোঝার ভান করেছিলেন—কিছু পণ্ডিত বোঝেনইনি। প্রথম দলের পণ্ডিতেরা মিথ্যার কারবারীদের সাকরেদ ছিলেন। দ্বিতীয় দলের পণ্ডিতেরা নেহাৎ-ই পণ্ডশ্রমের ব্যবসায়ী। অনুকম্পার পাত্র বললেও খুব একটা অন্যায় হয় না। খুব-সহজেই-ঠকানো-যায়-মার্কা এই সব পণ্ডিতই ভারতইতিহাসের কর্ণধার সেজে বসে আছেন। উভয় দলের পণ্ডিতদের কেউ কেউ পরম কারুণিক ব্রিটিশ সরকারের 'স্যার' খেতাব কুড়িয়েছেন। কেউ রায়বাহাদুর—কেউ বা মহামহোপাধ্যায়।

ভাড়াটে ঐতিহাসিকেরা ইতিহাস লেখার আগেই কিছু 'তত্ত্ব' (অর্থাৎ মিথ্যা) তৈরী করে নিয়েছিলেন। পরে ঐ 'তত্ত্বে'র সঙ্গে মিলিয়ে কিছু 'তথ্য' বানিয়ে নিয়েছিলেন। ঐ 'তথ্যে'র নাম 'প্রাচীন ইতিহাস'।

মজার কথা এই যে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের উদ্যোগে লেখা হলেও ঐ সব ইতিহাসকে চরিত্রগতভাবে জাতীয়তাবাদী সাজানো হয়েছিল। এতে একটা সুবিধা যে হয়নি তা নয়। জাতীয়তাবাদী হওয়ার দৌলতে ঐ ইতিহাসের গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে গিয়েছিল। বেড়ে গিয়েছিল বিশ্বাস-যোগ্যতা। সাম্রাজ্যবাদীরা যদি মিথ্যা বানানোরই উদ্যোগ নেবেন তবে তাঁরা জাতীয়তাবাদী ইতিহাস লিখতে যাবেন কেন? দরকারই-বা কি? পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন ঐ ইতিহাস নিশ্চয়ই প্রামাণ্য। তাছাড়া ইউরোপের প্রায় তাবৎ রাষ্ট্রের পণ্ডিতদের সহযোগিতায় যে ইতিহাস লেখা হয়েছে তা অবিশ্বাস করার কোনও যুক্তিই তাঁরা খুঁজে পাননি।

নানান দেশের জাতীয়তাবাদী ইতিহাস লেখা হল। গ্রীস, 'রোম' ভারত, চীন, ঈজিপ্ট, মেসোপটেমিয়া, ইরাণ, তুরস্ক, সিরিয়া ইত্যাদি অনেক রাষ্ট্রেরই প্রাচীন ইতিহাস 'তৈরী' করে নেওয়া হল উনিশ এবং বিশ শতকে। ঐ 'ইতিহাসে'র কল্যাণে দেশে দেশে ঐতিহ্যসচেতনতা গড়ে উঠল। জাতীয়তাবাদ নামক আইডিয়াটা দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়তে দেরী হল না। এ-সব দেশে না ছিল ঐতিহ্যসচেতনতা—না ছিল জাতীয়তাবাদের ছিটেফোঁটা। এই সচেতনতা এবং জাতীয়তাবোধ পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকাও এনে দিয়েছিল পরাধীন বেশ কিছু দেশের মানুষের মধ্যে। ইতিহাস লেখার সাম্রাজ্যবাদী খেলার ফল আপাত দৃষ্টিতে বুমেরাং হয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধেই চলে গিয়েছিল। প্রশ্ন হল ইতিহাস বানানোর সুদীর্ঘ কালব্যাপ্ত পরিশ্রমের শেষে এই ধরণের উল্টোকাণ্ড ঘটে যাওয়ার পরেও মিথ্যাটা ফাঁস হয়ে পড়লনা কেন। এর উত্তরে বলতে হয় ইতিহাস তৈরীর পুরো কর্মকাণ্ডটা সুগভীর গোপনতার মধ্যেই শেষ হয়েছিল। নানান রাষ্ট্রের অন্তঃচক্রের সহযোগিতায় ঐ 'ইতিহাস' লেখা সম্ভব হয়েছিল। সম্ভব হয়েছিল নানান দেশের সুপণ্ডিত হিসাবে বিজ্ঞাপিত বেশ কিছু ব্যক্তির সক্রিয় সাহায্যে। এছাড়া বেশ কিছু আত্মগোপনকারী পণ্ডিতের নিরলস অধ্যবসায়ও যে ঐ ইতিহাস তৈরীর কিংবা ঐ ইতিহাসের কাঁচা মাল তৈরীর কর্মকাণ্ডের

পিছনে ছিল এটা বুঝে নিতেও কষ্ট হয় না। মোটকথা নামী-অনামী অনেকের সহযোগিতাতেই ইতিহাস লেখা সম্ভব হয়েছিল্। আর সে-সহযোগিতার সবচেয়ে বড় সর্ত ছিল গোপনতা রক্ষা। তাই কোনও রাষ্ট্রের তরফ থেকেই মিথ্যাটা ফাঁস হয়ে পড়ার প্রশ্নই ওঠেনি। ওঠার সুযোগ ছিল না। কারণ সত্যিকথা বলতে কি বিজ্ঞাপন যাই দেওয়া হোক দুনিয়ার শতকরা একশ' ভাগ রাষ্ট্রই জাতীয়তাবাদী। এবং জাতীয়তাবাদের একটা বড় পাথেয় ঐ মিথ্যা ইতিহাস। দেশপ্রেমের মিথ—রাজনৈতিক মিথ সবই বানিয়ে রাখতে হয়। মিথ অর্থে শুধু অতিকথা নয়—নেহাৎ-ই মিথ্যা অনেক গল্পও বানানোর দরকার পড়ে।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের মূল সত্য!

ব্রিটিশ ঐতিহাসিকেরা কয়েকটি বিভ্রান্তিকর মিথ্যাকে ভারত ইতিহাসের মূল সত্য হিসাবে তুলে ধরলেন। এক, হিন্দুধর্ম অত্যন্ত সুপ্রাচীন এবং সুসংহত একটি ধর্ম। দুই, ঐ ধর্মের ধারক ও বাহক সংস্কৃত ভাষাটাও সমপরিমাণে সুপ্রাচীন। তিন, হিন্দু ধর্ম এবং সংস্কৃত-ভাষা শুধু প্রাচীনই নয়—গৌরবোজ্জ্বল অতীতেরও অধিকারী। চার, সর্বভারতীয় মানসিকতার ঐক্যবোধ বেশ মজবুত এবং প্রাচীনও বটে। পাঁচ, হিন্দুধর্মের এবং সংস্কৃত ভাষার স্বর্ণ-যুগ অতীতে শেষ হয়ে গিয়েছে—পরে দুটিরই অবক্ষয় শুরু। ছয়, ভারতসংস্কৃতির মূল উপাদান ধর্ম। এই কটি মিথ্যার সঙ্গে আর এক মোক্ষম মিথ্যা আর্যতত্ত্ব জুড়ে দিয়ে ব্রিটিশ সরকারের ভাড়াটে ঐতিহাসিকেরা ভারতের ইতিহাস 'তৈরী করার' কর্মকাণ্ড শুরু করলেন। আর্যতত্ত্বটাকে ভারতের ঐতিহাসিকেরা লুফে নিলেন। হিন্দু-ঐতিহ্যবাদীদের মহা আনন্দের দিন এসে গেল—রাতারাতি তাঁরা আর্যহিন্দু হয়ে গেলেন। ধর্মের সোনায় আর্যের সোহাগা মিশল। আর্য 'জাতি', সংস্কৃত 'ভাষা' এবং হিন্দু 'ধর্ম'—এই ত্রিতত্ত্বের ত্রিবেণী সংগমে স্নান করে ভারতের ঐতিহাসিকেরা তিনের মহিমাকীর্তনে উঠে পড়ে লাগলেন। তিন 'সুপ্রাচীন'—এর জয়গানই

হল প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের একমাত্র বক্তব্য। ধর্মের ধ্বজাধারী বিবেকানন্দও ঐতিহাসিক সাজলেন। তিনি আর্য-শব্দটাকে পরমানন্দে গ্রহণ করে অর্থহীন দম্ভোক্তি করে বসলেন "Only Hindus are Aryans." অর্থহীন কারণ ঐ আর্য জাতির ধারণাটাই আজগুবি। আজগুবি ঐ হিন্দুধর্মের প্রাচীন প্রচলনের পুরো গল্পটাই।

মিথ্যার জন্মদাতা কে ?

প্রশ্ন উঠবে ঐ-সব মিথ্যার জন্মদাতা কে ? এককভাবে কারুর পক্ষে ঐ জাতীয় বিশাল মিথ্যা বানানো সম্ভব ছিলনা। সুসংগঠিত সুসংহত দীর্ঘকালীন প্রয়াস ছাড়া ঐসব মিথ্যার যে জন্ম হতেই পারতনা—এটা বুঝে নিতে খুব একটা অসুবিধা হয়না। সে-প্রয়াসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বেশ কিছু পণ্ডিত—বেশ কিছু ঐতিহাসিক। কিছু ভারতীয়, কিছু ইউরোপীয়। এসিয়া আফ্রিকার অন্য দেশেরও বেশ কিছু পণ্ডিত যে ঐ কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন তাও বুঝে নিতে কষ্ট হয়না। ভারতীয় পণ্ডিত ভাড়া খাটতেন—সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃতে প্রতারণামার্কা বই লিখতেন। ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদেরা 'তত্ত্ব' প্রতিষ্ঠা করতেন। ঐতিহ্যগর্বী ধর্মপ্রবণ আত্মসন্তুষ্ট ভালো মানুষ তৈরী করার কাজটা স্বচ্ছন্দেই হয়ে যেত।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নামক মিথ্যাটাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখতে গেলে মারাত্মক ভুল হবে। আসলে ঐ ইতিহাসটা দুনিয়ার প্রাচীন ইতিহাস নামক বিশালতর মিথ্যার একটি ভগ্নাংশ ছাড়া কিছুই নয়। ঐ বিশালতর মিথ্যার কথা ভুলে গিয়ে ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা করা যায় না। দুনিয়ার প্রাচীন ইতিহাস যাঁরা বানিয়েছিলেন তাঁরাই বানিয়েছিলেন এই ভারতের ইতিহাস। এই তথ্যটাকে গুরুত্ব দিতে হবে। সর্বাত্মক মিথ্যার সার্বদেশিক চক্রান্তটা বুঝে নিতে এই ছোট তথ্যটার দাম কম নয়। চক্রান্তটা কেউ বোঝেননি বলেই মিথ্যাটা বেঁচে আছে। বেঁচে আছে ঐ 'ইতিহাস'টা।

শ্বেত দ্বৈপায়ন বস' (boss) ভারতে এসে হলেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস। 'বস' মানে arranger, ব্যাস মানেও তাই। মিস্টার 'বস' ভারতে এসে দেখলেন অব্যবস্থার চূড়ান্ত। সবেতেই অরাজকতা চলছে। বইপত্তর নেই ধর্মপুস্তক নেই—দর্শনের গ্রন্থ নেই—এমনকি ইতিহাস পর্যন্ত নেই। শুধু নেই আর নেই। সবই বাড়ন্ত। আর বাড়ন্ত বলে বাড়ন্ত! দর্শন—ইতিহাস এইসব শব্দেরই যে তখনও জন্ম হয়নি। শব্দগুলো না থাকলেও খুব একটা অসুবিধা হয়নি কারণ মিস্টার বস ঐ জাতীয় অনেক শব্দই বানিয়ে নিতে পেরেছিলেন। বানিয়ে নিতে পেরেছিলেন দেশীয় পণ্ডিতদের সহযোগিতায়। ওটা এমন কিছু সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়নি। সমস্যা যেটা দেখা দিয়েছিল সেটা এই চতুর্ভুজমার্কা ভূখণ্ডে মানসিক ঐক্যের বালাই না থাকার। ও-বস্তুটা ভারতে ছিলই না। ধুরন্ধর মিস্টার 'বস' সব ব্যবস্থাই করে দিলেন। শ-দুয়েক বছর সময় পেয়েছিলেন। অসুবিধা খুব একটা হয়নি। রাজ্যের ধর্মপুস্তক লেখানোর ব্যবস্থা হল। উদ্ভট উদ্ভট সব নামের মুনীঋষিদের লেখা বলে ওগুলোকে চালানো হল। ষড়্দর্শন (ষড়যন্ত্রের আর এক নাম) বানিয়ে নেওয়া হল—আর বিদিগিচ্ছিরি সব নামের 'দার্শনিক'দের লেখা বলে ওগুলোকে প্রচার করা হল। মহাভারত আর আঠারো দুগুণে ছত্রিশ খানা পুরাণ (এছাড়া আরও কয়েকটি বইও ছিল) লেখানোর ব্যবস্থা করে নিজের নামেই চালিয়ে দিলেন ব্যাসীভূত 'বস'। ধর্মপুস্তক, মহাকাব্য, শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণের বন্যা বয়ে গেল। বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া বলে প্রচারিত বইগুলোর ওপর পবিত্রতা প্রাচীনত্বের বহর চাপানো হল। 'সুপ্রাচীন' সংস্কৃত ভাষা আর 'সনাতন' হিন্দুধর্মের জোয়ার সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ভারতের মানুষের মানসিক ঐক্যের অভাবটাও দূর করলেন মিস্টার বস। মোক্ষম খেলাটা বাকি ছিল। সেটা ঐ ইতিহাস লেখানোর ব্যাপারটা। দেড় হাজার বছরের প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লেখানোর কাজে হাজার দেড়েক ইউরোপীয় 'ঐতিহাসিক'কে আসরে নামানো হল। জার্মান, ফরাসী, হাঙ্গেরীয়,

ইটালীয়, পোলিশ, রুশীয়—ইউরোপের প্রায় সব জাতের পণ্ডিতদের ডাকা হল ঐ কর্মযজ্ঞে। পণ্ডিতেরা আসর মাত করলেন। শুধু দ্বৈপায়ন পণ্ডিতদের দিয়ে 'ইতিহাস' লেখানোর বিপদ ছিল। লোকে সন্দেহ করে বসত। তাই ঐ ব্যবস্থা। ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের মাল-মসলা, প্রত্নউপকরণ সবই তৈরী করে নেওয়া হল। প্রাচীন লিপির অস্তিত্বই ছিল না। বানিয়ে নেওয়া হল। নাম দেওয়া হল ব্রাহ্মী খরোষ্ঠী গ্রন্থ, ওয়াত্তেলুত্তু, শারদা ইত্যাদি। সুপ্রাচীন নিখুঁত সালতামামি আরোপ করার ব্যবস্থাও হল। বিরাট বিশাল সেই কর্মযজ্ঞ পরিচালনার টাকা পয়সা কোত্থেকে আসত দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। নেপথ্য পণ্ডিতেরা অপূর্ব নিষ্ঠা আর সুগভীর গোপনতার মধ্যে কাজকর্ম করতেন। আর তা করতেন বলেই ঐ 'ইতিহাস'টা প্রামাণ্য সেজে বসে আছে।

'বাল্মীকি'-নামের উৎস

রামায়ণ লেখানো হল। মহাকাব্যের লেখকের নাম কি রাখা যায়? চ্যবন ঋষির পুত্র নাম রত্নাকর। সে ত' সরস্বতী ভর করার আগের নাম। পরেরটা কি হবে? একটা উপাখ্যান বানিয়ে নেওয়া হল। উঁই-টিবিতে তাঁর সর্বাঙ্গ ঢেকে গিয়েছিল—এই রকম একটা উপাখ্যান। উঁইটিবির ইংরাজী anthill (উঁই-এর ভুল ইংরাজী white ant এর সূত্রে)। ant এর ল্যাটিন formica আর ঐ formica-র উচ্চারণ চুরি করে বানিয়ে নেওয়া হল বল্মিক বা বল্মীক বা বল্মিকা বল্মীকা। ফ-এর কাছাকাছি উচ্চারণের ব-এর আদেশ—রলয়োরভেদর কল্যাণে ল-এর আগম—আর 'ইকা'র ব্যবস্থা ত ছিলই। বল্মিক বা বল্মীক হল উঁই বিকল্পে উঁইটিবির সংস্কৃত ছদ্মবেশ। জাতার্থে ষ্ণি-র ব্যবস্থা হতে দেরী হয়নি। ঘষে মেজে শব্দটা দাঁড়াল বাল্মীকি। উপাখ্যানের সঙ্গে নামের সঙ্গতি থাকল। নামটাও সংস্কৃতগন্ধী হল। ব্যুৎপত্তির বহর তৈরী করে নেওয়া হল। অমুক ধাতুর উত্তর তমুক প্রত্যয়ের আয়োজন করেই পণ্ডিতেরা ক্ষান্ত হলেন না—শব্দটার আরও কয়েকটা অর্থও

বানিয়ে নেওয়া হল। সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি থাকবেনা এও কি কখনও হয়! প্রাচীন কালের সংস্কৃতজ্ঞরা যে etymology না জেনে কোনও শব্দকেই ভাষায় ঠাঁই দিতেন না। তাই ঐ ব্যবস্থা। বর্ণচোরা সংস্কৃত শব্দটার ধারে কাছের উচ্চারণের কোনও শব্দই ভারতের ভাষায় নেই। তা না থাক। শব্দটা প্রাচীন সেজে বসল। ভাষাতাত্ত্বিকদের খেলায় শব্দটা অভিধানের কলেবর বাড়ালো। খেলাটা কেউ ধরতে পারেননি এইটাই আশ্চর্যের। ধরা পড়লেও যে খুব একটা বিপদ ছিল তাও নয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের বানিয়ে নেওয়া আর্য-তত্ত্বের আর একটি শব্দগত প্রমাণের ব্যবস্থা হয়ে যেত যদি খেলাটা প্রকাশ হয়ে পড়ত।

প্রাচীন লিপি প্রসঙ্গ

প্রাচীন ভারতে কি কোন লিপি প্রচলিত ছিল ?

প্রাচীনকালে ভারতে কি আদৌ কোনও লিপি প্রচলিত ছিল ? এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে কিছু প্রশ্ন রাখা যাক। এক, প্রাচীনকালে প্রচলিত বলে প্রচারিত সংস্কৃত সাহিত্যের লিখিত অস্তিত্বের স্বপক্ষে কোনও প্রাচীন নজীর পাচ্ছিনা কেন ? সংস্কৃত লেখার ব্যবস্থা ছিলনা কেন ? কেনই-বা ঐ সাহিত্যকে শ্রুতি-পরম্পরা স্মৃতিপরম্পরা নামক লিপিনিরপেক্ষ আজগুবি বায়বীয় অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়েছিল ? আমাদের তথাকথিত প্রাচীন সাহিত্যের ষোল আনা অংশ কেন বাঙ্ময় অস্তিত্বের ম্যাজিক দেখাতে গেল ? সাহিত্যের সমার্থক শব্দ হিসাবে 'বাঙ্ময়' শব্দটা ব্যবহার করার দরকারই বা পড়ল কেন ? 'বাঙ্ময় সাহিত্য' কি সোনার পাথরবাটির মত শোনাচ্ছে না ? সোজা কথায় ঐ সাহিত্যটা কেন মুখে মুখে চলত ? দুই, ইতিহাসে পাচ্ছি তখন নাকি ব্রাহ্মী লিপি চালু ছিল। চালু ছিল খরোষ্ঠী লিপিও। দু-দুটো লিপি চালু থাকা সত্ত্বেও সংস্কৃত লেখার কাজে কোনটারই সাহায্য নেওয়া হয়নি কেন ? ধ্বনি-একক (Phoneme)-সমৃদ্ধ 'বৈদিক' বা সংস্কৃত ভাষা প্রকাশ করার ক্ষমতা কি ঐ ব্রাহ্মীলিপির ছিল না ? পণ্ডিতদের দেওয়া তথ্যে পাচ্ছি ঋগ্বেদে ৬৪টি আর যজুর্বেদে ৬৩টি ধ্বনি-একক ব্যবহার করা হয়েছিল। এবং ব্রাহ্মীলিপিতে ৪৬টি ধ্বনি-একক প্রকাশ করার ক্ষমতা ছিল। কল্পিত ঐ তথ্যটির মধ্যে সত্যতা থাকলে সামান্য কিছু পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে ঐ লিপিতে কাজ চালিয়ে নেওয়ার অসুবিধাটা কোথায় ছিল ? তিন, সে অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও বেশ কয়েক জায়গায় ঐ ব্রাহ্মীলিপিতে সংস্কৃত শিলালিপি লেখার ব্যবস্থা কেন নেওয়া হয়েছিল ? চার, তথাকথিত অশোক শিলালিপিতে ব্রাহ্মী

অক্ষরে না-সংস্কৃত না-প্রাকৃত উদ্ভট ভাষা কেন ব্যবহার করা হয়েছিল ? কোন প্রশ্নেরই উত্তর পাচ্ছি না। তবে বুঝতে কষ্ট হয়না পণ্ডিতদের দৃষ্টিটাকে ঐ উদ্ভট ভাষার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যই ঐ বিকটদর্শন ভাষার ব্যবহার করা হয়েছিল। বুঝতে কষ্ট হয়না উদ্ভট ভাষার ঐ শিলালিপির সবই জাল। ওগুলো যে সবই জাল সেটা প্রমাণ করব ঐ লিপি এবং দু-একটি অশোক-শিলালিপির বক্তব্য বিশ্লেষণ করেই। সে-বিশ্লেষণটা রাখব পরে। অশোক নামক কল্পিত মৌর্যসম্রাটের ঐতিহাসিকত্ব এবং সাড়ে পনেরো আনি ভারতের অধীশ্বরত্ব প্রতিপাদনের জন্যই যে সারা ভারতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা জাল লেখগুলি তৈরী করে রাখা হয়েছিল—এটা বুঝে নিতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয়না। বুঝে নিতে অসুবিধা হয়না ঐসব জাল 'লেখ' রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল ব্রিটিশ আমলেই। প্রাচীনকালে নয়। প্রমাণ হিসাবে বলব ঐসব শিলালিপির লিপিটাই জাল এবং সে-লিপির 'উদ্ভাবন' হয়েছিল ঐ ব্রিটিশ আমলেই। তার আগে নয়। 'অশোকস্তম্ভের রহস্য' শীর্ষক পরবর্তী একটি অধ্যায়ে এ-সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য রেখেছি।

ব্রাহ্মী লিপির নামকরণ রহস্য

ব্রাহ্মী লিপির নামকরণের প্রশংসা করতেই হয়। দেবলোকের বাসিন্দা ব্রহ্মার নাম জড়িয়ে লিপির নামকরণের খেলাটা বেশ ভালোই খেলা হয়েছিল। লিপিটা নাকি স্বয়ং ব্রহ্মাই বানিয়ে নিয়েছিলেন। এবং সেইজন্যই নাকি লিপির ওপর ঐ সুন্দর নামটা আরোপ করা হয়েছিল। সত্যিই ত' সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা যখন ব্রহ্মা তখন লিপিটাই-বা তিনি বাদ রাখবেন কেন? রাখতে যাবেন-ই-বা কেন? নামকরণের মাহাত্ম্যে কিনা জানিনা পণ্ডিতেরা লিপির প্রশংসা ত' করলেনই—করলেন ঐ নামেরও প্রশংসা। ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা Linguistic Survey of India : Languages and scripts প্রবন্ধের পাদটীকায় একটি ছোট্ট মন্তব্য পাচ্ছি।

"The name 'Brahmi' was applied to the script rather arbitrarily ; nevertheless, it seems to be correct."

যদিও arbitrarily আরোপিত তবু নাকি নামকরণটি যথার্থই হয়েছিল। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। পাদটীকার ঐ মূল্যবান মন্তব্যটা আসলে কে লিখেছেন তা জানার উপায় নেই। কারণ ঐ পাদটীকায় সম্পাদক বা অন্য কারুর নাম লেখা হয়নি।

ব্রাহ্মী লিপির উদ্ভাবন রহস্য যাতে কেউ না ধরে ফেলেন সেইজন্যই ব্যবস্থা হয়েছিল নানা রকম বিভ্রান্তি আনার। দেশীবিদেশী অনেক পণ্ডিতকেই কাজে লাগানো হয়েছিল বিভ্রান্তি আনার উপযোগী নানা রকম তথ্য যোগান দেওয়ার জন্য। ঐসব পণ্ডিত অত্যন্ত নিপুণভাবেই কাজটি করেছেন। সেমিটিক লিপি থেকে ব্রাহ্মী লিপির জন্মের গল্প শোনানো হয়েছিল। শোনানো হয়েছিল বিভ্রান্তিটা পাকাপোক্ত করার জন্যই। সাহেব পণ্ডিতেরা নিজেদের মধ্যে তর্কের ঝড় তুলেছিলেন। সবটাই অভিনয়। সত্যি নয়। 'ঝড়' থেমে গেলে দেখা গেল ঐ লিপির সেমিটিক উৎস সম্পর্কে অধিকাংশ পণ্ডিতই একমত। দু-চার জন পণ্ডিত মোহেন-জো-দড়োর লিপি থেকে ব্রাহ্মীর উৎপত্তির গল্পও শুনিয়েছেন।

খরোষ্ঠী লিপি সম্পর্কেও বিদেশী পণ্ডিতদের একই ভূমিকা ছিল— ভূমিকাটা বলা বাহুল্য বিভ্রান্তি সৃষ্টির। লিপির উদ্ভট নামকরণ সম্পর্কেও কম তর্কের অভিনয় হয়নি। অভিনয়ের শেষে পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ঐ লিপি নাকি অ্যারেমেইক লিপি থেকে ক্রমপরিবর্তনের খেলা খেলতে খেলতে এসে হাজির হয়েছিল পশ্চিম ভারতে। লিপিদুটোর মধ্যে সত্যিকারের কোনও মিল থাক বা না থাক আর ঐ অ্যারেমেইক লিপির আদৌ অস্তিত্ব ছিল কিনা না জেনেই ভারতীয় পণ্ডিতেরা নির্বিবাদে ঐ তত্ত্ব মেনে নিয়েছেন। জাল লিপি দুটোর জালিয়াতি কেউই ধরতে পারেননি। ধরতে পারেননি বিদেশী পণ্ডিতদের বিভ্রান্তি-সৃষ্টির সুসংহত প্রয়াসটাকেও। সেমিটিক অ্যালফাবেট কি করে চরিত্র

বদলে ফেলল—কি করে অ্যালফাবেটের চরিত্রলক্ষণ ভুলে গিয়ে এমনকি সিলেবারির অবস্থা পেরিয়ে এসে 'কারেক্টার'-এ পর্যবসিত হয়ে বসল এই সহজ প্রশ্নটা নিয়ে কেউই মাথা ঘামালেন না। তামিল বাদে ভারতীয় তাবৎ ভাষার অক্ষর যে ধর্মেকর্মে স্বকীয়তা সম্পন্ন—ভারতের বাইরে যে ঐ জাতের কারেক্টার-এর প্রচলন নেই এই সোজা কথাটাকে কেউই গুরুত্ব দেননি।

ব্রাহ্মী লিপির উদ্ভাবন রহস্য

পণ্ডিতেরা সেমিটিক উৎস থেকে ব্রাহ্মী লিপির উৎপত্তি সম্পর্কে যত তত্ত্বই দিন না কেন বুঝতে কষ্ট হয় না ব্রহ্মা তাঁর স্বগোত্র নামের সেমিটিক আব্রাহাম বা ইব্রাহিমদের দেশ থেকে লিপি চুরি করে আনেননি—এনেছিলেন খোদ রোম কিংবা এথেন্স থেকেই। না হলে তাঁর সৃষ্টি করা ঐ ব্রাহ্মী লিপিতে গ্রীকো-রোমক লিপির 'বেশকিছু অক্ষরের সঙ্গে মিলজুল-ওলা অক্ষর দেখছি কেন? রোমক লিপির একুশটা অক্ষর [এর মধ্যে গ্রীক এবং রোমক লিপির সাধারণ (Common) অক্ষরও কিছু আছে] আর গ্রীকলিপির পাঁচটি অক্ষরের সঙ্গে মিল-যুক্ত অক্ষর ঐ ব্রাহ্মীলিপিতে সনাক্ত করে নিতে কি খুব একটা অসুবিধা হয়? বড় হাতের অক্ষর—ছোট হাতের অক্ষর বাদ ত' তিনি কিছুই দেননি। সবই এনে হাজির করেছেন। সজ্ঞানে এত চুরিও মানুষে করে! কায়দাও কিছু কম করেননি, কোথাও লিপি অবিকৃত ভাবে এসে গেছে যেমন :—

C=ট ; D=ধ ; E=জ ; l=র ; J=ল ; L=উ ; O=ঠ ; .=থ ; I=ণ ; ক্রস বা যুক্ত চিহ্ন + =ক ; ব্রাহ্মীর একটি রূপভেদে + =স।

কোথাও বা সামান্য কিছু বিকৃতির মধ্য দিয়ে। যেমন :—

S=র ; Z=ও ; W=য় ; N=ড ; U=প ; F=শ ; C=তামিল ব্রাহ্মীর ঙ ; T=শ।

রোমক লিপি উল্টে নিয়েও কিছু ব্রাহ্মী অক্ষর বানিয়ে নেওয়া হয়েছে :—

V উল্টে গ ; T উল্টে ন ; A উল্টে ম ; Y উল্টে ত ; J উল্টে তামিল ব্রাহ্মীর একটি অক্ষর। কায়দা আরো কিছু করেছেন ঐ ব্রহ্মা। রোমক লিপির দক্ষিণমুখী অক্ষরকে বামমুখী করেও কিছু অক্ষর তৈরী করে নিয়েছেন তিনি : K বামমুখী হয়ে অ ; D বামমুখী হয়ে ধ।

দাঁড়ানো অক্ষরকে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা অনন্তশয়ান বানিয়ে নিয়েছেন। E কে শুইয়ে ⧢ = ঘ ; H কে শুইয়ে ⌶ = ণ। D কে শুইয়ে ⋃ = তামিল ব্রাহ্মীর ম। B কে শুইয়ে ⵠ = ৮০ (আশি)। ছোট হাতের রোমক লিপিগুলোও কাজে লাগানো হয়েছে। যেমন :—

b = ফ ; d = চ ; ছোট হাতের টানা *l* = প ; h = ঞ ; t = ষ ; একটু কায়দা করা h = ত ; ছোট হাতের টানা *l* উল্টে ব্রাহ্মীর খ বানানো হয়েছে ; ছোট হাতের টানা b থেকে বানানো হয়েছে 'হ'।

ব্রহ্মার হামলার হাত থেকে বেঁচেছিল রোমক লিপির মাত্র পাঁচটা অক্ষর G M P Q R। d-কে p-এর উল্টে নেওয়া রূপ মনে করলে p-টাকেও বাদ দেওয়া যায়। বেঁচে যাওয়া অক্ষরের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র চার। বলে রাখা ভালো রোমক লিপিমালায় J U W ছিলই না।

চুরির বাহাদুরী আছে বৈকি।

গ্রীক লিপিরও কয়েকটি অক্ষর ঐ ব্রহ্মা চুরি করেছিলেন : গ্রীক লিপির বড় হাতের 'ডেল্টা' Δ ব্রাহ্মীতে এসে 'এ' হয়েছে। আর ঐ লিপির ছোট হাতের 'মিউ' μ অক্ষর থেকে তৈরী করে নেওয়া হয়েছে ব্রাহ্মীর 'ঝ'। গ্রীক 'শাই' ψ অক্ষর থেকে তামিল ব্রাহ্মীর 'ল' (= ড়) এর ব্যবস্থা হয়েছে। একটু কায়দা করা গ্রীক আলফা α = ব্রাহ্মী ১০ আর গ্রীক থিটা θ = ব্রাহ্মী ২০।

ভালো কথা। ব্রহ্মার নজর এড়িয়ে যাওয়া পাঁচটা অক্ষরের তিনটা অক্ষর খরোষ্ঠী লিপি লেখার কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল : G P এবং R। তথাকথিত খরোষ্ঠী লিপি সম্পর্কে আলোচনা পরে করা যাবে।

কয়েকটা প্রশ্ন আসছেই। এক, রোমক লিপির সঙ্গে ব্রাহ্মীলিপির এ-হেন প্রচণ্ড মিল থাকা সত্ত্বেও ঐ লিপির ওপর 'ব্রাহ্মী' নাম আরোপ করার ব্যবস্থা কেন নেওয়া হয়েছিল? দুই, পণ্ডিতছদ্মবেশী 'আঁতেল' গোয়েন্দারা রোম থেকে 'রোমাঞ্চকর' ঐ লিপি-চুরির তথ্যটি কেন চেপে গিয়েছিলেন? তিন, 'আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া'র পোষ্য পণ্ডিতেরাই শুধু ঐ গোয়েন্দার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন কেন? সার্ভের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না এমন কোনও পণ্ডিতের নাম ঐ গোয়েন্দাদের মধ্যে পাচ্ছি না কেন? তবে কি সহজবোধ্য ঐ মিল থাকার তথ্য থেকে পণ্ডিতদের দৃষ্টিটাকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যই 'আদিপাপী' ঐসব ভাড়াটে পণ্ডিত কোমর বেঁধেছিলেন? রাজ্যের বিভ্রান্তি-সৃষ্টির তাগিদেই কি ভূতুড়ে লিপি থেকে ব্রাহ্মী লিপির জন্মের গল্পটা ওঁরা বানিয়েছিলেন? তাইত আসছে।

প্রশ্ন আরও আসছে। চুরিবিদ্যাবিশারদ্ ঐ ব্রহ্মাটি আসলে কে? ব্রহ্মা নামক শব্দটির ওপর দেবসত্তা আরোপ করার বহর চাপালেও বুঝতে কষ্ট হয়না ঐ ব্রহ্মা-কল্পনার জন্ম ইংরাজদের ভারতে আসার আগে হয়ইনি। ব্রহ্মা শব্দটার সঙ্গে ভারতের অধিবাসীদের পরিচয়ই ছিল না। শব্দটির উদ্ভট ব্যুৎপত্তির বহর বানিয়ে নিলেও বুঝতে কষ্ট হয়না ঐ ব্রহ্মার নামকরণ হয়েছিল সেমিটিক কল্পিত 'আদি-পুরুষ' আব্রাহাম শব্দ থেকেই। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়—এই ত্রিকাণ্ডের প্রথম কাণ্ডের 'কর্তা' হিসাবে ঐ 'ব্রহ্মা'র 'আবির্ভাব' ঘটেছিল। ঘটেছিল ব্রিটিশেরা আসার পরে। বিচিত্রদর্শন ঐ ব্রহ্মা শব্দের 'হ্ম' অক্ষরটা ভারতের কোনও লিপিতেই ছিলনা। (বিস্তৃততর তথ্য 'সংস্কৃত ভাষা কি সত্যই প্রাচীন?' শীর্ষক পরিচ্ছেদে রেখেছি।)

অনেকে প্রশ্ন করবেন রোমক লিপির যে সমস্ত অক্ষরের সঙ্গে ব্রাহ্মী অক্ষরের মিল পাওয়া যাচ্ছে ভাষা দুটোয় সেইসব অক্ষরের উচ্চারণের মধ্যে সমতা নেই কেন। T উল্টে ব্রাহ্মীর 'ন' হল। T-এর উচ্চারণ কি 'ন'-এর সমান? J অক্ষর দিয়ে 'ল' বানানো হল। J-এর উচ্চারণ কি

'ল'-এর মতন ? সত্যিই ত' উচ্চারণের মিল যে কিছুই নেই। তবে গোলমালটা কোথায় ? চোর কি ধরা পড়ার ব্যবস্থা রেখে চুরি করে ? শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করলেও ধরা পড়তে হয়। অক্ষরগুলো চুরি করা হল আর ব্যবহার করা হল সম্পূর্ণ অন্য উচ্চারণ প্রকাশ করার জন্য। ব্যবস্থাটা এইরকমই হয়েছিল। হয়ে ছিল মাছ ঢাকার জন্য।

উচ্চারণের দিক দিয়ে দুটো লিপিতে মিল আছে এমন কিছু অক্ষর চুরিরও আয়োজন হয়েছিল। রায়বাহাদুর গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা মহাশয় তাঁর "ভারতীয় প্রাচীন লিপিমালা" গ্রন্থে ঐ জাতীয় কয়েকটি অক্ষরের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি রোমক লিপির প্রথম ছ'টা অক্ষর থেকে ব্রাহ্মী লিপির সম-উচ্চারণ বিশিষ্ট ছ'টা অক্ষরের ক্রমপরিবর্তনের ছক এঁকে বোঝাতে চাইলেন কি পদ্ধতিতে ঐসব অক্ষরের রূপপরিবর্তনটা ঘটেছে। এত বড় একটা সত্যি কথা তিনি লিখে ফেললেন অথচ কোনও পণ্ডিতই কথাটাকে গুরুত্ব দিলেন না। অ, ব, চ, দ এবং ফ-এর সত্যিকারের জন্মবৃত্তান্তটাই তিনি দিলেন। পুরো বইটাতে রাজ্যের মিথ্যার মধ্যে ঐটুকুই সত্যি কথা। (ছক-টা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)

প্রশ্ন উঠবে মিথ্যার কারবারীরা ঐ ছোট্ট সত্যি কথাটা বললেন কেন। ওটা মিথ্যাকে বাঁচিয়ে রাখার একটা কায়দা। কিছু সত্যি কথা পরিকল্পিত ভাবেই রাখা হয় যাতে পণ্ডিতেরা বিভ্রান্ত হন। যাতে পণ্ডিতেরা ঐ অকপট ভাষণকে সততা বলে মনে করে বসেন সেইজন্যই ব্যবস্থাটা নেওয়া হয়।

ব্রাহ্মী লিপির স্বরচিহ্ন সৃষ্টির মহিমা

ব্রাহ্মী লিপির স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ তৈরী করে নেওয়া হল গ্রীকো-রোমক লিপি থেকে পুকুর চুরি করার মধ্য দিয়ে। মুশ্‌কিল দেখা দিল স্বরচিহ্ন প্রকাশ করতে গিয়ে। আ-কার, ই-কার, ঈ-কার ইত্যাদি। শুধু স্বরবর্ণ—ব্যঞ্জনবর্ণ বানিয়ে নিলেই কাজ শেষ হয়না। ভারতীয় লিপিমালাগুলোর জনক সাজতে গেলে শুধু অ্যালফাবেট হলেই চলেনা।

চলেনা 'সিলেবারি'র মতন হলেও। হতে হয় 'কারেক্টার' অর্থাৎ স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, স্বরান্ত ব্যঞ্জনবর্ণ, সংযুক্তবর্ণ এবং স্বরান্ত সংযুক্তবর্ণের পাঁচ রকমের অক্ষরসমন্বিত ব্যবস্থা। স্বরচিহ্নগুলো ব্যঞ্জনবর্ণের মাথায় বা নীচে, পাশে বা কোলে-কাঁকালে জুড়ে দেওয়ার দরকার পড়ে। না হলে যে 'বিবর্তিত' লিপিগুলোর আদিরূপ হিসাবে ঐ ব্রাহ্মীকে কেউ বিশ্বাসই করবেন না। স্বরচিহ্ন জুড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা ঐ জন্যই রাখতে হল ব্রাহ্মী লিপিতে। সে-ব্যবস্থা করতে গিয়েই বাধল গোলমাল। ই-এর ব্রাহ্মী প্রতিরূপ তিনটি বিন্দু দিয়ে তৈরী—একটি কল্পিত ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দু। অথচ ই-কারের রূপ দেওয়া হল ব্যঞ্জনবর্ণের ওপরে কোথাও বৃত্তাকার চিহ্ন দিয়ে—কোথাও-বা ওপরে হাফদাঁড়ি দিয়ে। আ-কারের চিহ্ন কোথাও হল অক্ষরের মাথার ডানদিকে হাফলাইন—কোথাও-বা ঐ হাফলাইনের শেষে বিলম্বিত দাঁড়ি অর্থাৎ বাংলা-নাগরীর আ-কারের মত। ব্রাহ্মীর 'ঈ' চারটি বিন্দু দিয়ে তৈরী—একটি কল্পিত চতুর্ভুজের চারটি কৌণিক বিন্দু। অথচ ঈ-কার বানানো হল ব্যঞ্জন-বর্ণের ওপরে একজোড়া হাফদাঁড়ি দিয়ে—কোথাও-বা নাগরীর ঈ-কারের মত চিহ্ন দিয়ে। গ্রীক Δ অক্ষর দিয়ে ব্রাহ্মীর 'এ' বানানো হল অথচ এ-কার চিহ্নটা কোথাও তামিল এ-কারের মত—কোথাও আবার অক্ষরের ওপরে বাঁয়ে হাফলাইনের মত। ভারতীয় লিপিমালার বেশ কিছু স্বরচিহ্নে সেই সেই স্বরবর্ণের আংশিক প্রকাশ দেখা যায়। যেমন আ, এ, ঐ, ঔ। ঋ-এর কথা বাদই দিলাম। কারণ ঐ 'ঋ' ভারতীয় কোন লিপিতেই আদিতে ছিল না। সংস্কৃত নামক অত্যাধুনিক ভাষা 'উদ্ভাবন'-এর সূত্রেই ঐ 'ঋ'-এর 'আবির্ভাব' ভারতীয় লিপিগুলোতে ঘটেছে। (বিস্তৃত আলোচনা পরে করা যাবে)। মোটকথা স্বরবর্ণের আংশিক প্রকাশও ব্রাহ্মীলিপির স্বরচিহ্নগুলোতে ঘটেনি—এইটা লক্ষণীয়। দক্ষিণী ব্রাহ্মী লিপিতে স্বরচিহ্ন প্রকাশ করার কাজে খেলাটা একটু বেশী মাত্রায় করা হয়েছিল। অশোক ব্রাহ্মীতে কম। স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণ বানিয়ে নেওয়ার কাজে খেলাটা ঐ মাত্রায় করতে হয়নি।

হয়নি কারণ স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণের চিহ্নগুলো গ্রীকো-রোমক লিপি থেকে চুরি করতে গিয়ে ভারতীয় লিপির সঙ্গে মিলজুল আছে এমন চিহ্ন ঐ লিপিতে খুব কমই রাখা সম্ভব হয়েছিল। সম্ভবত সেই জন্যই স্বরচিহ্নের দিক দিয়ে ভারতীয় সাজার ব্যবস্থা হয়েছিল। তাই 'তামিল-ব্রাহ্মী'র এ-কার চিহ্নের সঙ্গে বাংলা বা তামিলের এ-কারের কিছুটা মিল এসে গেছে।

রোমক লিপির Z-এর অনুকরণে তৈরী করে নেওয়া ব্রাহ্মী 'ও'-অক্ষরের উর্ধ্বাংশ থেকে ব্রাহ্মী এ-কারের চিহ্নটা আর নিম্নাংশ থেকে আ-কারের চিহ্নটা বানিয়ে নেওয়া হল। এ-ব্যবস্থা হল অশোক শিলালিপির ব্রাহ্মীতে। ব্যঞ্জনবর্ণের আগে এ-কার এবং পরে আ-কার বসিয়ে ও-কার বোঝাবার ব্যবস্থা বাংলা, ওড়িয়া, তামিল ও মালয়ালাম লিপিতে আছে। এ-কার এবং আ-কার সহযোগে ও-কার প্রকাশ করার ব্যবস্থা দক্ষিণী ব্রাহ্মীলিপিতে থাকা সত্ত্বেও ঐ লিপি থেকে উদ্ভূত বলে প্রচারিত তেলুগু বা কানাড়ী লিপিতে চালু হল না কেন? বাংলা বা ওড়িয়া লিপিতেই বা চালু হ'ল কি করে? ওদুটো লিপি কি দক্ষিণী ব্রাহ্মী থেকে উদ্ভূত? এ-সব প্রশ্নের উত্তর পণ্ডিতেরা দেননি। তথাকথিত তামিল-ব্রাহ্মী বা দাক্ষিণাত্যব্রাহ্মী লিপি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখলেন:

"In the Deccan and South India, we note two other main groups: One is the Telugu-Kannada group, Telugu and Kannada forming practically two styles of the same form of the Deccan Brahmi".

তেলুগু এবং কানাড়ী লিপি যে একই লিপির দু-রকম লিখনভঙ্গী সেসম্পর্কে সন্দেহের প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ও-দুটো লিপি যে দাক্ষিণাত্য-ব্রাহ্মীরই দুটো স্টাইল এ-কথা বললে কোনও ক্রমেই মেনে নেওয়া যায়না। যায়না কারণ তেলুগু-কানাড়ী লিপির সঙ্গে ঐ দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মীর কোনও দূরাগত সাদৃশ্যও নেই। লীলায়িত ভঙ্গীর ঐ

ব্রাহ্মী লিপির সঙ্গে তেলুগু-কানাড়ী লিপির আপাতসাদৃশ্য (ভঙ্গীসাদৃশ্য বললেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়) দেখে অনেকে বিভ্রান্ত হয়েছেন। ঘটনা হচ্ছে এই। আসলে ঐ বিভ্রান্তি আনার জন্যই যে লীলায়িত ভঙ্গীর ব্যবস্থা হয়েছিল এটা বুঝে নিতে কষ্ট হয়না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে মিল কি কিছুই নেই? তেলুগু লিপির তিনটি অক্ষরের সঙ্গে দক্ষিণী ব্রাহ্মী লিপির তিনটি অক্ষরের কিছু মিল পাওয়া যাচ্ছে। কিছু মিল আছে তেলুগু 'গ' এবং ব্রাহ্মী 'গ'-এর মধ্যে। বলা বাহুল্য এক্ষেত্রে উচ্চারণেরও সমতা আছে লিপিদুটোতে। আর মিল পাচ্ছি তেলুগু 'ঠ' এবং ব্রাহ্মীর 'থ'-এর মধ্যে। পাচ্ছি তেলুগু 'র' এবং ব্রাহ্মী 'ম'-এর মধ্যে। এই দুই ক্ষেত্রে লিপিদুটিতে অক্ষর দুটোর উচ্চারণের সমতা যে নেই তা বলাই বাহুল্য। সে যাই হোক, ঐ তিনটি ক্ষেত্রে মিলটা আছে কেন এ-প্রশ্ন উঠবেই। এ-প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় সর্বলিপিসমন্বয়ের সিনথিসিস-মার্কা ঐ ব্রাহ্মী লিপিতে যে ভারতের প্রায় সব লিপিরই কিছু নমুনা রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। নাগরীর ছ, দ, ঢ, ং এবং ঃ এই 'পঞ্চব্যঞ্জন', গুরুমুখীর ঘ এবং ন(=ব্রাহ্মীর 'ত') গুজরাতির ভ, তামিলের প এবং য় (=ব্রাহ্মীর ঘ); মালয়ালামের অন্তঃস্থ ব (=ব্রাহ্মীর ল) এবং ওড়িয়ার ঠ—সবই যে আছে ঐ ব্রাহ্মী লিপিমালায়। তেলুগু লিপির তিনটি অক্ষর ঐ লিপিমালায় থাকলে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? অশোক-ব্রাহ্মী লিপিতে বাংলা লিপির নমুনা একটিও নেই। তবে ঐ লিপির নানান রূপভেদের একটিতে বাংলা ২-এর সন্ধান পাচ্ছি। দক্ষিণী ব্রাহ্মীর 'ত্র' সঙ্গে বাংলা ত্র-র বেশ মিল রয়েছে। এছাড়া তথাকথিত গুপ্ত ব্রাহ্মী লিপির ঢ= বাংলা ঢ; ঐ লিপির ষ=বাংলা ঝ। আট কিসিমের ব্রাহ্মী লিপি বানাতে গিয়ে কম কিসিমের অক্ষর চুরি করতে হয়নি!

ব্রাহ্মী লিপির ক্রমপরিবর্তনের ম্যাজিক

ব্রাহ্মীলিপি থেকে ভারতের উর্দু-কাশ্মীরী-সিন্ধী-বাদ দিয়ে তাবৎ

(এবং বর্হিভারতেরও কয়েকটা) লিপির 'ক্রমবিবর্তনের' তত্ত্বটা বেশ সুন্দর কায়দায় উপস্থিত করা হয়েছিল। যে উর্বরমস্তিষ্ক থেকে সুপ্রাচীন ঐ ব্রাহ্মীলিপির জন্ম হয়েছিল সেই মস্তিষ্ক থেকেই 'বিবর্তনের' ক্রম-নির্দেশও তৈরী হয়ে গেল। লিপির হাত পা গজালো। প্রয়োজনের তাগিদে ঐ হাত-পা বিচিত্র কায়দায় ছোট বা বড় হল কিংবা লুপ্ত হল। কোথাও বা বিচিত্রতর কায়দায় রেখা বঙ্কিম রূপ পেল। এবং কিমাশ্চর্যম্ 'বিবর্তনের' নানা কায়দার শেষ পর্যায়ে দেখা গেল ভারতীয় এবং অভারতীয় নানা লিপির আবির্ভাব। লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে এই যে লিপির ক্রমবিকাশের এই ম্যাজিকটা কিন্তু বাইরের কোনও নিরপেক্ষ পণ্ডিত দেখালেন না। দেখালেন মিথ্যার চক্রীরা। আরও পরিষ্কার করে বলি। প্রচণ্ড মিথ্যার ধারক ও বাহক ঐ আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার পোষ্য পণ্ডিতেরাই ঐ ম্যাজিকটা দেখালেন। এক পণ্ডিতের নাম পাচ্ছি। রায়বাহাদুর গৌরীশংকর হীরাচাঁদ ওঝা। ভদ্রলোক পাণ্ডিত্যের জোরে রায়বাহাদুর হয়েছিলেন, না অন্য কোনও কারণে তা বলার দরকার আছে কি?

বৈদিক সাহিত্য কি ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা হত?

ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ঐ ব্রাহ্মীলিপি সম্পর্কে এক জায়গায় লিখেছেন।

But, as a matter of fact, this Brahmi alphabet, which was current in about AD 300 throughout the greater part of India, was employed to write not only the Prakrit vernaculars of the period, but also Sanskrit, including the Vedic, as we can reasonably presume."

ব্রাহ্মীলিপি যে প্রাকৃত, সংস্কৃত এমন কি বৈদিক ভাষা লেখার কাজেও ব্যবহার করা হত—এ-তথ্য কি সঙ্গত কারণে সত্য বলে ধরে

নেওয়া যায় ? যায় না কারণ প্রাকৃত, সংস্কৃত কিংবা বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীন অস্তিত্বের তথ্যটাই মিথ্যা। শ্রুতি আর স্মৃতি নামক দুই কল্পিত ডানায় উড়ে বেড়ানো বৈদিক বা সংস্কৃত সাহিত্যের জন্মই তখনো হয়নি। হয়নি সংস্কৃত ভাষার পরিকল্পিত বিকৃতির মধ্য দিয়ে তৈরী করে নেওয়া ঐ প্রাকৃত ভাষাগুলোর জন্ম। হয়নি 'ব্রহ্মার তৈরী' ঐ ব্রাহ্মীলিপির প্রচলন। তাই বলতেই হয় উদ্ধৃতিটা অতিকল্পনাদুষ্ট। সত্যের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নেই ঐ বক্তব্যের।

ফিনিশীয় লিপি কি সত্যিই ব্রাহ্মী লিপির উৎস ?

ব্রাহ্মীলিপির জন্মরহস্য সম্পর্কে সাহেব পণ্ডিতেরা নানান রকম বিভ্রান্তিকর তথ্য দিলেন। ফিনিশীয়রা নাকি ভারতবাসীদের লিপি-জ্ঞান শিখিয়েছিলেন। ভারতের মানুষ আরবে যেতেন ব্যবসা করতে। আর ওখান থেকেই নাকি লিপির আমদানী। ফিনিশীয়দের নিজেদের অস্তিত্ব আদৌ ছিল কিনা এ-প্রশ্ন কেউ তুললেন না। কল্পিত ফিনিশীয়দের কল্পিত লিপির সমুদ্রযাত্রার গল্প শোনানো হল। ভারতীয় পণ্ডিতেরা সেই আজগুবি গল্পটাকে সত্য বলে মনে করে বসলেন। সেমিটিক ভাষাভাষীদের কাছে ভারতবাসীরা কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হল ইতিহাসের খেলায়।

পণ্ডিতেরা তত্ত্ব এগিয়ে দিয়েই খালাস। সত্যি সত্যিই ঐ ফিনিশীয় লিপির সঙ্গে ব্রাহ্মী লিপির আত্মীয়তা আছে কিনা খোঁজ করতে গিয়েই দেখা গেল সে-আত্মীয়তার ছিটেফোঁটাও নেই। আর থাকবেই বা কি করে ? এক অস্তিত্বহীনের সঙ্গে আর এক অস্তিত্বহীনের আত্মীয়তা খোঁজার চিন্তাটাই যে আজগুবি। ফিনিশীয় নামে কোনও লিপির প্রচলন ছিলই না। যেমন ছিল না ঐ ব্রাহ্মী নামক লিপিটার। রোমকলিপি চুরি করে ব্রাহ্মী আর খরোষ্ঠীলিপির 'জন্মের' ব্যবস্থা যাঁরা করেছিলেন তাঁরাই মধ্যপ্রাচ্যের 'প্রাচীন' ভাষার লিপির জন্ম দিয়েছিলেন গ্রীকলিপির পরিকল্পিত বিকৃতির আয়োজন করে। এই বিকৃতির মধ্য দিয়েই জন্ম

নিয়েছিল ঐ ফিনিশীয় লিপি। জন্ম নিয়েছিল ঐ মোয়াবাইট, এলিবাল, ইয়েখিমিল্‌ক্‌, শাফাৎবাল্‌, আস্‌রুবাল্‌ ইত্যাদি লিপিগুলো। জন্ম নিয়েছিল আরেকটি অস্তিত্বহীন ভাষার ঐ অ্যারেমেইক লিপি।

প্রশ্ন উঠবে এতগুলো জাল লিপি বানিয়ে নেওয়ার দরকারটা পড়ল কেন? দরকার ছিল বৈকি। এক একটি লিপির প্রচলনের আনুমানিক সালতামামি আরোপ করার বছর দেখে বুঝে নিতে কষ্ট হয় না প্রাচীনত্বের স্ট্যাম্পমারা তথ্যগুলোর সালতামামি যাতে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে সেইজন্যই ঐ ব্যবস্থা। এক জায়গায় ইয়েখিমিল্ক্‌ লিপির সন্ধান পাওয়া গেল বলে প্রচার করা হল। সঙ্গে সঙ্গেই আনুমানিক সাল তারিখ চাপিয়ে দেওয়া হল। চার্ট তৈরী করাই থাকে। সালটা বসিয়ে দিলেই হল। এই রকম ব্যবস্থা। তৈরী করে নেওয়া শিলালিপির ওপর তৈরী করে নেওয়া সালতামামি চাপানো। ব্যবস্থাটা ভালোই করা হয়েছিল। কেউ বোঝেননি এইটাই বিস্ময়ের।

সহজ সরল ব্রাহ্মী লিপির সারল্য

ব্রাহ্মীলিপির গঠন সম্পর্কে 'গবেষণা' করে পণ্ডিতেরা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন ঐ লিপির অক্ষরগুলো নাকি সহজ এবং সরল। জটিলতার লেশমাত্র নেই। অপূর্ব সারল্যমণ্ডিত লিপিটা যে প্রশংসার দাবী রাখে এটা সবাই স্বীকার করে নিয়েছেন। পণ্ডিতেরা অত্যন্ত সরল বলেই কিনা জানিনা লিপির সারল্যটুকুই দেখেছেন তাঁরা। জালিয়াতিটা ধরতে পারেননি। আসলে সহজ সরল চিহ্ন দিয়ে লিপি 'উদ্ভাবনে'র ব্যবস্থা করতে গিয়ে ঐ লিপির আধুনিক কারিগরেরা একটি মারাত্মক ভুল করে বসেছেন। একটু জটিল টাইপের অক্ষর বানিয়ে নিলে তাঁরা ধরা পড়তেন না। সহজ সরল চিহ্ন দিয়ে লিপি বানানোর ইচ্ছাটাই বিপদ ডেকে এনেছে। ঐ ধরণের চিহ্নের সংখ্যা সীমিত। এবং সীমিত সংখ্যার ঐসব চিহ্ন দিয়ে লিপি বানিয়ে নেওয়ার কাজটা রোমীয় এবং গ্রীক লিপিকারেরা আগেই সেরে রেখেছিলেন। বিপত্তি ঘটেছে ঐ জন্যই।

ব্রাহ্মী নামক জাল লিপির আধুনিক কারিগরেরা সহজ সরল লিপি বানাতে গিয়ে বারো আনি অংশ ঐ রোমক আর গ্রীক লিপি থেকে চুরি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ-ছাড়া উপায় ছিলনা। সহজ সরল চিহ্ন ত' আর আকাশ থেকে পড়েনা। গ্রীস বা রোমের চৌকস লিপিকারদের মাথা থেকেই ঐসব চিহ্নের ধারণার জন্ম হয়েছিল। আর 'ঐসব ধারণার জন্ম একবারই হয়। তুবার হয়না। এক জায়গাতেই হয়। অনেক জায়গায় হয়না।

ব্রাহ্মীলিপির কারিগরদের দ্বৈতচরিত্রে অভিনয় করতে হয়েছিল। একই সঙ্গে সহজ সরল লিপি বানানো এবং ভারতীয় লিপিমালার জনক সাজানোর ব্যবস্থা করতে গিয়েই তাঁরা মুশ্‌কিলে পড়েছিলেন। রোমক লিপি সহজ সরল—আর ভারতীয় লিপির অধিকাংশই জটিল। এই তুই-য়ের সমন্বয় সহজ ব্যাপার ছিলনা। তাঁরা সামলাতে পারেননি। ব্রাহ্মী লিপিতে সরল এবং জটিল লিপির সহাবস্থান হয়েছিল একসঙ্গে তুটো ভূমিকা পালন করার জন্যই।

স্বরচিহ্ন প্রকাশ করতে গিয়ে আর এক বিভ্রাট বাঁধালেন ঐ কারিগরেরা। এত সহজ সরল 'বিজ্ঞানসম্মত' স্বরচিহ্ন ওঁরা বানিয়ে বসলেন যার সঙ্গে না ছিল রোমক লিপির কোনও মিল—না ছিল ভারতীয় কোনও লিপির। অশোকব্রাহ্মীর স্বরচিহ্নগুলো সত্যিই অপূর্ব এবং সুন্দর। এত সুন্দর ব্যবস্থা যে প্রাচীনকালে আমাদের পূর্বপুরুষেরা করে গিয়েছিলেন—এটা ভেবে সত্যিই আনন্দ হয়। তবে সেটা স্থায়ী হয় না। খট্‌কা লাগে। স্বরচিহ্ন সৃষ্টির দিক দিয়ে যাঁরা এত মৌলিকত্ব দেখালেন তাঁরা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ 'সৃষ্টি' করতে গিয়ে সুদূর ইউরোপের শরণাপন্ন হলেন কেন? গ্রীকো-রোমকলিপি চুরির উদ্যোগ নিতে গেলেন কেন? আর চুরিই যখন করলেন বেসামাল চুরি করতে গেলেন কেন? (একমাত্র উ-কার চিহ্নটাই তামিল ও অশোকব্রাহ্মীতে একই রকম—এ-তথ্যটা দিয়ে রাখা ভালো)

ব্রাহ্মী সংযুক্ত বর্ণ 'সৃষ্টি' করতে গিয়ে আর এক গোলমাল করে·

বসলেন 'লিপির' কারিগরেরা। ভারতীয় লিপিগুলোতে সংযুক্তবর্ণ লেখা হয় ব্যঞ্জনবর্ণগুলোর পূর্ণ বা আংশিক রূপ পাশাপাশি বা ওপরে নীচে প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে। ব্রাহ্মী সংযুক্তবর্ণ য-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ প্রকাশ করতে গিয়ে নাগরী য-ফলা চুরি করে বসলেন ওঁরা। আর ঐ য-ফলার সঙ্গে ব্রাহ্মী 'য'-এর কোনও দূরাগত সাদৃশ্যও থাকলনা।

ব্রাহ্মী স্বরচিহ্নের রূপপরিবর্তন

ব্রাহ্মী লিপির ক্রমপরিবর্তনের নানান ধাপে স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণের যে রূপপরিবর্তন ঘটল তা নামমাত্র অথচ ঐ লিপির স্বরচিহ্নগুলোর যে পরিবর্তন ঘটল তাকে বৈপ্লবিকই বলতে হয়। তথাকথিত অশোক ব্রাহ্মীলিপির স্বরচিহ্নের সঙ্গে 'অশোক'-উত্তর ব্রাহ্মী-লিপির স্বরচিহ্নের কোনও দূরাগত সম্পর্কই নেই। আমূল পরিবর্তন স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণে হল না— হল শুধু স্বরচিহ্নে। এর কোনও ব্যাখ্যা পণ্ডিতেরা দেওয়ার চেষ্টা করেন নি। ব্যাখ্যা নেই বলেই। আসলে লিপির ক্রমপরিবর্তনের বা 'বিবর্তনে'র ব্যবস্থা করতে গিয়ে মিথ্যার কারবারীরা সব দিক সামলাতে পারেন নি। তাই গোলমাল করে বসেছেন। স্বরচিহ্নগুলোর নানান রূপ 'উদ্ভাবন' করতে গিয়ে তাঁরা পারম্পর্য রক্ষা করতে পারেননি। স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণের নানান রূপভেদে পারম্পর্য রক্ষার যেটুকু ব্যবস্থা তাঁরা নিয়েছিলেন স্বরচিহ্নগুলোর ক্ষেত্রে সেটুকু ব্যবস্থাও তাঁরা নেননি। এবং নেননি বলেই তাঁরা ধরা পড়ে গিয়েছেন। মিথ্যা বেশী দিন চাপা থাকে না।

চীনা ভাবলিপির সঙ্গে ব্রাহ্মী লিপির মিল থাকার গল্প

ব্রাহ্মী লিপির সঙ্গে চীনা ভাবলিপির মিল সম্পর্কেও অনেক তথ্য পণ্ডিতেরা সরবরাহ করেছেন। করেছেন বিভ্রান্তিটা বাড়াতে। চীনা সুব্ (= দশ) শব্দের ভাবলিপির সঙ্গে ব্রাহ্মী ক-এর মিলের কথা তাঁরা বলেছেন। বলেছেন চীনা ছু (= হাত) এর সঙ্গে ব্রাহ্মীর 'ছ'

এর মিলের কথা। চীনা তিয়েন্ (=স্বর্গ) এবং থিয়াং (=ভূমি) এই দুই ভাবলিপির সঙ্গে ব্রাহ্মী ত এবং থ-এর নাকি প্রচণ্ড মিল। ব্রাহ্মী ক, ছ, ত, এবং থ-এর রূপকল্পনার উৎস নাকি চীনা লিপির মধ্যেই খুঁজে নিতে হয়। 'সুব্'-ভাবলিপি থেকে আসার সুবাদে ব্রাহ্মীলিপির 'ক' অক্ষরটাকে ঐ লিপির একটি রূপভেদে 'স'-এর চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। করা হয়েছিল চীনা লিপির প্রভাবের তথ্যটাকে প্রমাণসিদ্ধ বানাবার তাগিদে। 'তিয়েন' থেকে 'ত' এলে কিংবা 'থিয়াং' থেকে 'থ' এলে 'সুব' থেকে 'ক' আসার কথা নয়। আসার কথা 'স'-এর। তাই ঐ ব্যবস্থা। চীন এবং ভারতের মধ্যে সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক সম্পর্ক যে ছিল তার 'প্রমাণে'র ব্যবস্থা হল। মিথ্যাটাও বেঁচে থাকল। ব্যবস্থাটা ভালোই করা হয়েছিল।

তবে ইণ্টেলেক্চুয়াল জিম্ন্যাস্টিক্স দেখানো হল ব্রাহ্মী ঘ-এর জন্মবৃত্তান্ত শোনাতে গিয়ে। মুণ্ডা ভাষায় ঘাট-এর অর্থ পর্বত। ঐ ঘাট-এর ঘ-উচ্চারণটা নেওয়া হল। আর 'পর্বত'-এর চীনা প্রতিশব্দ 'সান'-এর ভাবলিপিটা চীন থেকে আমদানী করা হল। করা হল ব্রাহ্মী ঘ-এর চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করার জন্য। ফলে চীনা 'সান' ভাবলিপি ব্রাহ্মীর 'ঘ' হয়ে দাঁড়াল। পাণ্ডিত্যের বহর একেই বলে!

পাণ্ডিত্যের বহর আর একটি অক্ষর সম্পর্কেও দেখানো হল। বলা হল ঝাণ্ডা শব্দ থেকে ঝ উচ্চারণটা নিয়ে ঝাণ্ডার চিত্রকল্প থেকে নাকি ব্রাহ্মী ঝ এর চিহ্নটা বানানো হয়েছিল। আসলে গ্রীক মিউ μ অক্ষর চুরি করেই ঐ ঝ-এর ব্যবস্থা হয়েছিল আর সে ব্যবস্থাটা যাতে কেউ না ধরে ফেলেন তার জন্যই ঐ বিভ্রান্তি সৃষ্টির দরকার পড়েছিল।

ব্রাহ্মী লিপির প্রামাণ্যতা প্রতিষ্ঠার কাজে পাণিনীর ভূমিকা

ম্যাকডোনেল সাহেব ব্রাহ্মীলিপির প্রামাণ্যতা সম্পর্কে একটি তথ্য সরবরাহ করেছেন। তিনি লিখেছেন :

"This (Brahmi) is the alphabet which is recog-

nised in Panini's great Sanskrit grammar of about the 4th century B. C. and has remained unmodified ever since."

কয়েকটি প্রশ্ন আসছেই। পাণিনী তাঁর 'ব্যাকরণ'টা কোন লিপিতে লিখেছিলেন ? ওটা কি খরোষ্ঠী লিপিতে লেখা হয়েছিল ? ইতিহাসে সেরকম কোনও তথ্য পাচ্ছি না। ব্রাহ্মী লিপিতে যে ঐ বই লেখা হয়নি তার প্রমাণ ত' ঐ বক্তব্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। তা হয়ে থাকলে ঐ লিপিকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্নই যে উঠত না। ঐ সময়ে প্রচলিত বলে প্রচারিত কোনও লিপিতেই ঐ 'ব্যাকরণ' লেখা হয়নি। তবে কি লিপিনিরপেক্ষ 'রচনা' ঐ ব্যাকরণটা ? তাইবা কি করে হয় ? লিপি প্রবর্তনের আগে কি লিপিহীন ভাষায় ব্যাকরণ 'লেখা' সম্ভব ? এই আজগুবি ব্যাপারটা পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করলেন কি করে ?

উল্টোদিক দিয়ে এগুনো যাক। পাণিনী তাঁর 'অষ্টাধ্যায়ী'তে ব্রাহ্মীলিপিকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তিনি নাকি প্রাচীন কালের 'বৈয়াকরণ'। ইতিহাস বলছে তিনি নাকি খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের। আঠারো শতকে তৈরী করে নেওয়া তথাকথিত ব্রাহ্মীলিপির সন্ধান খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের ঐ পাণিনী মহাশয় পেলেন কি করে ? তবে কি ব্রাহ্মীলিপি 'উদ্ভাবিত' হওয়ার পরে ঐ 'বৈয়াকরণ'চূড়ামণির জন্ম ? তাইত আসছে। প্রাচীন বলে সাজালেই কেউ প্রাচীন হয়ে যান না। বেসামাল তথ্য দিতে গেলে গোলমাল ত বাধবেই। বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। জাল ব্রাহ্মীলিপিকে প্রামাণ্য বানাবার বাড়তি উপকরণ সরবরাহ করার দায়িত্ব নিতে গিয়ে ঐ পাণিনী তাঁর নিজের ঐতিহ্যের মিথটাকেই প্রকাশ করে ফেলেছেন। আসলে সর্বশাস্ত্রপারঙ্গম মহান আর্যসন্তানেরা যে 'ব্যাকরণে'ও প্রচণ্ড পণ্ডিত ছিলেন—এই প্রচণ্ড মিথ্যার নজীর রাখার জন্যই ঐ 'ব্যাকরণ' লেখানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। ব্যবস্থা হয়েছিল আধুনিক কালেই। প্রাচীন কালে নয়। 'ব্যাকরণে'র অর্থটা তখন কি ছিল ? না, ঠিক আজকের অর্থে নয়। সত্যিই ত'

তেইশ শ' বছর আগেও শব্দটির একই অর্থ থাকবে তাইবা কি করে হয়! মিথ্যার কারবারীরা কায়দাটা ভালোই নিয়েছিলেন।

সিদ্ধান্ত নিতেই হয় পাণিনীর প্রাচীনকালে অবস্থানের গল্পটাই আজগুবি।

ব্রাহ্মীলিপির নানান রূপভেদ

ব্রাহ্মীলিপির মোটামুটি আট রকম রূপ ছিল। স্থানকালভেদে সে লিপির রূপভেদ হয়েছিল। হয়েছিল বলে প্রচার করা হয়েছে। হয়েছিল 'প্রমাণ' রাখার ব্যবস্থাও। অষ্টরম্ভার অষ্টারম্ভ একেই বলে! আসলে লিপির রূপভেদের ব্যবস্থাটা রাখা হয়েছিল পরিকল্পিত ভাবেই। রাখা হয়েছিল বিভ্রান্তিটা বাড়ানোর জন্যই। লিপির শতাব্দী-ওয়ারী রূপভেদের ব্যবস্থা মিথ্যার কারবারীদের তৈরী করে নেওয়া সব লিপিতেই করা হয়েছে। করা হয়েছে ঐ ফিনিশীয় লিপিতে। করা হয়েছে ব্রাহ্মী লিপিতেও। আর ঐসব লিপির চরিত্র বদলানো অক্ষর গুলোর কোনওটাকে পণ্ডিতেরা খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের—কোনওটাকে খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকের বলে চালিয়ে দিয়েছেন। বিশেষ ধরণের লিপিতে লেখা কিছু প্রত্নলেখের সন্ধান পাওয়া গেল বলে প্রচার করা হল। সালতারিখ জানার উপায় নেই। পণ্ডিতেরা অক্ষরের 'চরিত্র' দেখে সালতামামি আরোপ করে নিলেন। ব্যাপারটা এইরকমই ঘটত এবং সে রকম ঘটবে জেনেই আট কিসিমের লিপি বানানোর উদ্যোগ যে নেওয়া হয়েছিল এটা বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। রমেশ চন্দ্র মজুমদার এক জায়গায় লিখলেন :

"Although not always dated, the character of the script enables us to determine their approximate age." অক্ষরের 'চরিত্র' দেখে প্রত্নলেখের ওপর প্রাচীনত্ব আরোপ করার খেলাটা শুধু ভারতেই হয়নি। হয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যেও। হয়েছিল অন্যত্রও।

খেলাটার আর একটু নমুনা দেওয়া যাক। অক্ষরের 'চরিত্র' দেখে সালতামামি আরোপ করার খেলাটা বেশ মজার। হাতীগুম্ফা শিলালিপির অক্ষরের রূপবৈচিত্র্য 'বিশ্লেষণ' করে ডাঃ ডি. সি. সরকার লিখলেন ঃ

"The angular form and straight bases of letters like b, m, p, h and y, which are usually found in the Hatigumpha record suggest a date not much earlier than the beginning of the first century A. D." খেলাটা কেউ বোঝেননি এইটাই আশ্চর্যের।

ব্রাহ্মীলিপি লেখার গতিক্রম

ব্রাহ্মী লিপির যেসব নমুনা পাওয়া গেছে তার বেশীর ভাগই বাঁ দিক থেকে ডান দিকে লেখা। বেশীর ভাগ শিলালিপি বা তাম্রশাসনে ঐ কায়দাতেই লিপিটা ব্যবহার করা হয়েছে। ডান দিক থেকে বাঁ দিকে লেখার ব্যবস্থাও যে ঐ লিপিতে হয়নি তা নয়। ইয়েরাগুডি শিলালিপিতে সে ব্যবস্থার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। বুঝতে কষ্ট হয়না ব্যবস্থাটা নেওয়া হয়েছিল বিভ্রান্তি সৃষ্টির আয়োজন হিসাবেই। একই লিপি কখনো বাঁ দিক থেকে ডান দিকে—কখনো-বা ডান দিক থেকে বাঁ দিকে লেখা যায়—এ তথ্যটাই আজগুবি। কারণ তা হয়না। লিপির গঠনবিন্যাস দেখে বুঝে নিতে কষ্ট হয়না কোন লিপি বাঁ দিক থেকে ডান দিকে আর কোনটা উল্টো কায়দায় লেখা হয়। মজার কথা এই যে পণ্ডিতেরা ঐ আজগুবি তথ্য নিয়ে অনেক জল ঘোলা করেছেন। করেছেন উদ্দেশ্যমূলকভাবেই। মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করতে নানান বিভ্রান্তি সৃষ্টির আয়োজন করতেই হয়। না হলে মিথ্যাটা পোক্ত সত্য হয়ে ওঠেনা। শিলালিপি-তাম্রশাসন বানানোর নেপথ্যশিল্পীরা পরিকল্পিতভাবেই সোজা এবং উল্টো কায়দার লিখনভঙ্গীর নিদর্শন সবই বানিয়ে রেখেছিলেন যাতে ভাড়াটে পণ্ডিতেরা ঐ আজগুবি তথ্যকে

ভিত্তি করে পাণ্ডিত্যের ফুলঝুরি দেখাতে পারেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য আধুনিকতর 'উদ্ভাবন' ঐ মোহেন্-জো-দড়োর তথাকথিত লিপিমালায় বিভ্রান্তি সৃষ্টির খেলাটা কিছুটা বেশী মাত্রায় খেলেছিলেন ঐ মিথ্যার কারবারীরা। পরের অধ্যায়ে সে-সম্পর্কে আলোচনা রাখব।

ব্রাহ্মী এবং প্রাচীন ফিনিশীয় লিপির সাদৃশ্য

ব্রাহ্মী লিপির সঙ্গে প্রাচীনতম ফিনিশীয় লিপির যে বেশ কিছু মিল ছিল এই তথ্যটি সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন :

"A certain similarity between the shape of the Brahmi letters and those of the oldest Phoenician alphabet, both standing for the same or similar sounds gave considerable support to this theory."

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তথ্যটির সত্যতা যাচাই করে নেননি। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সুসংগঠিত অপপ্রচারে তিনি বিভ্রান্ত হয়েছিলেন এইটাই মনে করে নিতে হয়। ব্রাহ্মী লিপির সঙ্গে একাধারে রূপগত এবং ধ্বনিগত মিলযুক্ত অক্ষর তথাকথিত প্রাচীন ফিনিশীয় লিপিতে আছে মাত্র একটি (একাধিক নয়)। অক্ষরটা গ-উচ্চারণজ্ঞাপক। আর ধ্বনিগত মিল নেই—শুধু রূপগত সাদৃশ্য কিছুটা আছে এমন অক্ষর ঐ ফিনিশীয় লিপিতে আছে মাত্র দুটো। ঐ লিপির 'ল' = ব্রাহ্মীর 'প' এবং ঐ লিপির 'ত' = ব্রাহ্মীর 'ক'। আর একটা কথা। রোমক লিপির একুশটা অক্ষরের সঙ্গে ব্রাহ্মী অক্ষরের মিল থাকার তথ্যটিকে এড়িয়ে গিয়ে মাত্র তিনটি ব্রাহ্মী অক্ষরের মিল থাকার সুবাদে ফিনিশীয় উৎসের গল্পটাকে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এতটা গুরুত্ব দিয়ে বসলেন কেন ?

ব্রাহ্মী নামক জাল লিপিতে যে পরিমাণে জাল লেখ খোদাই করার আয়োজন হয়েছিল তা থেকে অনুমান করে নিতে কষ্ট হয়না কি বিরাট সুসংগঠিত চক্রান্ত ঐ কর্মকাণ্ডের পেছনে ছিল। জাল লেখগুলো

যেসব পাথরে খোদাই করা হত তা খুবই মজবুত। প্রাচীন যুগের কথা বাদ দিলাম মধ্যযুগের স্থাপত্যনিদর্শনের মধ্যেও ঐ ধরণের মজবুত পাথরের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না কেন ?

খরোষ্ঠী লিপির জন্মবৃত্তান্ত

তথাকথিত খরোষ্ঠী লিপি মিথ্যার কারবারীদের আর একটি অপূর্ব 'সৃষ্টি'। এ-লিপির 'সৃষ্টি'র কায়দা একটু আলাদা ধরণের। ব্রাহ্মী লিপির উৎস সন্ধান করতে গিয়ে যেমন রোমক লিপির বড় এবং ছোট হাতের ছাপা অক্ষরগুলোর সন্ধান পাওয়া যায় তেমনি ঐ খরোষ্ঠীতে পাওয়া যায় রোমক লিপির বড় এবং ছোট হাতের টানা লেখার অক্ষর গুলোকে। ব্রাহ্মী লিপির মধ্যে সরল রেখার প্রাচুর্য—খরোষ্ঠীতে বক্ররেখার। লীলায়িত ভঙ্গীর খরোষ্ঠীতে ছাপা অক্ষর বেমানান তাই রোমক লিপির টানা লেখার অক্ষর চুরির ঢালাও ব্যবস্থা। চুরির কিছু নমুনা দেওয়া যাক :

বড় হাতের টানা F=ও ; P=স
G=খ ; J=চ
Y=জ ; S=ণ
T=অন্তঃস্থ ব ; Z=র

রোমক লিপি উল্টে নিয়েও কয়েকটা খরোষ্ঠী অক্ষর বানানো হয়েছিল। 'V' উল্টে 'য়' ; 'J' উল্টে 'ন' ; 'U' উল্টে 'ষ' এবং ছোট হাতের 'h' উল্টে 'ড' ; ছোট হাতের 't' উল্টে 'ও'।

রোমক লিপির দক্ষিণমুখী অক্ষরকে বামমুখী করে নিয়েও কয়েকটা অক্ষর বানানো হয়েছিল। দক্ষিণমুখী 'K' বামমুখী হয়ে হল 'ঝ' ; দক্ষিণ মুখী 'S' বামমুখী হয়ে হল 'হ' এবং 'উ'। E বামমুখী হয়ে হল 'ও'। রোমক লিপির দাঁড়ানো অক্ষরকে শয়ান বানিয়েও খরোষ্ঠী অক্ষর বানানো হয়েছিল। s শয়ান হয়ে হল খরোষ্ঠীর 'ত' ; c শয়ান

হয়ে খরোষ্ঠীর 'ম'। রোমক লিপির ছোট হাতের টানা অক্ষর থেকেও কিছু অক্ষর তৈরী করে নেওয়া হল :

f = ই ; *h* = গ ; p = প r = প (রোমক লিপির R-এর ছোট হাতের টানা দুরকম অক্ষর আছে। খরোষ্ঠীতে p-এর দুরকম রূপ ত' থাকতেই পারে।) ছোট হাতের টানা *l* (এল্) উল্টে দুটো অক্ষর বানিয়ে নেওয়া হল : *l* উল্টে 'অ' এবং প্রারম্ভিক টান সহ *l* উল্টে 'এ'। প্রারম্ভিক টান সহ p = ফ।

একটু কায়দা করা বড় হাতের টানা রোমক অক্ষর থেকে আরও কিছু অক্ষর বানিয়ে নেওয়া হয়েছিল :

টানা *B* = ধ ;

টানা *Y* = ব ; আর এক কায়দায় *Y* = র ;

রোমক লিপির অঙ্কগুলোকেও কাজে লাগানো হয়েছে 3 = ২ ; কায়দাকরা 2 = এ ; 3 = ২০ (কুড়ি) ; 3 = ধ ; কায়দাকরা 3 = চ।

আরও আছে। বড় হাতের ছাপা Y = জ ; U = ম ; T = ঢ ; I = ১ ; X = ৪ (চার) ; প্রারম্ভিক টান সহ Y = ল ; ক্রসচিহ্ন বা 'যুক্ত' চিহ্ন + = থ ; কায়দাকরা S = দ ; কায়দাকরা মাত্রাযুক্ত Y = ন ; কায়দাকরা T = ভ ; আর এক কায়দার T = ষ ; কায়দাকরা X = ঝ ; কায়দাকরা Y = ট ; আর এক কায়দার Y = চ।

গ্রীক অক্ষরও চুরি করা হয়েছে ঐ খরোষ্ঠী লিপিতে। গ্রীক 'মিউ' μ থেকে বানানো হয়েছে 'ঞ' আর 'শাই' ψ থেকে বানানো হয়েছে 'গ'।

মোটকথা ঐ খরোষ্ঠী লিপিতে রোমক লিপির নানান কায়দার কুড়িটা অক্ষরের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। আদি-রোমক লিপিতে কোন্ অক্ষর ছিল বা কোন্ অক্ষর ছিল না সে প্রশ্ন মুলতুবী রেখে বলা যায় আজকের প্রচলিত ছাব্বিশটা অক্ষরের মধ্যে A D M O Q W এই ছটা অক্ষরই শুধু ঐ খরোষ্ঠী লিপিতে ছিল না। চুরির বাহাদুরী এই লিপিতেও কিছু কম করা হয়নি। বলে রাখা ভালো ব্রাহ্মীলিপিতে

যেমন নানান বিচিত্র কায়দায় রোমক লিপি চুরির আয়োজন হয়েছিল—খরোষ্ঠী লিপিতেও ঠিক সেই সেই কায়দা খাটানো হয়েছিল। একই খেলা—একই খেলোয়াড়। দু-রকম কায়দা হবেই বা কেন? মিথ্যার কারবারীরা যে পাকা খেলোয়াড় ছিলেন—এটা মেনে নিতেই হয়।

অ্যারেমেইক লিপি কি সত্যিই খরোষ্ঠী লিপির উৎস?

অ্যারেমেইক লিপির সঙ্গে খরোষ্ঠী লিপির প্রচণ্ড মিল থাকার কথা পণ্ডিতেরা একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। পণ্ডিতেরা স্বীকার করে নিলেও আমি তা মানতে পারছি না। কারণ মিল বলতে অ্যারেমেইক লিপির দু'টো অক্ষরের সঙ্গে খরোষ্ঠী লিপির দুটো অক্ষরের কিছু মিল দেখা যাচ্ছে।

অ্যারেমেইক 'গ'=খরোষ্ঠীর 'য়' এবং ঐ লিপির 'ক'=খরোষ্ঠীর 'ল'। মাত্র দুটো অক্ষরের মিলটাকে একটু বেশী গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছেন পণ্ডিতেরা। অক্ষর দুটির উচ্চারণেরও সমতা যে ভাষা দুটোয় নেই সেটাও লক্ষণীয়।

অ্যারেমেইক লিপি থেকে খরোষ্ঠী লিপির 'বিবর্তন' সম্পর্কে পণ্ডিতেরা কত গল্পই না বানিয়েছেন। সে-সবই নেহাৎ পণ্ডশ্রম। কারণ ঐ অ্যারেমেইক লিপির প্রচলন ছিলই না। গ্রীক লিপির পরিকল্পিত বিকৃতির মধ্য দিয়ে ঐ লিপির 'উদ্ভাবন' হয়েছিল আধুনিক কালেই। 'উদ্ভাবন' করেছিলেন মিথ্যার কারবারীরা। করেছিলেন বিভ্রান্তিসৃষ্টির তাগিদেই।

সেমিটিক লিপি বলে প্রচারিত তথাকথিত ফিনিশীয় বা অ্যারেমেইক লিপি থেকে ব্রাহ্মী বা খরোষ্ঠী কোনও লিপিই উদ্ভূত হয়নি। উদ্ভূত হওয়ার প্রশ্নটাই ছিল অবান্তর। অ্যারেমেইক লিপির অক্ষর সংখ্যা মাত্র বাইশ। ধ্বনিএককের সংখ্যা আরও কম। মাত্র আঠারোটা। আঠারোটা ধ্বনি-একক-সমৃদ্ধ সেমিটিক লিপি থেকে ছেচল্লিশটা ধ্বনি-একক-সমৃদ্ধ ব্রাহ্মী বা খরোষ্ঠী লিপির 'জন্ম' হল কি

করে? দুটো বা তিনটে অক্ষর পাশাপাশি জুড়ে দিয়ে যে নতুন নতুন ধ্বনিএকক তৈরী করে নেওয়া হয়েছে এমন তথ্যও ত' পাচ্ছি না। তাই সিদ্ধান্ত নিতেই হয় সেমিটিক উৎস থেকে ভারতীয় লিপি দুটোর জন্মের তথ্যটাই আজগুবি। লিপির উৎস, সৃষ্টি, ক্রমপরিবর্তন, প্রচলন এবং অবলুপ্তির পুরো গল্পটাই বানানো। বানানো হয়েছিল বানানো প্রাচীন ইতিহাসের কাঁচামালের বাহন সাজানোর জন্যই।

অ্যারেমেইক লিপি মায়া, না মতিভ্রম?

অ্যারেমেইক লিপি নাকি উত্তরে তুরস্ক থেকে দক্ষিণে ইজিপ্ট আর পূর্বে পারস্য থেকে পশ্চিমে প্যালেস্টাইন পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে এককালে চালু ছিল। চালু ছিল ঐ অঞ্চলের lingua franca হিসাবেই। এমনকি উত্তর-পশ্চিম ভারতেও নাকি লিপিটা অল্পবিস্তর চলত। ইতিহাসে এই রকম তথ্যই পাচ্ছি। লিপিটা তথাকথিত আর্যগোষ্ঠীর ভাষা আখিমেনীয় কালপর্বের প্রাচীন পারসিক-এর বাহক হিসাবে চালু ছিল। চালু ছিল সেমিটিক আরবী এবং 'অ্যারেমেইক' নামক ভাষার বাহক হিসাবেও। প্রশ্ন আসছেই। এক, ঐ দু-ধরণের ভাষা প্রকাশ করার উপযোগী অক্ষরে কি লিপিটা সমৃদ্ধ ছিল? সম্ভবতঃ নয়। কারণ লিপিটাতে মাত্র আঠারো রকম ধ্বনিএকক (phoneme) প্রকাশ করার সুযোগ ছিল। ঐ অঞ্চলের কিছু ভাষাতে ঠিকমত উচ্চারণ প্রকাশ করার কাজে আরও কিছু বেশী ধ্বনিএককের দরকার পড়ার কথা। দুই, বিস্তৃত অঞ্চলে প্রচলিত বলে প্রচারিত এমন একটা বনেদী লিপির দু-একটা অক্ষরের প্রভাব ঐ অঞ্চলের আরবী লিপিমালার ওপর পড়েনি কেন? তিন, ঐ লিপি যদি সত্য সত্যই চালু থাকত তাহলে ঐ লিপি বাতিল করার দরকারটা পড়ল কেন? সহজ সরল অক্ষরযুক্ত ঐ লিপিটা যে আরবী বা হিব্রু লিপির চেয়ে গুণগতমানে হেয় ছিল এটা মনে করার ত' কোনও কারণই দেখছি না। চার, সাহেবদের ইতিহাস অন্বেষণের কর্মকাণ্ডের আগে ঐ লিপির

কথা ওখানকার মানুষ বেমালুম ভুলে গেলেনই বা কেন? আর একটা কথা। লিপির বিশ্বজনীন ক্রমিক রূপপরিবর্তনের খেলার তত্ত্ব দিয়ে যাঁরা পণ্ডিত হয়েছেন তাঁরা ঐ অ্যারেমেইক লিপির ক্রমপরিবর্তনের গল্পটা না বানিয়ে লিপির 'মৃত্যু'র ব্যবস্থাই-বা করতে গেলেন কেন? প্রশ্ন আরও আসছে। উত্তরকালে প্রচলিত আরবী লিপির ওপর ঐ অ্যারেমেইক লিপির প্রভাব না পড়লেও গ্রীক লিপির বেশ কিছু অক্ষরের সঙ্গে ঐ লিপির সমসংখ্যক অক্ষরের লক্ষণীয় মিল খুঁজে পাচ্ছি কেন? প্রাচীনতর বলে প্রচারিত হিব্রু লিপির কোনও প্রভাবইবা ঐ অ্যারেমেইক লিপিতে পড়েনি কেন? ভাষার দিক দিয়ে হিব্রু ভাষার কাছাকাছি আবার লিপির দিক দিয়ে গ্রীক লিপির কাছাকাছি থাকার এই বিচিত্র ব্যবস্থাটা ঐ অ্যারেমেইক ভাষায় চালু হল কেন? এ-সব প্রশ্নের উত্তর পণ্ডিতেরা দেননি। দেননি কারণ মহান যীশুর মাতৃভাষা ঐ অ্যারেমেইক-এর অস্তিত্বহীনতার গল্পটা যে তাহলে ধরা পড়ে যেত। অ্যারেমেইক নামের কোনও ভাষা কস্মিনকালেও ছিল না। ছিলনা ঐ নামের লিপিরও অস্তিত্ব। গল্পে বলা হয়েছে যীশু খ্রীস্ট নাকি ঐ ভাষাতেই কথাবার্তা বলতেন—ঐ ভাষাতেই উপদেশ দিতেন। হিব্রু ভাষাটা যে তাঁর জন্মের অনেক আগেই পৃথিবী থেকে 'বিদায়' নিয়েছিল। তাই ঐ অ্যারেমেইক ভাষার গল্প বানানোর ব্যবস্থা। কয়েকটি তৈরী করে নেওয়া পুঁথি আর কিছু শিলালিপির নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নিয়েছিল ঐ হিব্রু ভাষাটা। সম্ভবত 'মৃত' ভাষার তালিকা স্ফীত করার উদ্দেশ্যেই। বলা বাহুল্য ঐ অ্যারেমেইক ভাষাটাও আধুনিককালে বানিয়ে নেওয়া পুঁথির মধ্যেই আশ্রিত হয়ে আছে। আশ্রিত হয়ে আছে আধুনিককালে বানিয়ে নেওয়া কিছু শিলালিপির মধ্যে। অ্যারেমেইক ভাষার প্রাচীন প্রচলনের গল্প বাইবেলেও আছে। বাইবেলে কিছু থাকলেই তা প্রামাণ্য হয়ে ওঠে না। কারণ ঐ পবিত্র গ্রন্থটিকে প্রামাণ্য ইতিহাস মনে করার কোন কারণই নেই। বস্তুত মিথ্যার কারবারীদের তৈরী করে নেওয়া প্রাচীনত্বের ছদ্মবেশ-চাপানো একটি

উঁচু দরের প্রতারণার নামই ঐ বাইবেল। কিঞ্চিৎ 'ইতিহাস'-মিশ্রিত ঐ বাইবেল দুনিয়ার প্রাচীনতম পুরাণ—প্রাচীনতম ইতিহাস—প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ। ঐ পবিত্র গ্রন্থ দিয়েই মিথ্যার কারবারীদের হাতেখড়ি হয়েছিল। বিস্তৃততর তথ্য পরের একটি অধ্যায়ে রেখেছি।

খরোষ্ঠী লিপির নামের বাহার

জালিয়াতি হলে কি হবে খরোষ্ঠী লিপির নামের বাহার আছে। সংস্কৃতগন্ধী ঐ নামের বানান দু-রকম : খরোষ্ঠী এবং খরোষ্ট্রী। মিথ্যার কারবারীরা অনেক শব্দেরই নানান বানান বানানোর খেলা খেলেছিলেন। খেলেছিলেন পণ্ডিতদের দৃষ্টিটাকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যই। জালিয়াতিটা যাতে কেউ না ধরে ফেলেন তাই এক দল পণ্ডিত বললেন, খর শব্দের অর্থ গাধা আর গাধার ঠোঁটের সঙ্গে অক্ষরগুলোর কল্পিত মিলের দরুণই নাকি ঐ প্রথম নামটা ঐ লিপির ওপর আরোপ করা হয়েছিল। আরেক দল পণ্ডিত বললেন, না, তা নয়। গাধা আর উটের দেশ পাঞ্জাব মুলুকে চালু ছিল বলেই নাকি ঐ লিপির নাম খরোষ্ট্রী রাখা হয়েছিল। খর অর্থে গাধা আর উষ্ট্র—সে ত' সবাই জানে—উট। সত্যিই ত' স্থানীয় জন্তুজানোয়ারের নাম থেকেই যে লিপির নামকরণ হয়! বিজ্ঞতর পণ্ডিতেরা বললেন, না ওসব কোনও কারণই নয়। সেমিটিক ভাষার খরোসেথ (= লিপি) শব্দের সংস্কৃতায়িত ছদ্মবেশের নামই নাকি ঐ খরোষ্ঠী। কে যে বিজ্ঞ আর কে যে বিজ্ঞতর বোঝা মুশ্‌কিল। আসলে ষোল আনা জালিয়াতিটা যাতে কেউ না ধরে ফেলেন সেইজন্যই ঐ নামব্রহ্মের খেলাটা খেলা হয়েছিল। আর সেটা বুঝে নিতেও কষ্ট হয়না। ভাড়াটে পণ্ডিতেরা তর্কযুদ্ধের অভিনয় করেছিলেন। বলা বাহুল্য, ওঁরা সকলেই ছিলেন সাহেবপণ্ডিত কিংবা তাঁদের ভারতীয় সাকরেদ। বলে রাখা ভালো প্রথম দু-দল পণ্ডিতের লক্ষ্য ছিল বিভ্রান্তি সৃষ্টি—বিজ্ঞতর সেজে বসে থাকা তৃতীয় দলের পণ্ডিতদের উদ্দেশ্য ছিল ঐ লিপির সেমিটিক উৎস সম্পর্কে স্থিরপ্রত্যয় হয়ে বক্তব্য পেশ করা।

বিদ্বজ্জনমণ্ডলী ঐ তৃতীয় দলের মতটাকেই শিরোধার্য করে নিয়েছেন। নামকরণের আসল কারণটা নাকি ওঁরাই ঠিক জানিয়েছেন। ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে। শেষ সিদ্ধান্তটাই নাকি পাকা। আসলে কি তাই ?

প্রাচীন লিপি সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি—ভাড়াটে পণ্ডিতদের ভূমিকা

মিথ্যার কারবারীরা পাথুরে লিপি দুটো বানিয়ে নিয়েই ক্ষান্ত হননি। ঐ দুটো লিপি সম্পর্কে নানা রকম বিভ্রান্তি সৃষ্টির তাগিদে বেশ কয়েকজন বিদেশী পণ্ডিতকেও ওঁরা কাজে লাগিয়েছিলেন। ঐ দুই লিপির 'জন্মরহস্য' নিয়ে নানা রকম বিভ্রান্তিকর তত্ত্ব তৈরীরও আয়োজন হয়েছিল। বার্নেল সাহেব জানালেন ফিনিশীয়রা নাকি ভারতবাসীদের লিপিজ্ঞান শিখিয়েছিলেন। অশোকলিপি (দক্ষিণী) টা নাকি সাক্ষাৎ ফিনিশীয়দের কাছ থেকে আনা হয়েছিল। আনা হয়েছিল খ্রীস্টপূর্ব পাঁচ শ' অব্দের আগেও নয় আবার খ্রীস্টপূর্ব চার শ' অব্দের পরেও নয়। সালতামামি আরোপ করার ব্যাপারে ভদ্রলোক এত স্থিরনিশ্চয় হলেন কি করে সেটা অবশ্য তিনি বলেননি। সে যাই হোক. আসল কথায় আসা যাক। ফিনিশীয় লিপি এবং দক্ষিণী ব্রাহ্মী লিপির মধ্যে কোনও সাদৃশ্য কি তিনি দেখেছিলেন ? ফিনিশীয় 'গ' এর সঙ্গে ঐ ব্রাহ্মীর 'গ'-এর কিছুটা মিল আছে আর ফিনিশীয় 'ত' এর সঙ্গে ঐ ব্রাহ্মীর 'ক'-এর। এ-ছাড়া আর কোনও মিলই ত দেখছিনা। মাত্র দুটো অক্ষরের মিল দেখে তিনি ঐ সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন কি করে ?

বুলার সাহেব উল্টো কথা লিখলেন। তিনি বললেন আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব পাঁচ শ' অব্দের কিছু আগে বা পরে ব্রাহ্মী লিপি 'বঢ়ে শ্রমসে নির্মাণ করনে কা কার্য সমাপ্ত হো চুকা থা'। এবং সেমিটিক লিপির ভারতে প্রবেশ ঘটেছিল খ্রীস্টপূর্ব ৮০০ অব্দে। উল্টোপাল্টা নানান তথ্য নানান পণ্ডিতে দিয়েছেন। দিয়েছেন বিভ্রান্তিটা বাড়াতে।

তবে বুলার সাহেব একটা সত্যি কথা বলে ফেলেছেন। ব্রাহ্মী লিপির সৃষ্টিটা যে 'বঢ়ে শ্রমসে নির্মাণ করনে কা কার্য' এটা তিনি স্বীকার

করেছেন। সত্যিই ত' রোমক লিপির একুশটা, তামিলের ছুটো, তেলুগুর তিনটে, ওড়িয়ার একটা, নাগরীর পাঁচটা, গুরুমুখীর ছুটো, গুজরাতির একটা, গ্রীক লিপির পাঁচটা এবং আরবী-ফারসী লিপির তিনটে অক্ষর চুরি করে 'লিপিমালা' তৈরী করে নিতে কি সাহেব পণ্ডিতদের কম কসরৎ করতে হয়েছে ? ব্রহ্মার পরিশ্রমের কথা ভেবে পণ্ডিতের এত চিন্তা এল কেন এ-প্রশ্নের উত্তরটা পাওয়া যাচ্ছেনা। বিভ্রান্তির ওপর বিভ্রান্তি! কিছু আধুনিকতর পণ্ডিত আরেক তত্ত্ব উপহার দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন ভারত থেকে ফিনিশিয়ার দূরত্ব বড্ড বেশী। অত দূর থেকে লিপির আমদানীটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। ব্রাহ্মী লিপিটা নাকি এসেছিল দক্ষিণ সেমিটিক সাবীয় লিপির ক্রম-পরিবর্তনের সূত্রেই। আলোচনার প্রয়োজন বোধ করেছিল কারণ তথাকথিত ঐ সাবীয় লিপিটাও মিথ্যার কারবারীদেরই তৈরী করে নেওয়া।

ব্রাহ্মী-খরোষ্ঠী ও লিপির সংখ্যাবোধক অঙ্ক

ব্রাহ্মী এবং খরোষ্ঠী লিপিতে সংখ্যাবোধক অঙ্ক প্রকাশ করার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল।

নানাঘাট ও নাসিকের শিলালিপিতে ব্রাহ্মী সংখ্যালিপির কিছু নমুনা পাওয়া গেছে। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের বলে প্রচার করা সেইসব নমুনা বিশ্লেষণ করা যাক।

নানাঘাট সংখ্যালিপির ৪ = y ; ৬ = গ্রীক 'শাই' ψ ; ৭ = নীচের বিন্দু বাদ দেওয়া রোমক লিপির প্রশ্নবোধক চিহ্ন ; ১০ = একটু কায়দাকরা গ্রীক আল্‌ফা α ; ২০ = O ; ৬০ = ছোট হাতের টানা f ; ১০০০ = t।

নাসিক সংখ্যালিপির ৪ = y ; ৫ = রোমক লিপির ছোট হাতের টানা r ; ৭ = 7 ; ১০ = গ্রীক আল্‌ফা α ; ২০ = গ্রীক থিটা θ ; ৩০ = z ; ৭০ = কায়দা করা y ; ১০০ = 3।

খরোষ্ঠী সংখ্যাবোধক অঙ্ক চিহ্নগুলোর মধ্যেও রোমক লিপি চুরির ব্যবস্থা হয়েছিল। যেসব মৌলিক অঙ্কচিহ্ন ঐ লিপিতে কাজে লাগানো হয়েছিল তার মধ্যে রোমক লিপির 2, 7, ছোট হাতের টানা n (একটু বাঁকানো) এবং x-এর সন্ধান পেতে কোনও অসুবিধাই হয়না।

বুঝতে কষ্ট হয়না রোমক লিপি এবং অংশত গ্রীক লিপি থেকে অক্ষর চুরি করে নেওয়ার ব্যবস্থাটা ব্রাহ্মী এবং খরোষ্ঠী লিপির সংখ্যালিপি বানিয়ে নেওয়ার কাজেও অব্যাহত ছিল।

ব্রাহ্মী বা খরোষ্ঠী অঙ্কচিহ্নগুলোতে একটি চিহ্নের অভাব লক্ষণীয়। সেটা হচ্ছে শূন্যচিহ্ন। শূন্যবোধক চিহ্ন লিপি দুটির কোনটিতেই ছিলনা। শূন্য চিহ্নের ধারণা আসার আগে শত, সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত ইত্যাদি সংখ্যার ধারণা আসতেই পারেনা। আসাটাই আজগুবি। ইংরাজী hundred বা thousand বা ইটালির mille বা গ্রীক murios শব্দগুলো বেশ পুরানো। কিন্তু ঐ-সব শব্দের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা-জ্ঞাপকতা প্রাচীনকালে ছিলনা। অসংখ্য, প্রচুর বা অগণিত—এই ধারণা প্রকাশ করার জন্যই শব্দগুলো প্রাচীনকালে ব্যবহার করা হত। সুনির্দিষ্ট সংখ্যাজ্ঞাপকতা এসেছে অনেক পরে। বুঝতে কষ্ট হয়না শূন্যের ধারণাসৃষ্টির সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল ঐসব ভাষা-ভাষীদের। পরে ঐ বিশেষ অর্থ আরোপ করার ব্যবস্থা হয়েছিল।

'সুসভ্য' সব দেশে যে প্রাচীনকালে বিরাট বিশাল সংখ্যাধারণার জন্ম হয়েছিল—এই গল্পটা নেহাৎ-ই আজগুবি।

প্রাচীন সব লিপিই জাল

আসলে ইন্টারপোলেশনমার্কা 'প্রাচীন' লিপির সবগুলোই জাল। প্রাচীন ইতিহাস তৈরীর কারখানা ইউরোপে তৈরী। সেসব লিপির মাধ্যমে যেসব নজীর রাখার ব্যবস্থা হয়েছে তার পুরোটাই বানানো—পুরোটাই মিথ্যা। ব্রাহ্মী-খরোষ্ঠী-গ্রন্থ-ওয়াত্তেলুত্তু-মার্কা প্রাচীন লিপি

শুধু ভারতের জন্যই তৈরী করতে হয়নি—হয়েছিল ইতিহাসগর্বী অনেক দেশের জন্যই। জাল-জালিয়াতি-জোচ্চুরির মাধ্যম ঐ-সব লিপি 'আবিষ্কার' না করে রাখলে যে ছুনিয়ার প্রাচীন যুগের ইতিহাসই লেখা সম্ভব হতনা।

প্রচলিত লিপি কি কেউ বাতিল করে ?

ব্রাহ্মী এবং খরোষ্ঠী ছুটো লিপিই নাকি ভারতে প্রচলিত ছিল। ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দিচ্ছে। প্রশ্ন হল : ছু-ছুটো প্রচলিত লিপির অধিকারী ভারতীয়রা বিকল্প লিপির ব্যবস্থা না করে লিপিছুটোকে বাতিল করে বসলেন কেন ? সংস্কৃতির মাধ্যম ও বাহনের প্রয়োজনীয়তা কি হঠাৎ ফুরিয়ে গিয়েছিল ? এটা কি বিশ্বাসযোগ্য ? লিপির ব্যবহার একবার আয়ত্ত করে—লিপির কার্যকারিতায় উপকৃত হয়ে—কেউ তা বাতিল করেনা। যদি করে তবে বুঝে নিতে হয় বিকল্প লিপির ব্যবস্থা সে করেছে। সে-ব্যবস্থা না করে লিপিহীন নৈরাজ্যে অবস্থান করার ইচ্ছাটা পাগলামি। বুদ্ধিমান মানুষ তা করতেই পারেনা। সমষ্টিগত-ভাবে মানুষ পাগলামি করেনা। অথচ ইতিহাসে সেই বৃত্তান্তই পাচ্ছি। ইতিহাসে পাচ্ছি খরোষ্ঠী লিপি নাকি ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চালু ছিল। তার পরে কি সেটা উবে গেল ? অন্য কোনও লিপি কি তার স্থলাভিষিক্ত হল ? না, তাও না। তাহলে ? সমসাময়িক সুউন্নত সংস্কৃত সাহিত্য সবই মুখে মুখে চলত। কি শ্রুতি—কি স্মৃতি সবই। কাব্য মহাকাব্য পুরাণ সবই চলত মুখে মুখে। খরোষ্ঠী লিপি যদি সত্যসত্যই চালু থাকত কিংবা অন্য কোনও লিপি তার পরিবর্তে প্রচলিত হত তাহলে নিশ্চয়ই সে-সাহিত্যকে শ্রুতি-পরম্পরা-নামক আজগুবি নাম নিয়ে বেঁচে থাকতে হতনা। তথাকথিত ব্রাহ্মী এবং খরোষ্ঠী লিপির 'মৃত্যু' এবং আধুনিক ভারতীয় (তথা বহির্ভারতীয় কয়েকটা) লিপির 'জন্মের' মধ্যে যে সময়ের ফারাকটা রয়েছে তা বেশ কয়েক শ' বছরের। এর ব্যাখ্যা হয় না। যাঁরা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তাঁরা ভুল বোঝাবার

চেষ্টা করেছেন। 'বিবর্তনের' তত্ত্বটা গোঁজামিলের তত্ত্ব। কারণ শূন্য থেকে কোনও কিছুরই 'বিবর্তন' হয়না। হয়না ক্রমপরিবর্তনও।

তথাকথিত ম্লেচ্ছদের লিপিও চুরি করা হয়েছিল

ব্রাহ্মী লিপির 'উদ্ভাবন'-এর আধুনিক নেপথ্যশিল্পীরা শুধু ভারত আর ইউরোপের লিপি চুরি করেই ক্ষান্ত হননি। চুরি করেছিলেন সেমিটিক লিপিরও কয়েকটা অক্ষর। বলে রাখা ভালো ঐ ব্রাহ্মী লিপির 'উদ্ভাবন'-কালে সেমিটিক আরবোপারসীক লিপিটা উর্দু (তখন নাম ছিল হিন্দী) ভাষায় বাহন হিসাবে ভারতের বিরাট অঞ্চলেই প্রচলিত ছিল। এখনও আছে। সে যাই হোক, আরবো-পারসীক লিপি-মালার তিনটি অক্ষর ঐ নেপথ্যশিল্পীরা চুরি করেছিলেন। ঐ লিপির 'আলেফ' ব্রাহ্মীতে এসে হল 'র'; 'আয়েন' হল ব্রাহ্মীর 'ভ' আর 'লাম' হল ঐ লিপির 'ল'। ভাবতে অবাক লাগে ব্রাহ্মী লিপির শতাব্দীওয়ারী রূপভেদের ব্যবস্থা করতে গিয়ে এমন লিপিও চুরি করার আয়োজন হয়েছিল যে লিপির জন্ম ব্রাহ্মী লিপির প্রচারিত জন্মকালে হয়ইনি। ঐ আরবো-পারসীক লিপির জন্ম যে খ্রীস্টপূর্ব কোনও শতাব্দীতে হয়নি এ-ব্যাপারে সব পণ্ডিতই একমত। আর চুরি বলে চুরি! ব্রাহ্মী 'ল' আর আরবোপারসীক লিপির 'লাম' যে অবিকল একই অক্ষর। উচ্চারণেও এক—আকৃতিতেও তাই। এত কাঁচা চুরি ওঁরা করতে গেলেন কেন?

প্রাচীন লিপি প্রচলনের লিখিত নজীর

ব্রাহ্মী এবং খরোষ্ঠী লিপি যে একদা ভারতে প্রচলিত ছিল এ-সম্পর্কে লিখিত নজীর কি আছে দেখা যাক। প্রথমে হিন্দুধর্মসম্পর্কিত উৎসগ্রন্থের কথা আসছে। নারদস্মৃতিতে পাচ্ছি:

না করিষ্যত্যদি ব্রহ্মা লিখিতং চক্ষুরুত্তমম্
তবেয়মস্য লোকস্য নাভবিষ্যৎ শুভা গতিঃ।

নয়নমনোহর ব্রাহ্মী লিপির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উচ্ছ্বাস দেবলোকের বাসিন্দা নারদের ছদ্মনামে নরলোকের কোন্ মহাপ্রভু লিখেছেন তা জানার উপায় নেই। কিন্তু একটি প্রশ্ন আসছেই। ব্রাহ্মী লিপি চালু থাকা সত্ত্বেও সংস্কৃত ভাষা ঐ লিপিতে লেখার ব্যবস্থা হতনা কেন? কেন ঐ লিপি শুধু শিলালিপি লেখার কাজেই ব্যবহার করা হত? কোন গ্রন্থই ঐ লিপিতে লেখা হয়নি কেন? অন্য গ্রন্থের কথা বাদই দিলাম ঐ নারদস্মৃতিটাই-বা ঐ লিপিতে লেখা হয়নি কেন? সে-গ্রন্থ কেনই বা স্মৃতির মণিকোঠায় রাখার দরকার পড়ত?

নজীরের বহর আছে। শুধু 'হিন্দু উৎসগ্রন্থে'ই ব্রাহ্মীপ্রসঙ্গ নেই। আছে বৌদ্ধ এবং জৈনদের বইয়েও। বৌদ্ধদের সংস্কৃত গ্রন্থ 'ললিত-বিস্তার'-এ ৬৪টি লিপির নাম আছে যার প্রথম নাম ব্রাহ্মী এবং দ্বিতীয় নাম খরোষ্ঠী। পন্নবণাসূত্র এবং সমবায়াংগ সূত্রে ১৮টি লিপির নাম পাওয়া যাচ্ছে যার প্রথম নাম বংভী (ব্রাহ্মী)। ওঁদের 'ভগবতী সূত্রে'র লেখক একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। ভক্তিগদগদ হয়ে ঐ লিপিকে প্রণাম জানিয়ে বসেছেন 'নমো বংভীএ লিবিএ' সূত্রের মধ্য দিয়ে।

'ললিতবিস্তার' লেখা হয়েছে কবে?
'হিউ-এন্-সাঙ্'-ই বা কে?

সুললিত মিথ্যাবিস্তারের ঐ 'ললিতবিস্তার' যে একটি প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়—ওটা যে আধুনিককালে লেখা একটি 'প্রাচীন' বই এটা বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। কষ্ট হয়না কারণ ঐ ব্রাহ্মী আর খরোষ্ঠী নামের দুটো জাল লিপির প্রাচীন প্রচলনের সাক্ষ্য দিতে গিয়ে ঐ বইয়ের লেখক নিজের বইয়ের আধুনিকত্বটাকেই প্রকট করে তুলেছেন। জাল লিপির সাফাই গাওয়ার যে বিপদ আছে এইটাই তিনি বুঝতে পারেননি। জাল লিপির ওপর প্রাচীনত্ব আরোপ করার দায়িত্ব নিতে

গিয়ে পরোক্ষভাবে নিজের লেখা বইয়ের অর্বাচীনত্বই জাহির করে বসেছেন ভদ্রলোক। এ-রকম ভুল একা শুধু তিনিই করেননি। করেছিলেন অনেক নামী 'ব্যক্তি'ই। 'ব্যক্তি' অর্থে ঐ ইতিহাসের একাধিক চরিত্রকেই বুঝতে হবে। আসলে আধুনিক জালিয়াতিকে প্রাচীন বলে চালানোর চেষ্টা আর তার সাফাইয়ের আধুনিক ব্যবস্থাটাকে প্রাচীন বলার আয়োজন করতে গিয়ে মিথ্যার কারবারীরা বড্ড বেশী গোলমাল করে ফেলেছেন। এবং সেই গোলমাল করার সূত্রে এমন সব তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে যা চাঞ্চল্যকর। এমন আর একটি উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। ইতিহাসে পাচ্ছি হিউ-এন্-সাঙ্ নাকি ৬২৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে কাটিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তের এক জায়গায় লিখেছিলেন "ভারতবাসীদের বর্ণমালার অক্ষর ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল আর ঐটারই রূপ (রূপান্তর) আগে থেকে এখনও চলে আসছে।" (উৎস—প্রাচীন ভারতীয় লিপিমালা (হিন্দী)—লেখক গৌরীশংকর হীরাচাঁদ ওঝা) বুঝতে কষ্ট হয়না 'ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্ট' বর্ণমালার পরিচয় দিয়ে ব্রাহ্মীলিপিরই প্রসঙ্গ তিনি তুলেছিলেন। প্রশ্ন হল অস্তিত্বহীন ঐ জাল লিপির প্রসঙ্গ ঐ হিউ-এন্-সাঙ্ তুলতে গেলেন কেন? তুলেছিলেন ঐ ব্রাহ্মী লিপির পাথুরে অস্তিত্বের প্রাচীনত্বের লিখিত প্রমাণ খাড়া করার তাগিদে। সিদ্ধান্ত নিতেই হচ্ছে হিউ-এন্-সাঙ্ নামের কোনও চীনা পর্যটক ভারতে আসেনই নি—ঐ চরিত্রটি মিথ্যার কারবারীদের তৈরী করে নেওয়া। ভারতীয় মিথ্যার অভারতীয় প্রমাণ রাখার ব্যবস্থা হিসাবেই ঐ চরিত্রটি বানানো হয়েছিল। ঐ হিউ-এন্-সাঙ্ যদি সত্যিই ভারতে এসে থাকতেন তাহলে নিশ্চয়ই ঐ জাল লিপি চালু থাকার গল্পটা তিনি বানাতেন না। বানাবার দরকারই বোধ করতেন না। আঠারো কিংবা উনিশ শতকে তৈরী করে নেওয়া ঐ দুটো জাল লিপির কথা সপ্তম শতাব্দীর ঐ হিউ-এন্-সাঙ্-এর জানার প্রশ্নই ওঠে না। আর একটা কথা। 'ললিতবিস্তার'-এর লেখক শুধু ব্রাহ্মী আর খরোষ্ঠী লিপিরই

সন্ধান দেননি। দিয়েছিলেন চৌষট্টিটা লিপির তথ্য। যেযুগে ভারতে কোনও লিপিরই প্রচলন ছিলনা সেই যুগে চালু থাকা চৌষট্টিটা লিপির গল্প লেখা ঐ 'ললিতবিস্তার'-এর নেপথ্য লেখকের পক্ষেই সম্ভব ছিল। কারণ তিনি ছিলেন ভাড়াটে লেখক—মিথ্যার কারবারীদের অনুগৃহীত আত্মগোপনকারী কোনও আধুনিক পণ্ডিত। দুঃখের কথা ছদ্মবেশটা খসে পড়েছে।

তথ্য আরও পাচ্ছি। ঐ পন্নবণাসূত্র, ঐ সমবায়াংগসূত্র বা ঐ ভগবতীসূত্র ইত্যাদি বিচিত্র উদ্ভট সব নামের বইগুলোও আধুনিককালে লেখা 'প্রাচীন' গ্রন্থ। জাল লিপির প্রচলনের সাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধে ঐসব বইয়ের লেখকদের প্রতারক হিসাবে সনাক্ত করতে কোনও অসুবিধাই হয় না।

গ্রীকো-রোমক লিপির সঙ্গে ব্রাহ্মী খরোষ্ঠীর এত মিল —অন্য কোনও ব্যাখ্যা কি সম্ভব?

অনেকে প্রশ্ন করে বসবেন গ্রীকো-রোমক লিপির সঙ্গে ব্রাহ্মী বা খরোষ্ঠী লিপির এই প্রচণ্ড সাদৃশ্য থাকার ব্যাপারটাকে সন্দেহ করার কি আছে। এমনও ত' হতে পারে ঐ ব্রাহ্মী বা খরোষ্ঠী লিপি থেকেই গ্রীকো-রোমক লিপির রূপকল্পনার জন্ম হয়েছে। এই আজগুবি কথার উত্তরে বলতেই হয় তা যদি সত্যিসত্যিই হত তাহলে অক্ষরগুলোকে উল্টেপাল্টে—কখনও দাঁড়ানো অক্ষরের শোয়ানোর ব্যবস্থা করে—কখনও দক্ষিণমুখী অক্ষরকে বামমুখী করার নানান কায়দা দেখিয়ে তা করা হত না। আর যদি মনে করে নেওয়া যায় ঐ গ্রীকো-রোমক লিপির প্রভাবেই প্রাচীন কালে ভারতে ঐ ব্রাহ্মী বা খরোষ্ঠী লিপির জন্ম হয়েছিল তাহলেও ত' ঐ একই প্রশ্ন এসে যায়। তা যদি সত্যিই হত তাহলে উল্টোপাল্টা এত কায়দা করার দরকার পড়ত না। সিদ্ধান্ত নিতেই হয় দুটো অনুমানই আজগুবি।

আর একটা কথা। ব্রাহ্মী বা খরোষ্ঠী লিপির সঙ্গে গ্রীকো-রোমক

লিপির সাদৃশ্য থাকার ব্যাপারটাকে কোন পণ্ডিতই আলোচনার যোগ্য বলে মনে করেননি কেন? দু-একটা অক্ষরের মধ্যে মিল থাকার সুবাদে তথাকথিত ফিনিশীয় বা অ্যারেমেইক উৎসের ভূতুড়ে গল্প বানানোর আয়োজনই বা পণ্ডিতেরা করতে গেলেন কেন?

লিপি কি অপরিবর্তনীয়?—একটি তথ্য।

যত জটিলতাই থাকুক, যত অসম্পূর্ণতাই থাকুক বা যত ঔদ্ভট্যই থাকুক নিজের নিজের ভাষার লিপি সম্পর্কে মানুষের অভ্যাসগত একটা সংস্কার গড়ে ওঠে। গড়ে ওঠে একটা মমত্ববোধ—গড়ে ওঠে একটা আত্মীয়তা। এমন একটা আত্মীয়তার ভাব যার সঙ্গে তুলনা চলে একমাত্র ভাষার। মানুষ তার নিজের নিজের লিপিকে আঁকড়ে থাকে। (যেমন আঁকড়ে থাকে নিজের নিজের ভাষাকে)। ছাড়তে চায় না। সে-লিপির অপরিবর্তনীয়তার ওপরও তার অগাধ বিশ্বাস। বিশ্বাস বেশীর ভাগই অন্ধ। তবে ঐ বিশ্বাসের মূলে কাজ করে ব্যবহারিক সুবিধা অসুবিধার প্রশ্নটাই। অ আ ক খ'র ছাত্রদের কথা বাদ দিলে আমরা কেউই বানান করে কিছু পড়িনা। শব্দের বা শব্দগুচ্ছের চিত্ররূপটা আমাদের চোখে ভেসে ওঠে। আর তাইতেই কাজ হয়। অভ্যস্ত সেই চিত্ররূপের কিছু পরিবর্তন ঘটলেই চোখ থমকে যায়। সেটা বানানবিভ্রাটের জন্যই হোক বা অক্ষরের রূপপরিবর্তনের জন্যই হোক। আমরা কোনটাকেই মেনে নিতে চাই না। কোনও মানুষই চায়না। এবং চায়না বলেই লিপির পরিবর্তন হয় না। হলেও সামান্য কিছু ঘটে। তাই যে লিপি চালু হয় তাই চলে। না বদলেই বেঁচে থাকে ঐ লিপি। ভাষাভাষীর ঐকমত্যে বা রাষ্ট্রিক সিদ্ধান্তে নিজের লিপি বদলে অন্য লিপি গ্রহণ করার নজীর আছে। লিপির পরিবর্তন নৈব নৈব চ। কালের খেলায় ভাষা বদলায়—মাধ্যম ঐ লিপিটা বদলায় না। লিপির পরিবর্তনের বা তথাকথিত বিবর্তনের যত তত্ত্ব আজ পর্যন্ত তৈরী হয়েছে তা সবই ভ্রান্ত। বর্তমানে চালু লিপির উৎস বলে প্রচারিত

তথাকথিত সুপ্রাচীন লিপিগুলোর কোনটারই প্রচলন ছিলনা। দুনিয়ার পণ্ডিতদের ঠকানোর খেলাটা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। এখনও চলছে। দুনিয়ার তথাকথিত সুপ্রাচীন সব লিপিই ইউরোপের মিথ্যার কারবারীদের বানিয়ে নেওয়া। 'সুপ্রাচীন' ঐসব লিপি—আর ঐসব লিপিধৃত সুপ্রাচীন 'মৃত'-ভাষা—সবই ওঁরা তৈরী করে নিয়েছিলেন। করে নিয়েছিলেন 'প্রাচীন ইতিহাস' নামক প্রতারণার ভূতুড়ে উপাদান বানিয়ে রাখার তাগিদে। ঐ হায়েরোগ্লিফিক, ঐ ডিমোটিক, ঐ লিনিয়ার A, B, ঐ কিউনিফর্ম বিশেষণে সবিশেষ প্রত্যেকটি লিপি ওঁদেরই তৈরী। 'মৃত' ভাষাও কিছু কম তৈরী করে. রাখেননি ওঁরা। 'মৃত'-বৎসা প্রতিভা যে ওঁদের ছিল এটা মানতেই হয়। তথাকথিত ফিনিশীয় লিপি এবং তার নানান রূপভেদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এ-বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে থাকবে।

প্রাচীন লিপি—উপসংহার

প্রাচীন লিপি সম্পর্কিত আলোচনার মধ্য দিয়ে যেসব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি তা সংক্ষেপে জানানো যাক। এক, ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী বা ঐ দুই লিপির নানান রূপভেদ ব্যবহার-করা প্রাচীন ভারতের সমস্ত শিলালিপি, তাম্রলিপি প্রত্নমুদ্রাই প্রতারণা। আর ওগুলো প্রতারণা বলেই বলতে হয় ঐসব কিছুর ওপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিকেরা যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা' নেহাৎই ভ্রান্তি। অন্য কিছু নয়। দুই, দুনিয়ার প্রাচীন সব লিপিই জালিয়াতি। রোমক এবং গ্রীক লিপির সুপরিকল্পিত সামান্য কিছু বিকৃতিসুকৃতির মধ্য দিয়েই ঐসব তথাকথিত প্রাচীন লিপির রূপকল্পনার জন্ম হয়েছিল। জন্ম হয়েছিল আধুনিক কালেই। তথাকথিত হায়েরোগ্লিফিক বা কিউনিফর্ম (কীলকাকৃতি) লিপিতে গ্রীকো রোমক লিপির প্রভাবনিরপেক্ষ বেশ কিছু 'মৌলিক' চিহ্ন সৃষ্টির আয়োজন হলেও প্রথমোক্ত লিপিটিতে দু-একটা গ্রীকোরোমক লিপির অক্ষরের সন্ধান পেতে কোনও অসুবিধাই হয় না। H+XUV

সবই আছে ঐ লিপিতে। তিন, ঐসব লিপিই আধুনিক ইউরোপের ভাড়াটে নেপথ্য পণ্ডিতদের তৈরী করে নেওয়া। ওসব যে আধুনিক-কালে বানিয়ে নেওয়া তার প্রমাণ হিসাবে শুধু এইটুকুই বলব প্রাচীন ইতিহাস লেখার পরিকল্পনার জন্মই হয়েছিল আধুনিক কালে। প্রাচীনকালে নয়। চার, ধাতব, মৃন্ময় বা পাথুরে 'লিখিত' প্রমাণ রাখার দরকার পড়েছিল বানানো প্রাচীন ইতিহাস-এর তথ্যসমৃদ্ধ প্রত্ন-উপকরণ বানানোর তাগিদে। পাঁচ, জাল লিপির মাধ্যম ব্যবহার করা শিলালিপি-তাম্রলিপি-চোঙালিপি (cylinder seal)-মৃন্ময়লিপির সবই জাল। ঐসব 'প্রত্ন-উপকরণ' যদি সত্যই প্রাচীনকালের হত তবে নিশ্চয় আধুনিককালে তৈরী করে নেওয়া জাল লিপিতে ওসব 'লেখা'র দরকার পড়ত না। অজাত লিপিতে কিছু খোদাই করে রাখার তথ্যটাই আজগুবি। ছয়, ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর অর্থানুকূল্য ছাড়া লিপিঘটিত মিথ্যাসৃষ্টির ব্যয়সাপেক্ষ কর্মকাণ্ড সম্ভবই হতনা। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর ভূমিকাকে একটু বড় করেই দেখার দরকার আছে। কারণ ঐসব রাষ্ট্রের যৌথ উদ্যোগেই ঐ 'ইতিহাস'-টা বানানো হয়েছিল। ঐ ধরণের নেপথ্য কাজকর্মে—জাল লিপি এবং জাললিপির মাধ্যমে প্রকাশ করা বিপুল পরিমাণ প্রত্নউপকরণ বানিয়ে রাখার কর্মকাণ্ডে—খরচ কম হওয়ার কথা নয়। সাত, ঐসব জাললিপির 'উদ্ভাবক'দের নামঠিকানা জানার উপায় না থাকলেও ঐসব লিপি সম্পর্কে রাজ্যের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার কর্মকাণ্ডে জড়িত পণ্ডিতদের নামধাম সবারই জানা। এঁদের সনাক্ত করে নিতে কোনও অসুবিধাই হয়না। বুঝতে কষ্ট হয়না এই সুমহান কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত পণ্ডিতদের সকলেই ছিলেন রাষ্ট্রপোষ্য জীব। প্রচণ্ড পাণ্ডিত্যের ছদ্মবেশের আড়ালে ঐসব পণ্ডিত রাষ্ট্রের ইণ্টেলেক্চুয়াল প্রস্টিটিউট-এর ভূমিকা পালন করেছিলেন। আট, ব্যক্তিবিশেষের কিংবা কয়েকজন পণ্ডিতের সত্যানুসন্ধিৎসার তাগিদে ভূতের বাবার শ্রাদ্ধ হয়না। নানান রাষ্ট্রের নীতিঘটিত এবং আর্থিক মদৎ না পেলে প্রাচীন ইতিহাস

লেখার রাজসূয় কর্মকাণ্ড শুরুই হতনা। মোট কথা প্রাচীন ইতিহাসের ধাতব বা পাথুরে 'প্রমাণে'র অসারত্ব প্রমাণ করার জন্যই লিপিঘটিত আলোচনাটা রেখেছি। আলোচনাটা রেখেছি প্রাচীন লিপির বুজরুকিটা বোঝানোর জন্যই। ভাবতে অবাক লাগে আমাদের অশোক-চন্দ্রগুপ্ত-কনিষ্কদের ঐতিহাসিকত্ব নির্ভর করছে ভূতুড়ে লিপিতে খোদাই করা ভূতুড়ে শিলালিপির ওপরেই। দারয়বৌস খারয়বৌসদের সম্পর্কেও ঐ একই কথা খাটে। একই কথা খাটে দুনিয়ার তাবৎ প্রাচীন 'ঐতিহাসিক' চরিত্রগুলোর সম্পর্কেই। এর পরেও যাঁরা বলবেন ওঁরা সব ঐতিহাসিক পুরুষ—ওঁরা সব প্রামাণ্য ব্যক্তিত্ব—তাঁরা নেহাৎই অনুকম্পার পাত্র।

প্রসঙ্গ ঃ সিন্ধু-সভ্যতা

সিন্ধু-সভ্যতা সম্পর্কে কিছু নতুন কথা

মোহেন্-জো-দড়ো—হরপ্পার তথাকথিত সিন্ধুসভ্যতা সম্পর্কে ভারতের মানুষের গর্ববোধের শেষ নেই। ঐ সভ্যতার 'আবিষ্কার'-এর সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার বয়স এক ধাক্কায় দেড় হাজার বছর বেড়ে গেল। সাহেব-পণ্ডিতদের স্বকপোলকল্পিত সালতামামি চাপানোর ঠেলায় তথাকথিত বৈদিক যুগটাকে খ্রীস্টপূর্ব দেড় হাজার অব্দে স্থাপন করে আমরা আনন্দ পেয়েছিলাম আগেই। মোহেন্-জো-দড়ো—হরপ্পার কল্যাণে ওঁদেরই আরোপ করা আর একপ্রস্থ সালতারিখ চাপানোর খেলায় আমরা অভিভূত হয়ে গেলাম। আমাদের সভ্যতা যে ইজিপ্ট, মেসোপটেমিয়া বা ক্রীট-এর চেয়ে নতুন নয়—এই 'সত্য' উদ্ঘাটিত হওয়ায় ঐতিহ্যসচেতন ভারতীয়রা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলেন। সত্যিই ত' এটা কি কম কথা !

তথাকথিত সিন্ধুসভ্যতার মূল স্থাপত্য নিদর্শনের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে প্রশ্নটা আপাততঃ মুলতুবী রাখছি। প্রশস্ত রাজপথ, পরিকল্পিত পয়ঃপ্রণালী, স্নানাগার বা পণ্যাগার প্রসঙ্গে কোনও বক্তব্য রাখছি না। বক্তব্যটা সীমাবদ্ধ রাখছি ঐ সভ্যতার প্রত্ন উপকরণ সম্পর্কেই। ঐসব উপকরণের মধ্যে কিছু কারসাজি করা হয়েছিল কিনা—প্রতারণা তঞ্চকতা কিছু করা হয়েছিল কিনা—এইটুকুই অলোচনা করব। প্রত্ন উপকরণ যা কিছু পাওয়া গেছে তা ঐ আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভের সৌজন্যেই। সার্ভের লোকজনেরা যে কেউ ধোয়া তুলসী পাতা ছিলেন না তা জানা গেছে ওঁদের ব্রাহ্মী-খরোষ্ঠী লিপি-ঘটিত জালিয়াতির উদ্যোগটা বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে। সে বিশ্লেষণ আগের অধ্যায়ে রেখেছি। এখন দেখা যাক মোহেন্-জো-দড়ো হরপ্পায় ওদের ভূমিকাটা কি ছিল।

সে ভূমিকার কথা বলার আগে ঐ তথাকথিত প্রত্নউপকরণের স্বরূপলক্ষণ নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

সিন্ধুসভ্যতার প্রত্নউপকরণের মধ্যে প্রচণ্ড বক্তব্য ছিল বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করে নিয়েছেন। উপকরণের বৈচিত্র্য 'বিশ্লেষণ' করে নানান তথ্য তৈরী করে নিতে পণ্ডিতদের কোনও অসুবিধাই হয়নি। ঐ সুসভ্য সমাজের ধর্মীয় চিন্তা, সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা, অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার অনেক কিছুই পণ্ডিতেরা 'আবিষ্কার' করে নিয়েছেন। কল্পিত সভ্যতার যে বিবরণ তৈরী করে নেওয়া হয়েছে তার আকৃতি খুব একটা ছোট নয়। প্রত্ন-উপকরণগুলোর মধ্যে প্রতীক-ধর্মী কাণ্ডকারখানা বড্ড বেশী। আর ঐসব প্রতীকের মধ্যে কেউ রামায়ণের গল্প 'আবিষ্কার' করেছেন—কেউবা আদি শিবের কল্পনা করে আনন্দ পেয়েছেন। পণ্ডিতেরা কে কি তত্ত্ব তৈরী করেছেন—কে কি তথ্য বানিয়েছেন সে-প্রশ্নে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই। কারণ সে-সব কিছুর ওপর কিছুমাত্র গুরুত্ব দেওয়ার দরকার বোধ করছি না।

সিন্ধু সভ্যতার প্রত্নউপকরণের মধ্যে দুর্বোধ্য লিপিযুক্ত সীলমোহর, মূর্তিগত সাক্ষ্যপ্রমাণ, রোজকার জীবনে কাজে লাগে এমন কিছু টুকিটাকি জিনিষপত্র—কিছু অস্ত্রশস্ত্র বা ধাতব পদার্থ যা কিছু পাওয়া গেছে তার মধ্যেই আলোচনাটা সীমাবদ্ধ রাখব। সীলমোহর দিয়েই শুরু করা যাক্ সীলমোহর কিছু পোড়ামাটির, কিছু নরম পাথরের তৈরী। তামা এবং ব্রোঞ্জের তৈরী সীলমোহরও কিছু পাওয়া গেছে। এতে নানারকম প্রতীকের সংস্থান ছিল। প্রতীকগুলোর বক্তব্য সম্পর্কে নানান পণ্ডিত নানান মত পোষণ করেছেন—বক্তব্যও রেখেছেন। মোট কথা প্রতীকগুলো ছিল সীলমোহরের ব্যক্ত অংশ। এছাড়া ঐ সীলমোহরে আপাতদৃষ্টিতে লিপি বলে মনে হয় এমন কিছু চিহ্নও ছিল। চিহ্ন-গুলোকে সীলমোহরের অব্যক্ত অংশ বলেই ধরে নিতে হয়। কারণ ঐ-সব লিপির পাঠোদ্ধার এখনও পর্যন্ত হয়নি। ব্যক্ত-অব্যক্ত চিহ্নযুক্ত

ঐসব সীলমোহরের প্রতীকী কাণ্ডকারখানা সম্পর্কে কিছু লেখার আগে তথাকথিত ঐ লিপিমালা সম্পর্কেই আলোচনাটা সেরে নেওয়া যাক।

সিন্ধু লিপির 'রহস্য'-সিন্ধু

ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি-মার্কা চিহ্ন দিয়ে শুরু করা এবং সুন্দর সুন্দর নক্সা দিয়ে শেষ করা মোহেন্-জো-দড়োর তথাকথিত লিপিমালা সত্যই অপূর্ব। তবে অপূর্ব বিস্ময় নয়—ওটা অপূর্ব রসিকতা। ঐ 'লিপিমালা' দুনিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের কাছে সপ্তমাশ্চর্যের একটি। ঐ লিপির মধ্যে নাকি প্রচণ্ড রহস্য লুকিয়ে আছে আর সে-রহস্যের কুলকিনারা করতে গিয়ে পণ্ডিতেরা নাকি হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। সত্যিই কি ঐ লিপিমালায় রহস্য বলে কিছু আছে? আমি ত কিছুই দেখছিনা। কারণ আসলে ওটা কোনও লিপিই নয় —ওটা বিশুদ্ধ একটি জালিয়াতি। এবং জালিয়াতির মধ্যে জোচ্চুরি থাকে—রহস্য থাকে না। 'লিপি'র প্রসঙ্গে আসা যাক। ঐ 'লিপিমালা'য় চারশ সতেরোটা চিহ্ন আছে। বিভিন্ন আকৃতির— বিভিন্ন প্রকৃতির। বিভিন্ন প্রকৃতির বলার কারণ এই যে ঐ 'লিপিমালা'য় কিছু চিত্রলিপি আছে, কিছু অ্যালফাবেট আছে—আছে কিছু সিলেবারিও। তিনরকম প্রকৃতির লিপি একই লিপিমালায় থাকার কথা নয় তবু আছে। থাকাটা সন্দেহজনক কিনা সে প্রশ্নে পরে আসছি। এছাড়া কিছু সংযুক্তবর্ণের অস্তিত্বের খবরও কোনও কোনও পণ্ডিত দিয়েছেন। ঐ 'লিপিমালা'য় পঁচাশিটা চিত্রলিপি রয়েছে—যেগুলোর চিত্রধর্মিতা প্রশ্নাতীত। মাত্র পঁচাশিটা চিহ্ন সম্বল করে চিত্রলিপি বানানোর প্রয়াস কেউ নেননা। ঐ লিপির প্রাচীন কারিগরেরা নিয়েছিলেন এই তথ্যটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ ঐ ধরণের লিপি বানানোর ইচ্ছাটা আন্তরিক হলে ঐ কটা চিহ্ন নিয়ে কেউ এগোননা। দরকার পড়ে অনেক বেশী চিহ্নের। সিদ্ধান্ত

নিতেই হয় ঐসব চিহ্ন কোনও চিত্রলিপির নয়। বিভ্রান্তি আনার জন্যই যে ঐ কটা চিত্রলিপির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল এটা বুঝে নিতে কষ্ট হয়না। এর পরে আসছে কিছু অঙ্কচিহ্নের কথা। মোট আটত্রিশটা সংখ্যাবোধক চিহ্ন ঐ 'লিপিমালা'য় আছে যেগুলো সংখ্যা বোঝাবার অত্যন্ত কাঁচা ব্যবস্থা ছাড়া কিছুই নয়। এখানে একটি প্রশ্ন আসছে। সংখ্যাবোধক চিহ্ন এত বেশী মাত্রায় রাখার দরকারটা পড়ল কেন। দরকার ছিল বৈকি। 'সুসভ্য' সব দেশে যে প্রাচীনকালেই বিরাট বিশাল সংখ্যা-ভাবনার জন্ম হয়ে গিয়েছিল—এই প্রচণ্ড মিথ্যাটা প্রচার করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন দুনিয়ার প্রাচীন ইতিহাস তৈরীর নেপথ্য-শিল্পীরা। আর সে-দায়িত্ব নিয়েছিলেন বলেই দেশে দেশে বিরাট-বিশাল সংখ্যাজ্ঞাপক অঙ্কচিহ্ন ওঁরা বানিয়ে রেখেছিলেন। বানিয়ে রেখেছিলেন ঐ মিথ্যার লিখিত 'প্রমাণ' খাড়া করার উদ্দেশ্যেই। উত্তরকালের পণ্ডিতেরা (এঁদের বেশীর ভাগই মিথ্যার কারবারীদেরই সাকরেদ) ঐসব চিহ্নের ওপর হাজার, অযুত, লক্ষ, নিযুত ইত্যাদি সংখ্যা আরোপ করার খেলা খেলেছেন। বিরাট বিশাল সব সংখ্যা 'আবিষ্কার' করে নিতে ওঁদের কোনও অসুবিধাই হয়নি। মজার কথা ওঁরা অনেক সংখ্যাই 'আবিষ্কার' করে নিয়েছেন। করেননি শুধু শূন্য চিহ্নটার আবিষ্কার। করেননি কারণ তা করার সুযোগ ছিল না। মিথ্যার কারবারীদের তৈরী করে নেওয়া প্রাচীন কোনও লিপিতেই শূন্যের সংস্থান ছিল না। ছিল না মোহেন্-জো-দড়োর লিপিতেও। শূন্য-চিহ্নটা থাকলে যে ঐ আটত্রিশটা সংখ্যাচিহ্ন বানিয়ে রাখার দরকারই পড়ত না। আসল কথায় আসা যাক। শূন্যচিহ্নের ধারণা-সৃষ্টির আগে যে বিরাট বিশাল সংখ্যার ধারণা আসতেই পারে না—এই ছোট্ট তথ্যটির ওপর কোনও পণ্ডিতই গুরুত্ব দেননি। এবং দেননি বলেই সাহেবপণ্ডিতদের তৈরী করে নেওয়া আজগুবি গল্পটাকে সবাই বিশ্বাস করে বসেছেন। বিশ্বাস করেছেন বৈদিক যুগের মানুষেরা বিরাট বিরাট সব সংখ্যার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। বিশ্বাস করেছেন

মোহেন্-জো-দড়ো—হরপ্পার মানুষগুলোও নাকি বড় বড় সংখ্যার ধারণা আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন।

এর পরে আসছে হরেক রকম ডিজাইনের সুন্দর সুন্দর রেখাচিত্রের কথা। চলতি বাংলায় নক্সাই বলতে হয় ঐ রেখাচিত্রগুলোকে। সুষম-বিষম দু-রকম নক্সাই আছে। ডবল লাইনের ঘেরাটোপ মার্কা নক্সারও অভাব নেই। আর নক্সা বলে নক্সা! এত নক্সাও মানুষে করতে পারে! আর ঐ নক্সার জঞ্জাল ঘেঁটে পণ্ডিতেরা বেশ কিছু স্বরচিহ্নযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সন্ধান পেয়েছেন। পেয়েছেন কিছু স্বরচিহ্নহীন অ্যালফাবেটেরও। পণ্ডিতদের বলিহারি! ঐ লিপির বেশীর ভাগই ডান দিক থেকে বাঁ দিকে লেখা বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করে নিয়েছেন—এবং 'প্রমাণ' দেওয়ার চেষ্টাও করেছেন। কিছু আবার বাঁ দিক থেকে ডান দিকে লেখা—এও তাঁরা বুঝে ফেলেছেন। কিছু ওপর থেকে নীচে লেখা লিপিরও সন্ধান তাঁরা দিয়েছেন। আশ্বাসের কথা এই যে নীচ থেকে ওপরে পড়া যায় এমন লিপি পণ্ডিতেরা সনাক্ত করতে পারেননি। লিপির নানান রকম লিখনকৌশলের শতকরা ভাগ জানানোর চেষ্টাও পণ্ডিতেরা করেছেন। তবে পুরো এক শ' ভাগের হিসাব তাঁরা দেননি। সম্ভবত নীচ থেকে উপরে 'পড়া যায়' এমন কিছু লিপির ইঙ্গিত দেওয়ার জন্যই ঐ ব্যবস্থা! পণ্ডিতেরা এমন লিপিও 'আবিষ্কার' করেছেন যা বাঁ দিক থেকে ডান দিকেও 'পড়া যায়'—ডান দিক থেকে বাঁ দিকেও। 'পড়া যায়'—অর্থে চিহ্নগুলো একই ক্রমে আসে এইটাই বুঝতে হবে। অর্থাৎ রমা কান্ত কামার-এর মোহেন-জো-দড়ো সংস্করণ।

লিপি নিয়ে এত ইয়ার্কি করার দরকারটা পড়ল কেন? আর লিপির নামে এত নক্সাই-বা করা হল কেন? পণ্ডিতেরা এ-সব প্রশ্ন কেউই তোলেননি। তোলার দরকার বোধ করেননি। একই লিপি একটি লাইনে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে আবার পরের লাইনে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে লেখা হবে আর পাঠক সেটা মেনে নেবে এ-তথ্যটাই

আজগুবি। Picture কে erutciP লেখা হবে আর পাঠক অম্লান বদনে তা সহ্য করবে—এটা ভাবাই যায়না। ভাবা যায় না তবু ঐ আজগুবি তথ্যের একটি সুন্দর নামকরণ করা হল 'boustrophe-don'. সাহেব পণ্ডিতদের তৈরী করে নেওয়া ঐ শব্দের মহিমা আছে। শব্দ যখন রয়েছে তথ্যটিও নিশ্চয়ই সত্য। পণ্ডিতেরা তথ্যটিকে মেনে নিলেন। আসলে উল্টোপাল্টা তথ্য এবং তত্ত্ব বানাতে গিয়ে পণ্ডিত-ঠকানো বিচিত্র এবং উদ্ভট শব্দ কম তৈরী হয়নি। কোনটা গ্রীকমূলীয়—কোনটা ল্যাটিনমূলীয় (ভারতে তৈরী করা ঐ জাতীয় শব্দ সবই সংস্কৃতমূলীয়)। আর ঐসব বিচিত্রমূলীয় শব্দব্রহ্মের অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশের ফলে অভিধানের কলেবর ভীতিপ্রদ অবস্থায় পৌঁছেছে। সে যাই হোক, লিপির প্রসঙ্গে ফেরা যাক। 'চিত্রলিপি', সংখ্যাবোধক অঙ্ক এবং নক্সার কথা আগেই বলা হয়েছে। এর পরে আসছে মোটামুটি অক্ষরের মত দেখতে এমন কিছু চিহ্নের প্রসঙ্গ। সেইসব চিহ্ন থেকে ব্রাহ্মী লিপির বেশ কয়েকটা অক্ষর সনাক্ত করে নিতে কোনও অসুবিধাই হয়না। ব্রাহ্মী লিপির গ ঘ ত ব প ধ র এবং থ অবিকৃতভাবেই রাখা হয়েছে ঐ লিপিতে। এছাড়া কিছু বিকৃতির মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মী লিপির ও ক চ জ ট ব অন্তঃস্থ ব ল ম য় ও ঠাঁই করে নিয়েছে ঐ লিপিতে। সবই আছে ঐ মোহেন্-জো-দড়োর লিপিমালায়। মার্শাল সাহেব নিজেই এইসব তথ্য এগিয়ে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে বিচিত্র সংবাদ। আঠারো কিংবা উনিশ শতকে তৈরী করে নেওয়া ব্রাহ্মী লিপির খবর পাঁচ হাজার বছর আগেকার মোহেন্-জো-দড়োর সুসভ্য নাগরিকেরা পেলেন কি করে? তবে কি ঐ লিপিমালা উনিশ কিংবা বিশ শতকে উদ্ভাবন করা হয়েছিল? তাইত আসছে।

গোলমাল আরও আছে। রোমক লিপির A B C D H I U N X Y 8 অক্ষরগুলোও অবিকৃতভাবে আত্মীকৃত হয়েছে ঐ মোহেন্-জো-দড়োর লিপিতে। আছে ছোট হাতের p। আছে নানান কায়দার E। এটা কি করে সম্ভব হল? পাঁচ হাজার বছর আগে

রোমক লিপির যে জন্মই হয়নি। আর একটা কথা। যে লিপির উদ্ভাবকেরা সুন্দর সুন্দর নক্সা আঁকার কসরৎ করলেন তাঁরা ঐ সহজ সরল অক্ষর গুলোই বা আঁকতে গেলেন। তথাকথিত ব্রাহ্মী লিপির সরল অক্ষরগুলো চুরি করতে গিয়ে ওগুলো জটিলতর করারইবা আয়োজন হল কেন? অর্বাচীন যুগের লিপিজ্ঞানহীন মানুষ সংখ্যা বোঝাতে যেসব চিহ্ন দিয়ে 'ম্যানেজ' করেন সেইসব চিহ্নের খবর সুপ্রাচীন যুগের সুসভ্য নাগরিকেরা পেলেন কি করে? নাৎসী বাহিনীর অস্বস্তিকর স্বস্তিকা চিহ্নটাও দেখছি মোহেন্-জো-দড়োর লিপিতে—ভারতের নিজস্ব বলে প্রচারিত স্বস্তিকা চিহ্নটা ঐ লিপিতে নেই কেন?

তাসের দেশের হরতন, রুইতন, ইস্কাবন এ-সব চিহ্নও আছে ঐ মোহেন্-জো-দড়োর লিপিতে। আছে অবিকৃতভাবেই। আর আছে ঐসব চিহ্নকে মূল কাঠামো বানিয়ে বেশ কিছু জটিলতর চিহ্ন তৈরীর আয়োজন। মাটীচাপা প্রাগৈতিহাসিক মহীরাবণের সুসভ্য দেশ থেকে চিহ্নগুলো ইউরোপেই বা পাড়ি দিল কি করে? হল্যাণ্ড বা স্পেনের 'সর্বকর্মধ্বংস তাসঅবতংশ'রা যে মহান ভারতের মূল্যবান তিনটি সুপ্রাচীন অক্ষর চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলেন এই উপাদেয় তথ্যটিকে কেউ সন্দেহ করেননি এইটাই আশ্চর্যের।

মোহেন-জো-দড়োর 'লিপি'তে বেশ কিছু চিহ্ন আছে যার থেকে বোঝা যায় সুসভ্য মানুষগুলো জ্যামিতি বিদ্যাতেও ওস্তাদ ছিলেন। পরস্পরছেদী বৃত্তও ব্যবহার করা হয়েছিল সীলমোহরে। ছিল নানান জ্যামিতিক নক্সা।

'বুস্ট্রফেডন'-এর আজগুবি গল্প শুধু মোহেন-জো-দড়োর লিপি সম্পর্কেই বানানো হয়নি। বানানো হয়েছিল প্রাচীন গ্রীকলিপি সম্পর্কেও। প্রাচীন গ্রীকলিপি নাকি ঐ লিপির প্রবর্তনের পরে ডানদিক থেকে বাঁ দিকে লেখা হত। আবার বাঁ দিক থেকে ডানদিকে লেখার ব্যবস্থাও নাকি চালু ছিল সেই যুগে। ঐ আজগুবি অবস্থাটা কিছুকাল চলার পরে আর এক আজগুবি ঐ 'বুস্ট্রফেডন' লিখনভঙ্গি নাকি চালু

হয়েছিল ঐ গ্রীসে। এবং মোটামুটি ভাবে খ্রীস্টপূর্ব ৫০০ অব্দ থেকে শুধুই বাঁ দিক থেকে ডানদিকে লেখার ব্যবস্থা নাকি শুরু হয়েছিল। বুঝতে কষ্ট হয়না ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা লিপিসম্পর্কে নানারকম বিভ্রান্তিকর তত্ত্ব দেওয়ার চেষ্টা শুধু ভারতেই করেননি। করেছিলেন খোদ ইউরোপেও।

যাদুঘরে সিন্ধুসভ্যতার 'প্রত্ন উপকরণে'র যাদু

সিন্ধু সভ্যতার প্রত্ন-উপকরণের বেশ কিছু নমুনা কলকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে বেশ যত্ন করেই রাখা হয়েছে। রাখা হয়েছে বেশ সুদৃশ্য শোকেসে। সে-সব নমুনা দেখে বুঝে নিতে কষ্ট হয়না কি পরিমাণ কারসাজি ঐ 'প্রত্ন-উপকরণ'গুলোর পিছনে করা হয়েছিল। পোড়ামাটির তৈরী বেশ কিছু উদ্ভট রূপকল্পনার জীবজন্তুর নিদর্শন ঐ মিউজিয়ামে আছে যার মধ্যে প্রাচীনত্বের ছিটেফোঁটা লক্ষণও নেই। মৃৎপাত্রের টুকরো-টাকরা নিদর্শন যা রয়েছে তা যে পাঁচ-হাজার বছরের পুরানো নয় তা ঐসব নিদর্শন এক ঝলক দেখেই বুঝে নেওয়া যায়। জৈব-অজৈব রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় দীর্ঘদিন মাটি-চাপা মাটির কিংবা চীনামাটির তৈরী জিনিষের ন্যূনতম যে বিকৃতি আসার কথা তার কিছুমাত্র লক্ষণ ওগুলোতে নেই। 'নির্বিকার' গাম্ভীর্য নিয়ে ওগুলো প্রাচীন সেজে মূকাভিনয় করে আসছে দীর্ঘদিন। পাঁচ' হাজার বছর পেরিয়ে আসা নিটোল অক্ষয় অস্তিত্বের অভিনয়টা কেউ বোঝেননি এইটাই আশ্চর্যের। বুঝতে কষ্ট হয়না আধুনিক কোনও সিরামিক কর্মশালা থেকে তৈরী হয়ে ওগুলো সোজা চলে এসেছে মিউজিয়ামে। প্রাচীনত্বের পরাকাষ্ঠার সার্টিফিকেট ঝোলানো ঐসব জিনিষ পুরাতাত্ত্বিক বিস্ময় নয়—পুরাতত্ত্বের নামে বানানো আধুনিক রসিকতা। প্রাচীন সাজা আধুনিক ব্যঙ্গ। পণ্ডিতেরা বোঝেননি এইটাই মর্মান্তিক। মার্শাল, রাখালদাস, হুইলার, ম্যাকেদের মিথ্যা সৃষ্টির কর্মকাণ্ডের স্মারক ঐসব 'প্রত্ন নিদর্শন'। ওঁদের সুসংহত তৎপরতা এবং নানান জাতের নানান পণ্ডিতের গবেষণার ঠেলায় মিথ্যাটা

বেঁচে আছে। বেঁচে আছে প্রামাণ্যতার ছদ্মবেশ চাপিয়ে। ইউনির্কর্ন (একশৃঙ্গী) নামক উদ্ভট কল্পিত জন্তুর রিলিফ এবং তার ছাঁচও প্রদর্শিত হয়েছে ঐ শোকেসে। চীনা মাটির তৈরী সেই রিলিফ এবং ছাঁচটা এত উন্নতমানের যে বুঝতে কষ্ট হয়না ওসবই সিরামিক শিল্পের আধুনিক কারিগরদের বানিয়ে নেওয়া মাল। মৃৎপাত্র পরিচয় দেওয়া ভগ্নাংশগুলো এতই নিখুঁত—গুণগতমান তার এতই উঁচু যে বুঝতে কষ্ট হয়না ওগুলো সিরামিক শিল্পে প্রাগ্রসর আধুনিক ইউরোপের কোনও দেশের তৈরী অর্ডারী মাল। সার্ভের টিনের বাক্সয় চেপে ওগুলো প্রাগৈতিহাসিক বুড়ি আদৌ ছুঁয়েছিল কিনা সন্দেহ আছে। ওগুলো কিয়ৎকালও যে মাটিচাপা ছিল এটা মনে করে নিতেও কষ্ট হয়। কষ্ট হয় ওগুলোর অম্লান ঔজ্জ্বল্য দেখে। জাল-জালিয়াতি-জোচ্চুরির যে সীমা রাখা উচিত—বাড়াবাড়ি করতে গেলে যে ধরা পড়তে হয়—এইটাই কর্তৃপক্ষ বুঝেও বোঝেননি। তথাকথিত পণ্ডিতদের ঠকানো যতটা সহজ সবাইকে ঠকানো ঠিক ততটা সহজ নয়।

প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসাবশেষগুলো কি মাটিচাপা যাদুঘর ?

প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসাবশেষগুলোতে স্থানীয় কল্পিত উদ্ভিদ-জগৎ বা প্রাণীজগতের বক্তব্য-সমৃদ্ধ প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা কেন করা হয়? এইসব দানাশস্য চাষ করার জ্ঞান তখনকার মানুষ আয়ত্ত করেছিলেন—ঐসব জীবজন্তুকে পোষ মানানোর (domesticate) কাজটা তখনকার মানুষ শিখে নিয়েছিলেন—এত সব বক্তব্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কেন করা হয়? মিনিভাস্কর্যের ক্যারিকেচারমার্কা মৃন্ময়বক্তব্যসমৃদ্ধ পুতুল কিংবা দানাশস্যের চিত্রকল্প রাখার আয়োজন কেন নেওয়া হয়? ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষে ঐ ধরণের বক্তব্যসমৃদ্ধ নিদর্শন থাকে না কেন? প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ মাত্রেই কেন মাটিচাপা যাদুঘর? রাজ্যের তত্ত্বপ্রতিষ্ঠার দায় ঐ ধ্বংসাবশেষগুলোর ওপর চাপানো হয় কেন?

এসব প্রশ্নের কোনটারই উত্তর পণ্ডিতেরা দেননি। শ-দুয়েক বছরের পুরানো মাটিচাপা বাড়ী থেকে দু-চারটে বাস্তু সাপের সন্ধান পাওয়া যায় ঠিকই। তবে ঐ পর্যন্তই। আর কিছুই পাওয়া যায় না। না জীবন্ত, না মৃত। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা কোদাল-শাবল-খুরপি চালালেই ছুঁ মন্তরে সব হাজির হয়ে যায় কেন? ওঁরা কি যাদুমন্তর জানেন? সুমসৃণ টর্সো কিংবা হর্ষবর্ধন জীবজন্তুর মূর্তিই বা বেরিয়ে আসে কেন? জীবনযাত্রার লিস্টিমাফিক উপকরণ সবই কেন পৌঁছে যায় ঐ 'যাদুঘরে'? নিগ্রোবটু বৈশিষ্ট্য বা অষ্ট্রিক শারীরগঠনযুক্ত স্ট্যাচুর আবির্ভাবই বা ঘটে যায় কেন? পণ্ডিতদের প্রতারণা করার জন্য? নৃতাত্ত্বিক বিভ্রান্তি আনার জন্য? নানান ধাতব দ্রব্যইবা রাখা হয় কেন? ওগুলো কি কোনও বক্তব্য প্রচার করার জন্যই রাখা হয়? নানান ধাতুর সুপ্রাচীন প্রচলনের গল্পটাকে 'তথ্যপ্রমাণ' দিয়ে প্রমাণসিদ্ধ বানাবার তাগিদেই কি ঐসব ধাতব দ্রব্য রাখার আয়োজন নেওয়া হয়? কোনও প্রশ্নেরই উত্তর পাচ্ছিনা। আর একটা কথা। দুনিয়ার প্রাগৈতিহাসিকস্মৃতিবিজড়িত বলে প্রচারিত প্রত্যেকটি জায়গায় বিভ্রান্তি সৃষ্টির উপযোগী কিংবা বক্তব্যসমৃদ্ধ নানান প্রত্ন-উপকরণ রাখার ব্যাপারে এত ঐক্যইবা দেখছি কেন? ইজিপ্টে, মেসোপটেমিয়ায়, হরপ্পা, মোহেন্-জো-দড়োতে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের নামে বিশেষ কয়েকজন ইউরোপীয় পণ্ডিতকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় কেন? কোনও প্রশ্নেরই উত্তর পাচ্ছি না। প্রত্যেক প্রাগৈতিহাসিক ঢিবিঢাবার ধারে কাছে কবরখানার সন্ধানই-বা পাওয়া যায় কেন? সিমেটারি এ বি সি ডি মার্কা কবরখানাগুলো কি প্রত্নউপকরণে সাজানোর জন্যই বানিয়ে রাখা হয়? প্রাগৈতিহাসিক জায়গাগুলো সম্পর্কে এ-সব প্রশ্ন আসছেই। ঐতিহাসিক যুগের ঢিবিঢাবা সম্পর্কেও কিছু কম প্রশ্ন আসছে না। দেখে শুনে মনে হয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বুঝি সত্যিই ম্যাজিক জানেন। না হলে ঐতিহাসিক যুগের ঢিবিঢাবা খুঁড়তে গেলেই রাজ্যের শিলালিপি, অফুরন্ত প্রত্নমুদ্রা, দু-চারটে বিষ্ণুমূর্তি কিংবা শিবলিঙ্গ কেন বেরিয়ে

আসে? কোথাও-বা ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ—কোথাও-বা হস্তমুদ্রায় কিঞ্চিৎ পার্থক্যযুক্ত মহাবীরের স্ট্যাচু-ইবা কেন বেড়িয়ে পড়ে? আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভের কি দুটি ডিপার্টমেণ্ট? একটীতে কি তত্ত্ব তৈরী হয়—আর অন্যটিতে কি ঐ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রমাণ? প্রাগৈতিহাসিক এবং ঐতিহাসিক জায়গাগুলোর খননকার্যে সন্দেহজনক দীর্ঘ সময় নেওয়া হয় কেন? কোথাও কুড়ি বছর—কোথাও পঁচিশ বছর। এত সময় নেওয়ার দরকারটা পড়ে কেন? তবে কি ঐসব ঢিবিঢাবা সম্পর্কে গল্প বানানো এবং সেই গল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী 'প্রত্ন-উপকরণ' বানিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার জন্যই ঐ কালক্ষেপণের খেলা খেলতে হয়? অথবা ওখানে আদৌ কিছু না রেখে বিদেশে অর্ডার দিয়ে বানানো 'প্রত্নউপকরণ' সোজা মিউজিয়ামে পাচার করার জন্যই কি ঐ কালহরণের খেলা খেলা হয়? দুনিয়ার নানান রাষ্ট্রের আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভের হেডকোয়ার্টার কি ফ্রান্সে, না ইংল্যাণ্ডে, না জার্মানীতে? এত ফরাসী, ইংরেজ বা জার্মান পণ্ডিতের নাম জড়ানোর ব্যবস্থাই বা কেন নেওয়া হয়? এসব প্রশ্নের উত্তর কে দেবেন?

ভাট সাহেবের 'থিসিস'

মাধো সরূপ ভাট ছিলেন ডিরেক্টার জেনারাল অফ আর্কিয়লজি ইন ইণ্ডিয়া। গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী শ্রীভাট মহাশয়ের বক্তব্যকে গুরুত্ব দিতেই হয়। তিনি এক জায়গায় লিখছেন:

"But that the climatic conditions during the 3rd Milleneum B. C. were more congenial than they are at present can be proved from the fact that the fauna represented in the Indus seals, such as buffalo, tiger, rhinoceros and elephant which must have been noticed by the Harappan artists, but many of which are not found today implies to some extent,

marshy conditions with jungle. Further, the use of costly burnt bricks, instead of sun dried bricks, by the Harappans probably also reflects a wetter climate. But it must be remembered that perhaps the basic climatic change was not the main reason for the decay of the Indus civilization. From our knowledge derived through the excavations, it seems that excessive deforestation (partly done by the Indus brick-makers), fall in the agricultural standard and other such socio-economic factors, as also the foreign invasion, probably of the Aryans, brought about the destruction of the Harappa civilization."

গল্পটা ভালোই বানিয়েছেন ভাটমশাই। তবে মৌলিকত্ব আনতে পারেননি এইটাই দুঃখের। সিন্ধুসভ্যতার যখন রমরমা অবস্থা তখন ঐ পাঞ্জাব-সিন্ধু অঞ্চলে নাকি বৃষ্টিপাত ভালোই হত। জলাজমিও প্রচুর ছিল। গাছগাছালিরও অভাব ছিল না। তবে ঐ সভ্যতার উপকরণ ঐ ইঁট (আর টেরাকোটা সীল ?) একটু বেশী মাত্রায় বানাতে গিয়েই নাকি মুশ্‌কিল হয়েছিল। বনজঙ্গল নাকি সবই উজাড় হয়ে গিয়েছিল। আর ঐ বনজঙ্গল উজাড় হয়ে যাওয়ার জন্য অংশত দায়ী নাকি আগুনে পোড়ানো ইঁট তৈরীর কাণ্ডকারখানা। পরবর্তীকালে ঐ অঞ্চলে উষর রুক্ষ ভূপ্রকৃতির জন্ম যে ঐজন্য হয়েছিল এ-কথা না বললেও লেখক ওখানকার ভূপ্রকৃতির বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা স্বীকার করেছেন্। বর্তমানে হাতি, গণ্ডার বা বাঘ না থাকলেও অতীতে নাকি ঐসব জন্তুর লীলাক্ষেত্র ছিল ঐ অঞ্চলটা। আর ঐসব জন্তুজানোয়ারের লীলাক্ষেত্র ছিল বলেই নাকি হরপ্পার শিল্পীরা ঐসব প্রাণীর চিত্র সযত্নে এঁকে রেখেছেন। ভাট মশাই আর একটু মৌলিকত্ব দেখালে খুসী হতাম। ঐ ধরণের গল্প আর একটি ভূখণ্ড সম্পর্কে আগেই বানানো

হয়ে গিয়েছিল। সুপ্রাচীন কল্পিত দেশ ফিনিশিয়ায় (মোটামুটি বর্তমান কালের লেবাননের একটি অংশ বলে যা প্রচার করা হয়) প্রাচীনকালে নাকি বিরাট বনাঞ্চল ছিল। তবে ফিনিশীয়দের জাহাজ তৈরীর প্রচণ্ড কর্মোদ্যোগের দরুণ সেসব বন নাকি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। এবং সেইজন্যই নাকি বর্তমানে ঐ অঞ্চলে বৃক্ষহীন শুষ্কতা বিরাজ করছে। সত্যিই ত জাহাজ কি কিছু কম তৈরী করা হত? নিজেদের ব্যবহারের জন্য—গ্রীসের জন্য—ইজিপ্টের জন্য জাহাজ বানাতে বা কাঠ সরবরাহ করতে গেলে বন ত' শেষ হবেই। হওয়ারই যে কথা! ভূমধ্যসাগরের নৌবাণিজ্যের মনোপলি যে ঐ ফিনিশীয়দের হাতেই ছিল। ফিনিশীয়দের অস্তিত্ব থাক বা না থাক তাঁদের কৃতিত্বকে যে ছোট করে দেখার প্রশ্নই ওঠেনা। স্বনামধন্য অস্তিত্বহীন ফিনিশীয়রা গ্রীকদের শুধু অ্যালফাবেট-ই উপহার দেননি। দিয়েছিলেন ক্রীতীয়দের কাছ থেকে পাওয়া জাহাজ তৈরী করার বিদ্যাটাও। সে যাই হোক, উষর মোহেন্-জো-দড়ো বা ফিনিশিয়ার দুটো গল্পই সমান আজগুবি। মাথামুণ্ডু নেই ঐ-জাতের গল্প পুরাণে মানায় – ইতিহাসে একদম বেমানান।

আধুনিক শিল্পীদের তৈরী করে নেওয়া পুতুল বা গাছগাছালির ছবির ওপর প্রাচীনত্বের প্রলেপ চাপাতে গেলে যে ঐ রকম 'থিসিস'ই লিখতে হয়। না লিখে উপায় কি? আর একটা কথা। লঙ্কায় যে যায় সেই হয় রাবণ। আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভের সঙ্গে জড়িত ভদ্রলোকেরা রাজ্যের বিভ্রান্তি সৃষ্টির দায়িত্বই-বা নেন কেন? এ-প্রশ্নেরও উত্তর পাচ্ছিনা।

স্বস্তিকা চিহ্ন—পুসালকারের বক্তব্য

মোহেন্-জো-দড়োর প্রত্নউপকরণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এ. ডি. পুসালকার স্বস্তিকা চিহ্নের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন:

"The Svastika design which is found in Crete, Cappadocia, Troy, Susa, Musyan etc but not in

Babylonia or Egypt, appears on particular types of seal (of Mohen-jo-daro) and indicates their religious use or significance. Though cylinder seals were universally used in Sumer, only three specimens have so far been found in the Indus Valley, having purely Indian devices." (এখানে একটি ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে। মেসোপটেমিয়ায় 'স্বস্তিকা' চিহ্নযুক্ত প্রত্নমুদ্রা পাওয়া গেছে।)

স্বস্তিকা চিহ্নের 'রহস্য' সম্পর্কে পুসালকার মহাশয় অনেক তথ্যই সরবরাহ করেছেন। করেছেন বিভ্রান্তিটা বাড়াতে। ক্রীত, কাপাদোকিয়া, ট্রয়, সুসা ইত্যাদি স্থানের প্রত্নলেখগুলোতে স্বস্তিকা চিহ্নের সন্ধান যে পাওয়া গেছে এ-তথ্য বেশ যত্ন করেই তিনি দিয়েছেন এবং ব্যাবিলন ও ইজিপ্টে যে লক্ষণীয়ভাবে ঐ চিহ্নের ব্যবহার হয়নি এটাও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। প্রশ্ন হল ঐ তথ্য থেকে সিদ্ধান্তটা কি আসছে। সিদ্ধান্ত একটিই। 'প্রাচীন ইতিহাস' তৈরীর নেপথ্য শিল্পীরা বেশ পরিকল্পিত-ভাবেই দেশে দেশে প্রত্নউপকরণ বানিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার খেলাটা খেলেছিলেন। খেলেছিলেন পণ্ডিতদের বোকা বানাবার তাগিদেই। চিহ্নটা ব্যাবিলনেও পাওয়া যায়নি—যায়নি ইজিপ্টেও। অথচ সুদূর ইউরোপে পাওয়া গেছে। যেসব জায়গায় পাওয়া গেছে সে-সবই তথাকথিত আর্যভাষাভাষী অঞ্চলে। তবে কি তথাকথিত আর্যসন্তানদের মাথা থেকেই ঐ চিহ্নটা উদ্ভূত হয়েছিল? পণ্ডিতেরা তর্ক করুন—তর্কের ঝড় তুলুন। গবেষকেরা গবেষণার ছয়লাপ করুন। খেলাটা জমবে ভালো। বিভ্রান্তিটা পাকা হবে। নেপথ্যশিল্পীরা মজা দেখবেন। ব্যবস্থাটা এইরকমই হয়েছিল। মজার কথা আরও কিছু বলেছেন পুসালকার মহাশয়। সুমেরীয় সভ্যতার প্রত্ননিদর্শন কম নয়। প্রত্নলেখ-সমৃদ্ধ প্রচুর সিলিণ্ডার সীল পাওয়া গিয়েছিল ঐ সুমের অঞ্চলে। অথচ সিন্ধুসভ্যতার উপকরণ হিসাবে ঐ ধরণের সীল পাওয়া গেছে মাত্র তিনটি। এই অদ্ভুত ঘটনার কথা

পুসালকার মশাই জানিয়েছেন। আশ্চর্য হওয়ার কোন কারণই ত' দেখছিনা। প্রথম ক্ষেত্রে লক্ষাধিক সিলিণ্ডার প্রত্নলেখ লেখানোর পেছনে লক্ষ্য ছিল মিথ্যাটাকে বিশাল বানিয়ে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঐ ধরণের মাত্র তিনটে সিলিণ্ডার বানিয়ে রাখার উদ্দেশ্য ছিল কল্পিত সুমেরীয় সভ্যতার সঙ্গে কল্পিত সিন্ধুসভ্যতার সম্পর্কের গল্প বানানোর সুযোগ করে দেওয়া। বলে রাখা ভালো ঐ সম্পর্ক সম্বন্ধেও কম গল্প পণ্ডিতেরা লেখেননি। গবেষকেরাও কিছু কম গবেষণা করেননি। পণ্ডিতদের ঠকানোর কাজটা ছুনিয়ার সবচেয়ে সহজ কাজ। 'সুসভ্য' ভূখণ্ডে প্রত্নউপকরণ সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার যে বিরাট পরিকল্পনা সুগোপন নিষ্ঠায় ঐ মিথ্যার কারবারীরা নিয়েছিলেন সেই পরিকল্পনার মধ্যেই পণ্ডিত ঠকানোর ব্যবস্থা ছিল। এই উপকরণটা মোহেন্-জো-দড়োতে আছে। আছে ইজিপ্টেও। অতএব তত্ত্ব তৈরী করুন। ঐ উপকরণটা ক্রীতে পাওয়া গেছে আবার ইরাণেও পাওয়া যাচ্ছে অতএব আর এক প্রস্থ তত্ত্ব তৈরী করতে কোনও অসুবিধা নেই। তত্ত্বের এবং তথ্যের পাহাড় তৈরী করে বসলেন ছুনিয়ার পণ্ডিতেরা। ভিত নেই সৌধ গড়ার অক্লান্ত প্রয়াস! এবং এরই নাম নাকি পাণ্ডিত্য!

•

তথাকথিত 'স্বস্তিকা' চিহ্নটা ভারতে প্রচলিত ছিল এটা মনে করলে ভুল হবে। ঐ প্রতীকচিন্তার জন্ম হয়েছিল ইউরোপে। পরে ভারতে প্রচলনের ব্যবস্থা হয়েছিল ঐ প্রতীকেরই কায়দা করা প্রতিরূপের। সংস্কৃত স্বস্তিকা নাম চাপানোর মধ্য দিয়ে পণ্ডিতদের ঠকানোর কাজটা ভালোই হয়েছিল। বলা বাহুল্য ঐ স্বস্তিকা চিহ্নের সঙ্গে স্বস্তি বা অস্বস্তি কোনও কিছুরই সম্বন্ধ নেই। আর ঐ 'স্বস্তি'-শব্দটাও বাংলা সোয়াস্তি শব্দের সংস্কৃত ছদ্মবেশ—ওটা প্রাচীন শব্দ নয়।

স্বস্তিকা চিহ্ন-সম্পর্কে অনেক গল্পই চালু আছে। চিহ্নটা নাকি প্রাচীন কালে ছুনিয়া জুড়েই ব্যবহার করা হত। ব্যবহার করা হত ভারতে, ইউরোপে, পলিনেশিয়ায় এমনকি আমেরিকাতেও। উত্তর আমেরিকার

নাভাজো নামের রেড-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও ঐ চিহ্নের প্রচলন প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। চলে আসছে' মধ্য আমেরিকার 'মায়া' সভ্যতার উপকরণে ব্যবহার করা প্রতীক হিসাবেও। ইউরোপে নাকি তথাকথিত ব্রোঞ্জযুগ থেকে আর এসিয়ায় খ্রীস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দ থেকে ঐ প্রতীকের প্রচলন শুরু হয়েছে। গল্পটা বিস্তৃত করার দরকার নেই। ঐসব তথ্য থেকে আহরণ করা ভিতরের তথ্যটাই জানানো যাক্। চিহ্নটা ব্যবহার করা হত ধর্মীয় প্রতীক হিসাবে। কোথাও সূর্যের কোথাও বা আগুনের প্রতীক হিসাবে। কোথাও আবার বায়ুদেবতা ও বৃষ্টিদেবতার প্রতীক হিসাবে। দুনিয়ার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে চিহ্নটা প্রাচীনকালে পৌঁছল কি করে এ প্রশ্ন কেউই তোলেননি। তোলার দরকার বোধ করেননি। সন্দেহ করার কি কিছুই নেই? তবে কি ধর্মের সার্বদেশিকত্ব এবং প্রাচীনত্বের বিশ্বাস-যোগ্যতা বাড়ানোর জন্যই চিহ্নটা দেশে দেশে প্রবর্তন করেছিলেন ঐ মিথ্যার কারবারীরা? তবে কি আধুনিক কালেই ঐ বিশেষ প্রতীকটা ওঁরা দেশে দেশে চালু করেছিলেন? তাইত আসছে। গ্রীকো-রোমক লিপির H এবং U-কে যাঁরা প্রাচীনকালের ইস্টার আইল্যাণ্ডের লিপিমালায় ঠাঁই দিতে পেরেছিলেন তাঁদের পক্ষে অসম্ভব বলে যে কিছুই নেই। মোহেন্-জো-দড়ো লিপিতে যদি ওঁরা স্বস্তিকা-চিহ্নের ব্যবহার করে বসেন তাতে অবাক হওয়ার কি আছে? ওঁদের লীলা-খেলাটা কেউ বোঝেননি বলেই ত' প্রাচীন ইতিহাসটা বেঁচে আছে?

সিন্ধুলিপির 'বিশ্লেষণ'—'হিন্দু ঐতিহাসিক'
রমেশ মজুমদারের ভূমিকা

মোহেন্-জো-দড়ো লিপি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর Sources of Indian History (The History of culture and civilization of the Indian People. The Vedic Age—খণ্ডে প্রাপ্তব্য প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখলেন :

"There are resemblances between some characters in the Indus script and those in the Sumerian. Proto-Elamite, Hittite, Egyptian, Cretan, Cypriote and Chinese scripts. Similarities have also been traced with the script of the Easter Islands, and the Tantric pictographic alphabets. All these scripts are possibly interrelated, but only upto a certain point. Some scholars even claim the Brahmi to have been derived from the Indus script.

বুঝতে কষ্ট হয়না তথাকথিত ব্রাহ্মী বা খরোষ্ঠী লিপি উদ্ভাবন করতে গিয়ে মিথ্যার কারবারীরা যে কায়দাটা নিয়েছিলেন আধুনিকতর উদ্ভাবন ঐ মোহেন্-জো-দড়োর লিপিতে সেই কায়দাটা তাঁরা নেননি। গ্রীকো-রোমক লিপি এবং ভারতে চালু কিছু লিপির সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে ঐ ব্রাহ্মী খরোষ্ঠী লিপিমালা বানিয়ে নেওয়া হয়েছিল। লিপিসমন্বয়ের খেলাটা ঐ মোহেন্-জো-দড়োর 'লিপিমালা'য় বেসামাল ভাবেই খেলা হয়েছিল। দু-চারটে লিপির মধ্যে চুরিটা সীমাবদ্ধ না রেখে চুরি নামক অপকর্মের এলাহি কাণ্ডকারখানা করা হয়েছিল ঐ 'লিপিমালায়।' সে 'লিপিমালা'য় সুমেরীয়, আদি-এলামীয়, হিত্তীয়, ইজিপ্টীয়, ক্রীতীয়, সাইপ্রীয় এবং চীনা লিপির সঙ্গে মিলযুক্ত অক্ষরের অস্তিত্ব পণ্ডিতেরা খুঁজে বার করেছেন। বার করেছেন ইস্টার আইল্যাণ্ডে প্রচলিত লিপির অনুরূপ লিপি। তান্ত্রিক প্রতীকেরও সন্ধান ঐ 'লিপি'তে তাঁরা করে নিয়েছেন। দেখে শুনে মনে হয় লিপির ব্যাপারে পল্লবগ্রাহিতা যেন মোহেন্-জো-দড়োর সুসভ্য নাগরিকদের একটা খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এবং সেই খেলার দাপটে দুনিয়ার লিপি আর দুনিয়ার প্রতীক চুরির কর্মযজ্ঞে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। পণ্ডিতেরা এসব কিছুই বোঝেননি। বোঝার চেষ্টা করেননি। আসলে ঐ 'লিপি'র পুরোটাই যে জালিয়াতি পুরোটাই যে উনিশ কিংবা বিশ শতকে তৈরী করে নেওয়া—এই সোজা

কথাটা নিয়ে কেউই মাথা ঘামাননি। এবং ঘামাননি বলেই দুনিয়ার প্রাচীন ইতিহাসের তাবৎ পণ্ডিতদের কাছে 'লিপিটা' দ্বিমাত্রিক রহস্য সেজে বসে আছে।

ইস্টার আইল্যাণ্ডে একদা প্রচলিত বলে প্রচারিত লিপিমালার বেশ কয়েকটা অক্ষরের সঙ্গে যে মোহেন্-জো-দড়োর তথাকথিত লিপিমালার সমসংখ্যক অক্ষরের মিল আছে এই মূল্যবান তথ্যটি কে দিয়েছিলেন? দিয়েছিলেন হাঙ্গেরীয় পণ্ডিত হেভেসি ভিলমোস। ইস্টার আইল্যাণ্ডের ঐ 'লিপিমালা'টা যে একটা আধুনিক জালিয়াতি—ঐ 'লিপি' যে কস্মিনকালেও ঐ দ্বীপে চালু ছিলনা—এ-তথ্য ফাঁস করে দিয়েছেন সুইস-ফরাসী পণ্ডিত আলফ্রেদ ম্যাত্রো। যেসব দাঁড়ের (oar) ওপর খোদাই করা অবস্থায় ঐ লিপিগুলো পাওয়া গেছে তা সবই এমন সব কাঠের যা ইউরোপেই পাওয়া যায়। অন্যত্র পাওয়া যায়না। তাছাড়া "The climate of Easter Island is essentially wet and tablets of wood could not have been kept for centuries in rain-drenched huts, much less in caves. How then could those tablets have been saved for thousands of years of migration and war and come to us in the form of a modern European oar?" (India And The Pacific World—by Kalidas Nag)

প্রশ্ন আসছেই। কাঠের ওপর খোদাই করা ঐ 'দারুণ' মিথ্যাটাকে রমেশ মজুমদারইবা গুরুত্ব নিয়ে বসলেন কেন? লিপিটা যে জাল এ-তথ্য মজুমদার মশাই-এর না জানার কথা নয় তবু ঐ তথ্যটিকে তিনি প্রকাশ করলেন না কেন? তবে কি 'সত্যনিষ্ঠ' ঐতিহাসিক ইচ্ছাকৃতভাবেই তথ্যটি চেপে গিয়েছিলেন? প্রশ্ন আরও আসছে। দুনিয়ার সব প্রাচীন লিপিই যখন জাল তখন একমাত্র ঐ ইস্টার আইল্যাণ্ডের লিপিটাকে জাল প্রতিপন্ন করার জন্য এত কাঠখড় পোড়ানো হল কেন? মিথ্যার কারবারীদের সততা বোঝানোর একটা

কায়দা হিসাবেই কি ঐ তৎপরতা ? তাইত মনে হচ্ছে।

আসলে মোহেন্‌-জো-দড়োর লিপির সঙ্গে মিলজুল ওলা যতগুলো লিপির প্রসঙ্গ মজুমদার মশাই ঐ বক্তব্যে রেখেছেন তার মধ্যে চীনা লিপি ছাড়া বাকি প্রত্যেকটি লিপিই জাল। ওসব লিপির কোনটার প্রচলনই প্রাচীনকালে ছিল না। চীনা লিপিটাও যে প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল এমন প্রমাণও পাচ্ছি না। দুনিয়ার প্রাচীন ইতিহাস তৈরীর ইউরোপীয় কারিগরেরা দেশে দেশে নানান সুপ্রাচীন লিপির সবই বানিয়ে নিয়েছিলেন আর ঐসব লিপির মধ্যে অংশতঃ মিল রাখার আয়োজন তাঁরা করেছিলেন বেশ পরিকল্পনামাফিকই। করেছিলেন বিভ্রান্তি আনার ব্যবস্থা হিসাবেই। ব্যবস্থাটা দুনিয়ার পণ্ডিতেরা বোঝেননি। এবং বোঝেননি বলেই ঐ প্রচণ্ড মিথ্যার ওপর নির্ভর করে উদ্ভট উদ্ভট সব তত্ত্ব তাঁরা তৈরী করে নিয়েছেন। ভাবতে অবাক লাগে বিশ্ববিদ্যালয় নামক জ্ঞানপীঠে ঐসব তত্ত্বেরই চর্চা চলেছে। ছাত্রেরাও ঐসব তত্ত্বই পড়ছেন। পড়তে বাধ্য হচ্ছেন।

প্রাচীন লিপিমালাগুলোর মধ্যে লক্ষণীয় মিল রয়েছে কেন ?

নানান দেশের প্রাচীন লিপিমালাগুলোর মধ্যে বেশ কিছু অক্ষরের মিল 'আবিষ্কার' করে যাঁরা পণ্ডিত হয়েছেন তাঁরা কি সত্যি সত্যি প্রশংসার দাবী করতে পারেন ? ঐ মিলটা বার করে নিতে কি খুব একটা পাণ্ডিত্যের দরকার পড়ে ? মোটেই নয়। প্রাচীন বলে প্রচারিত নানান লিপির অক্ষরসাদৃশ্যটা এত বেশী প্রকট যে এক ঝলক দেখেই তা ধরে ফেলতে কোনও অসুবিধাই হয়না। রোমক লিপির H-এর সঙ্গে মিলযুক্ত অক্ষর ব্রাহ্মী, মোহেন্‌-জো-দড়ো, ইস্টার আইল্যাণ্ড, আদি-এলামীয়, ইজিপ্টীয়, ক্রীতীয় সব লিপিতেই আছে। আছে ক্রস চিহ্নটাও ঐ সব লিপিতে। অধিকন্তু সুমেরীয় লিপিতেও ঐ চিহ্নের ব্যবহার পাচ্ছি। D-এর প্রতিচ্ছবি ব্রাহ্মীতে আছে। আছে মোহেন্‌-জো-দড়োর লিপিমালায়। আছে আদি-এলামীয় লিপিতেও। পঞ্চাঙ্গুলি

(পঞ্চশূল) চিহ্নটা মোহেন্-জো-দড়ো, ইস্টার আইল্যাণ্ড, আদি-এলামীয়, ইজিপ্টীয় এবং সুমেরীয় প্রত্যেকটি লিপিতেই পাওয়া যাচ্ছে। এ রকম লক্ষণীয় মিল লিপিমালাগুলোর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই রয়েছে যার বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন বোধ করছিনা। প্রশ্ন হচ্ছে এই যে ঐ মিল থাকার ব্যাপারটাকে কেউ সন্দেহের চোখে দেখেননি কেন? ঐ সাদৃশ্য-থাকা কাণ্ডকারখানার পশ্চাতে আধুনিক কোনও নেপথ্যশিল্পীর অবদান ছিল কিনা এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা সবাই সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছেন। ঐ মিল থাকার ব্যাপারটাকে নানান সুসভ্য দেশের সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের গল্পের প্রমাণ হিসাবে খাড়া করার চেষ্টা কেউ কেউ করেছেন। উগ্র জাতীয়তাবাদী চরিত্রের পণ্ডিতেরা ঐ মিলটাকে কাক-তালীয় মনে করে আনন্দ পেয়েছেন। ঘটনা হচ্ছে এই। আসলে ফ্র্যাজিস্টক্স-এর জিমন্যাস্টিক্স নানান পণ্ডিতে নানান কায়দায় খেলে-ছিলেন। খেলেছিলেন বিভ্রান্তিটাকে পোক্ত করার জন্যই।

ইজিপ্টতাত্ত্বিক বলে বসলেন 'সবার উপরে ইজিপ্টই সত্য তাহার উপরে নাই।' সভ্যতাসংস্কৃতির উপাদানের দিক দিয়ে সব দেশই নাকি ইজিপ্টের কাছে ঋণী। অন্ততঃ লিপির ব্যাপারে ত বটেই। মেসোপটে-মিয়াকে যাঁরা পৃথিবীর সভ্যতাসংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র বলে প্রচারের অভিযানে মেতে উঠলেন তাঁরা বললেন, না, তা কি করে হয়? ওসবই নাকি মেসোপটেমিয়া থেকেই বিদেশে পাড়ি দিয়েছিল। এমনকি লিপি-টাও। ইণ্ডোলজিস্টরা হরপ্পা মোহেন্-জো-দড়োর প্রত্নউপকরণের ফিরিস্তি দিয়ে বোঝাতে চাইলেন আদি গুরু নাকি এই ভারতই। এঁদের কারুর প্রচার অভিযানকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রশ্নই ওঠেনা। কারণ এঁরা কেউই যথার্থ পণ্ডিত নন—সকলেই ভাড়াটে পণ্ডিত। 'যথা নিয়োজিতোঽস্মি তথা করোমি'-বাদী এই সব পণ্ডিত ঠিক ততটুকুই এগিয়েছিলেন যতটুকু এগুনোর সুযোগ তাঁদের দেওয়া হয়েছিল। সুযোগ তাঁরা পেয়েছিলেন কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করার। তার বেশী নয়। আসলে তথাকথিত প্রাচীন লিপিগুলোর সবই যে আধুনিক জালিয়াতি—

সবই যে ইউরোপের নেপথ্যশিল্পীদের তৈরী করে নেওয়া 'লিপি'—এবং লিপিতে লিপিতে মিল থাকার ব্যবস্থাটা যে ওঁরা সুপরিকল্পিতভাবেই নিয়েছিলেন—এই সোজা কথাটাই সবাই চেপে গিয়েছেন। চেপে যাওয়ার কারণ ছিল বলেই। কারণ তুনিয়ার প্রত্নলিপির ঐ সব বিচিত্র উদ্ভট বাহনগুলোর অনস্তিত্বের তথ্যটা প্রকাশ হয়ে পড়লে যে তুনিয়ার প্রাচীন ইতিহাস নামক রম্য রচনার ঐতিহাসিকত্বের ভিতটাই নড়বড়ে হয়ে যায়। তাই ঐ 'চেপে যাওয়া'। শুধু তাই নয়। প্রাচীন ইতিহাসের ওপর গবেষণার ছয়লাপ করা—তুনিয়া জুড়ে সেমিনার 'অ্যাটেণ্ড' করার রাজসূয় কর্মকাণ্ড করারও যে সুযোগ বন্ধ যয়ে যায়। তাই ঐ 'চেপে যাওয়া' আর ঐ 'মহান ক্রিয়া'র কল্যাণেই প্রাচীন ইতিহাস নামক মিথ্যাটা বেঁচে আছে। বেঁচে আছে পরম প্রামাণ্যতার ছদ্মবেশ চাপিয়ে। লিখিত নজীর ছাড়া ইতিহাস প্রামাণ্য হয়না। লেখাজোখা নেই ত ইতিহাসও নেই। ঐতিহাসিক যুগের শুরু ঐ লেখাজোখার মধ্য দিয়ে। মজার কথা এই যে তুনিয়ার প্রাচীন ইতিহাস বানানোর শিল্পীরা ইতিহাসটাকে এমন প্রাচীন যুগে পাঠানোর আয়োজন করেছিলেন যে যুগে তুনিয়ায় কোনও লিপিরই জন্ম হয়নি। আর তা হয়নি বলেই রাজ্যের ভূতুড়ে লিপি ওঁদের বানিয়ে নিতে হয়েছিল। বানিয়ে নিতে হয়েছিল কাল্পনিক কাহিনীগুলোকে ইতিহাস বলে প্রচার করার তাগিদেই।

মোহেন্-জো-দড়োর কৃতী 'শিল্পী'

স্যার জন মার্শাল, মার্টিমার হুইলার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ম্যাকে ইত্যাদি বেশ কয়েকজন পণ্ডিত ঐ মোহেন্-জো-দাড়ো-হরপ্পার তথাকথিত প্রাচীন সভ্যতার গল্প তৈরী করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। করেছিলেন মিথ্যার আন্তর্জাতিক চক্রান্তকারীদের শরিক হিসাবেই। ঐ সভ্যতার উপকরণ নির্বাচন এবং যথাস্থানে সংস্থাপনের গোপন কর্মকাণ্ড সম্ভবত আগেই শেষ হয়েছিল। ১৮২৬ সালে হরপ্পার

টিবির খবর পাওয়ার পরে প্রায় একশ' বছর সময় পাওয়া গিয়েছিল ঐ গোপন কর্মকাণ্ডের জন্য। জন মার্শাল আগেই হাত পাকিয়েছিলেন গ্রীসের 'ইতিহাস' রচনার মহান কর্মযজ্ঞে অংশ গ্রহণ করে। সে-ভূমিকা তিনি সুষ্ঠুভাবে পালন করেছিলেন। পালন করতে পেরেছিলেন। আর পেরেছিলেন বলেই জন মার্শাল হয়েছিলেন স্যার জন মার্শাল। ব্রিটিশ সরকার গুণীদের কদর দিতে জানতেন বৈকি। গুণী মার্শাল সাহেব পরে 'ডিউটি' পেয়েছিলেন এই ভারতবর্ষে। বলা বাহুল্য এ-কাজটাও তিনি সুনামের সঙ্গেই করেছিলেন। সুনামের সঙ্গে হুইলার সাহেবও কাজ করেছিলেন। করেছিলেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও। আখের গুছিয়ে নিতে অসুবিধা এঁদের কারুরই হয় নি। ব্রিটিশ সরকারের নেপথ্য কর্মকাণ্ডে যাঁরা জড়িত থাকতেন তাঁদের কারুরই টাকাপয়সার অভাব খুব একটা থাকত না।

মোহেন্-জো-দড়ো-সভ্যতার 'আবিষ্কর্তা' রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার অধীনে বেশ উঁচু দরের চাকরী করতেন। চাকরীজীবনের শেষভাগে তাঁর চাকরী গিয়েছিল। গিয়েছিল একটি মূর্তি সরিয়ে ফেলার অপরাধে। সে-অপরাধের জন্য কোর্ট-কাছারীও হয়েছিল। এবং তিনি নির্দোষ সাব্যস্তও হয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁকে চাকরীতে পুনর্বহাল করা হয়নি। করা হয়নি ব্রিটিশ সরকারের একটি উৎকট জেদের জন্যই। গল্পটা ভালোই বানানো হয়েছিল। পুরোটাই সাজানো ব্যাপার। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চাকরী খাওয়া হয়েছিল পরিকল্পিতভাবেই। খাওয়া হয়েছিল ভদ্রলোকের বিশ্বাস-যোগ্যতা বাড়ানোর এবং ব্রিটিশ সরকারের নিরপেক্ষতা এবং সত্যনিষ্ঠার প্রমাণ রাখার জন্য। আসলে রাখালদাসবাবু যে ঐ মিথ্যা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এই সত্যটা যাতে কেউ ধরে না ফেলেন তার জন্যই ঐ ব্যবস্থা। হিঁয়া কা মূর্তি হুঁয়া করার নামই যে মোহেন্-জো-দড়ো-হরপ্পা এইটাই কেউ বোঝেন নি। ঐ মোহেন্-জো-দড়োতে শিবলিঙ্গ রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। ব্যবস্থা হয়েছিল নানান 'মাতৃকা-মূর্তি'

রাখারও। ধ্যানমগ্ন 'পশুপতি'ও রাখা হয়েছিল। রাখা হয়েছিল ধর্মীয় বিভ্রান্তি আনার জন্যই। নিগ্রোবটু ওষ্ঠ বা অস্ট্রিক শারীরগঠনযুক্ত স্ট্যাচুরও অভাব রাখা হয়নি। সে-সব রাখা হয়েছিল আর এক কায়দায় বিভ্রান্তি আনার জন্যই। নৃতাত্ত্বিক বিভ্রান্তি আনার জন্যই যে ঐসব মূর্তি রাখার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল এটা বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। ওসব মূর্তির কোনটাই ওখানে ছিল না। সবই আমদানী করা হয়েছে। আরোপ করা হয়েছে। করতে হয়। দুনিয়ার সব প্রাগৈতিহাসিক জায়গায় ঐ অপকর্ম করা হয়েছিল। করতে হয়েছিল। করেছিলেন মিথ্যার আন্তর্জাতিক কারবারীরা। মতলবটা বলা বাহুল্য ইউরোপের। স্যার জন মার্শাল, মার্টিমার হুইলার এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যে সিন্ধু-সভ্যতার উপকরণ নির্বাচন এবং ঐ সভ্যতার গল্প তৈরী করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন—এটা বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। আসলে আন্তর্জাতিক মিথ্যা সৃষ্টির চক্রান্তে তিনজনই সামিল হয়েছিলেন। সামিল হয়েছিলেন ম্যাকে-সাহেবও। অজ্ঞাতনামা যেসব নেপথ্যশিল্পী নানান 'সৃষ্টিমূলক' কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের নাম জানার যে উপায় নেই তা বলাই বাহুল্য।

সিন্ধুলিপির রহস্যোদ্ধার কে করবেন? কবে?

মোহেন্-জো-দড়ো লিপির মর্মোদ্ধার এখনও পর্যন্ত কেউ করেননি। করেননি কারণ ইতিহাস-তৈরীর নেপথ্য নায়কদের কাছ থেকে এখনও সে-নির্দেশ আসেনি। সে-নির্দেশ এসে পৌঁছলেই নতুন কোনও প্রিন্সেপ সাহেব অবলীলায় লিপির রহস্য উন্মোচন করে বসবেন। ভাগ্য প্রসন্ন হলে একটা নোবেল প্রাইজও হয়ত পেয়ে যাবেন। ঐতিহাসিকদের বাহবা কুড়াতেও দেরী হবেনা। অসুবিধাও খুব একটা হবে বলে মনে হয়না। কারণ ইতিমধ্যে সংস্কৃত ভাষার অতি-প্রাচীনত্ব সম্পর্কে এত বেশী মাত্রায় গল্প লেখা হয়ে গিয়েছে এবং তুরস্কের বোঘাসকয়ে তথাকথিত মিত্তানি নামের প্রায়-সংস্কৃত-মার্কা ভাষায় শিলালিপি বানিয়ে রেখে এবং তার

আনুমানিক বয়স জানিয়ে রেখে সে-প্রাচীনত্বের বিশ্বাসযোগ্যতা আনার কাজটা মিথ্যার আন্তর্জাতিক কারবারীরা যেমন সুষ্ঠুভাবে করে রেখেছেন তাতে ঐ রহস্যময়ী ভাষাকে সংস্কৃত বলে প্রচার করতে কোনও অসুবিধাই হবেনা। হওয়ার কথাও নয়। তার আর একটা কারণ তথাকথিত রহস্যময়ী লিপির মাধ্যমে লেখা হয়েছে ঐ সংস্কৃত ভাষাই। অন্য কোনও ভাষা নয়। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো এই প্রবন্ধ লেখার সময় সংবাদপত্রের একটি খবরে জানা গেল জনৈক রাও-মহাশয় নাকি মোহেন্‌-জো-দড়ো-লিপির মর্মোদ্ধার করে বসেছেন। আর ঐ 'রহস্যময়ী' লিপির মধ্য থেকে তিনি শুধু সংস্কৃত শব্দই খুঁজে পেয়েছেন। অন্য কোনও ভাষার শব্দ পান নি। সংশ্লিষ্ট মহল তদ্বির-তদারক শুরু করে দিয়েছেন যাতে রাও-মশাই তাঁর এই 'কৃতিত্বে'র স্বীকৃতি হিসাবে নোবেল প্রাইজটা পেয়ে যান। দুনিয়ায় অসম্ভব বলে কিছু নেই। রাও-সাহেব সত্যিই যদি ঐ প্রাইজ পেয়ে যান তবে বুঝব ঐ নোবেল কমিটি দুনিয়ার মিথ্যার কারবারীদেরই প্রতিভূ। সত্যের নয়।

সিন্ধু সভ্যতা বনাম অ্যাসিরীয় সভ্যতা

বেদোক্ত অসুর-শব্দের সঙ্গে অ্যাসিরিয়া শব্দের আপাতসাদৃশ্য দেখে অ্যাসিরীয় সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধু-সভ্যতার নিকটতর সম্পর্ক 'আবিষ্কার' করার চেষ্টা অনেক পণ্ডিতই করেছেন। মজার কথা এই যে ঐ 'অসুর' নামক শব্দটা আধুনিক কালে বানিয়ে নেওয়া ঋগ্বেদে রাখা হয়েছিল বিভ্রান্তি আনার একটা ব্যবস্থা হিসাবেই। আসলে অ্যাসিরিয়া নামক কল্পিত নামটা যাঁরা মেসোপটেমিয়ার একটি কল্পিত সেমিটিক জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের ওপর আরোপ করেছিলেন তাঁরাই সিন্ধুসভ্যতার জন্মদাতা 'সুসভ্য' জাতির ওপর অসুর বা দস্যু বা দাস নানান রকম নাম আরোপ করার খেলা খেলেছিলেন। সবই 'তাঁরা'ই খেলেছিলেন। 'তাঁরা' অর্থে দুনিয়ার প্রাচীন ইতিহাসের স্রষ্টিকর্তা ইউরোপের নেপথ্য কারিগরদেরই বুঝতে হবে।

সিন্ধুলিপির মাধ্যমে কোন ভাষা লেখা হয়েছিল ?

সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার না হলে কি হবে পণ্ডিতেরা ঐ 'লিপি'-ধৃত ভাষাসম্পর্কেও নানান মত ব্যক্ত করেছেন। ব্যক্ত করেছেন পাণ্ডিত্যের পরিমণ্ডল রচনা করেই। কেউ বলেছেন ওটা দ্রাবিড় ভাষা। কেউ মনে করেছেন ওটা সংস্কৃত। অনেক পণ্ডিত প্রাকৃত শব্দও ঐ 'লিপির' মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন। কোনও পণ্ডিত একস্বর (monosyllafic) শব্দের গন্ধও 'আবিষ্কার' করে ফেলেছেন ঐ লিপির মধ্যে। পণ্ডিতের অভাব হয়নি। একদল পণ্ডিত ঐ লিপির মধ্যে মুণ্ডা-ভাষার লক্ষণও 'আবিষ্কার' করে নিয়েছেন। সত্যিই ত' অস্ট্রিক শারীরগঠনযুক্ত মহিলার ধাতব মডেল যখন ঐ সভ্যতার উপকরণ হিসাবে রয়েছে তখন ঐ চিন্তা ত' আসতেই পারে। আসাটা বিচিত্র কি ! গবেষকেরা যাঁর যেমন খুসি তত্ত্ব তৈরী করে নিয়ে গবেষণাপত্র হাজির করেছেন। সব রকম তত্ত্বের উপযোগী উপাদানে যখন সভ্যতাটা সমৃদ্ধ তখন অসুবিধা হবেই বা কেন ? পণ্ডিতদের নামের তালিকা দিয়ে প্রবন্ধের কলেবর বাড়ানোর ইচ্ছা নেই।

সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা কি দ্রাবিড় জাতি ?

বিভ্রান্তির ওপর বিভ্রান্তি ! ঋগ্বেদে 'হরিয়ুপিয়া' ছদ্মনাম চাপানো হরপ্পার অধিবাসীদের নাম পণি রাখা হয়েছিল। রাখা হয়েছিল উদ্দেশ্যমূলকভাবেই। পণ-শব্দটা তামিল। আর শব্দটা তামিল হওয়ার সুবাদে এবং পণি শব্দের প্রয়োগ দেখে সিন্ধুসভ্যতা সৃষ্টির মূলে দ্রাবিড়দেরই যে অবদান বেশী ছিল এই মূল্যবান তথ্যটিও অনেক পণ্ডিত দিয়ে বসেছেন। আসলে ঋগ্বেদ নামক আধুনিক পুণ্যগ্রন্থে যে নানান বিভ্রান্তি আনার তাগিদেই ঐ অসুর বা পণি শব্দের ধাঁধা সৃষ্টি করা হয়েছিল—এইটাই কেউ বোঝেননি। চতুর্বেদ তথা বৈদিক সাহিত্যের পুরোটাই যে আধুনিক কালে বানিয়ে নেওয়া প্রতারণা

তা প্রমাণ করব পরের অধ্যায়ে। পণি শব্দের সঙ্গে 'ফনিক'-শব্দের ধ্বনিগত সাদৃশ্য দেখিয়ে এবং ঐ 'ফনিক'এর অর্থ ফিনিশীয় বানিয়ে নিয়ে আর একদল পণ্ডিত (সম্ভবত ভাড়াটে) আর এক উদ্ভট গল্প বানিয়েছেন। এঁদের বক্তব্য মেনে নিতে গেলে বলতে হয় ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাপদেশে ঐ ফিনিশীয়রা মোহেন-জো-দড়ো-হরপ্পাতেও নাকি হানা দিয়েছিলেন। দুনিয়ায় পাণ্ডিত্যব্যবসায়ীর সংখ্যা বড্ড বেশী !

সিন্ধুসভ্যতা এবং 'পঞ্চধাতু'র গল্প

মোহেন্-জো-দড়োর প্রত্নউপকরণের মধ্যে বেশ কিছু ধাতব দ্রব্য রাখারও ব্যবস্থা হয়েছিল। সোনা, রূপো, তামা, টিন ও সীসা এই পাঁচটা মৌলিক ধাতু আর ব্রোঞ্জ নামক মিশ্রধাতুর ব্যবহার যে ঐ মোহেন্-জো-দড়োতে হত এ-তথ্য পণ্ডিতেরা দিয়েছেন। "স্যার এডউইন পাস্কো অনুমান করেন যে সোনা দক্ষিণ ভারত (হায়দ্রাবাদ, মহীশূর অথবা মাদ্রাজ দেশ) হইতে আনা হইয়াছিল। মহীশূরের অন্তর্গত কোলার খনির ও মাদ্রাজের অন্তর্গত অনন্তপুরের সোনার সঙ্গে মোহেন্-জো-দড়োর সোনার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়।" (উৎস—কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী লিখিত "প্রাগৈতিহাসিক মোহেন-জো-দড়ো") ঐ গ্রন্থেরই আর এক জায়গায় লেখক ওখানকার তামার প্রসঙ্গে লিখেছেন : "প্রত্নবিভাগের রাসায়নিক পরীক্ষক মহাশয় অনুমান করেন, ইহা (তামা) হয়ত রাজপুতানা, বেলুচিস্থান অথবা পারস্য দেশ হইতে আনীত হইয়াছিল। মোহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত তামার গুণবিশিষ্ট তামা আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, রাজপুতানা এবং হাজারীবাগেও দেখিতে পাওয়া যায়।"

জনৈক 'স্যার' কিংবা 'প্রত্নবিভাগের রাসায়নিক পরীক্ষক' কিছু তথ্য দিলেই তা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না। আজগুবি তথ্য আজগুবিই থেকে যায়। 'সাদৃশ্যযুক্ত সোনা' বা একই 'গুণবিশিষ্ট তামার' গল্পটা কম আজগুবি নয়। খাঁটি সোনা বা তামার একটাই জাত। তাছাড়া ঐসব খনির 'উদ্বোধন' প্রাগৈতিহাসিক যুগে ঘটেছিল এ তথ্য যুক্তিগ্রাহ্য

নয়। যুক্তিগ্রাহ্য নয় ধাতুর প্রাচীন প্রচলনের পুরো গল্পটাই। এ-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা এ-বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে করা যাবে। (আদিপ্রস্তর—নব্যপ্রস্তর—লৌহ—তাম্র—ব্রোঞ্জযুগ—মার্কা নাম দিয়ে সভ্যতার কালপর্ব রচনার অভিনব উদ্যোগ যে মিথ্যার কারবারীরাই নিয়েছিলেন—এইটাই কেউ বোঝেননি। ডেনমার্কের ধনীপুত্তুরের খামখেয়ালের গল্পের মধ্য দিয়ে জন্ম লাভ করা ঐ 'আর্কিয়লজি' নামক জ্ঞানের শাখাটি প্রচণ্ড মিথ্যায় 'সমৃদ্ধ'। প্রাচীনকালে ঐসব 'ধাতুযুগ' ছিলনা।)

একই লিপিমালায় চার ধরণের লিপি থাকেনা

একই লিপিতে 'অ্যালফাবেট', 'চিত্রলিপি' 'সিলেবারি' এবং 'ভাবলিপি' লেখার ব্যবস্থাটা আজগুবি। আজগুবি কেন এ প্রশ্ন উঠবেই। সে প্রশ্নের উত্তর হিসাবে কিছু তথ্য দেওয়া যাক। এক, লিপি সম্পর্কে নানান জাতির ধারণার মধ্যে কোনকালেই সমতা ছিল না। এখনও নেই। এবং নেই বলেই নানান ধরণের লিপির জন্ম হয়েছে। জন্ম হয়েছে অন্য ধরণের লিপির প্রভাবে প্রভাবিত না হয়েই। নানান দেশে বিচ্ছিন্নভাবে অন্যনিরপেক্ষভাবেই নানান ধরণের লিপির জন্ম হয়েছে। একই ধরণের নানান লিপির মধ্যে একটার প্রভাব অন্যটিতে পড়েছে ঠিকই। ওড়িয়া লিপিতে বাংলা এবং নাগরী লিপির প্রভাব অস্বীকার করা যায়না। নানান ধরণের লিপির মধ্যে একের প্রভাব অন্যটিতে নেই। দুই, চিত্রলিপি থেকে অ্যালফাবেটে উত্তরণের তত্ত্বটা পণ্ডিতেরা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সে তত্ত্বের মধ্যে ছিল প্রচণ্ড ফাঁকি। ফাঁকিটা ধরে ফেলতেও খুব একটা অসুবিধা হয়নি। কারণ যেসব সুপ্রাচীন চিত্রলিপি থেকে ক্রমপরিবর্তনের সূত্রে অ্যালফাবেটের জন্মের গল্প বানানো হয়েছে এবং নানান তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয়েছে সেইসব প্রাচীন লিপির প্রচলনই ছিল না। তথাকথিত ইজিপ্টীয় হায়েরোগ্লিফিক বা সুমেরীয় চিত্রলিপি এবং ঐ লিপি থেকে উদ্ভূত বলে

প্রচারিত কিউনিফর্ম লিপির প্রচলন ছিলইনা। ছিল না লিনিয়ার এ-বি নামারোপিত কোনও লিপির প্রচলন। ওগুলো সবই আধুনিক জালিয়াতি। 'প্রাচীন ইতিহাস' লেখার আন্তর্জাতিক চক্রান্তকারীরা ঐসব 'লিপি' তৈরী করে নিয়েছিলেন। করে নিয়েছিলেন লিপি সম্পর্কে নানান বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার তাগিদেই। প্রাচীন ইতিহাসের সুপরিকল্পিত কাঁচা মাল বানিয়ে রাখার উদ্যোগ আয়োজনের অংশ হিসাবেই যে ঐসব লিপির 'উদ্ভাবন' হয়েছিল এটা বুঝে নিতে কষ্ট হয়না। তিন, চিত্রলিপি বা ভাবলিপি থেকে অ্যালফাবেটে উত্তরণে সময় নেওয়ার তত্ত্বটিও সমান আজগুবি। চীনাভাষায় দীর্ঘকাল ভাবলিপির (ইডিওগ্রামের) ব্যবহার চলে আসছে। আজও সে লিপির অ্যালফাবেটে পরিবর্তিত হওয়ার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। আসলে লিপির পরিবর্তন সম্পর্কে পণ্ডিতেরা যত তত্ত্ব আজ পর্যন্ত দিয়েছেন তা সবই ভ্রান্ত। যত সহজে ঐ পরিবর্তন হয় বলে তাঁরা রায় দিয়েছেন তা হয়না। কেন হয়না সে-প্রসঙ্গে আগের একটি অধ্যায়ে বক্তব্য রেখেছি।

একই সঙ্গে নানান ধরণের লিপির বিধান যে একটি ভাষায় হতে পারেনা এটা আগেই লিখেছি। প্রশ্ন উঠবে ব্যতিক্রম কি নেই? আছে। জাপানী ভাষায় কাতাকানা, হিরাগানা এবং কাঞ্জি—এই তিন রকম মৌলিক লিপির ব্যবহার আছে। প্রথম দুটো সিলেবারি আর তৃতীয়টি ভাবলিপি। একই লেখায় কাতাকানা এবং কাঞ্জি কিংবা হিরাগানা এবং কাঞ্জি লিপি ব্যবহার করার রেওয়াজ যে জাপানী ভাষায় নেই তা নয়। রেওয়াজ আছে কারণ আধুনিককালে তৈরী করে নেওয়া ঐ দু-রকম সিলেবারির একটি এবং ভাবলিপির যুগপৎ ব্যবহার করার ব্যবস্থাটাকে ওঁরা সুবিধাজনক মনে করেছেন। মনে করেছেন কারণ লেখার ব্যাপারে সহজসাধ্যতা কিংবা বোঝার ব্যাপারে সহজবোধ্যতা আনার কাজে ঐ ব্যবস্থার কার্যকারিতা তাঁরা উপলব্ধি করেছেন। আসলে সহজবোধ্যতা আনার আধুনিক প্রয়াস হিসাবেই যে দু-রকম লিপি একই সঙ্গে ব্যবহার করা হয় এটা বুঝে নিতে কষ্ট হয়না। কাঞ্জিলিপির

অধিকাংশ অক্ষরই অত্যন্ত জটিল। লিখতে সময়ও লাগে বেশী। আর ঐ কাতাকানা বা হিরাগানা ছুটোই সরল লিপি। তাই একাধারে ছু-রকম লিপির সহ-অবস্থান দেখে অবাক হওয়ার কোনও কারণই খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক বলে প্রচারিত মোহেন্-জো-দড়োর লিপিমালায় যুগপৎ চার ধরণের লিপির সহ-অবস্থানের গল্পটা এতই আজগুবি যে সেটা মেনে নেওয়ার প্রশ্নই ওঠেনা।

যে ভাষায় ভাবলিপির প্রচলন আছে সে ভাষায় শুধু ভাবলিপিরই ব্যবহার হয়—সিলেবারি বা অ্যালফাবেটের ব্যবহার হয়না। আবার যে ভাষায় সিলেবারি প্রচলিত সে ভাষায় শুধু সিলেবারিরই চল। ভাবলিপি বা অ্যালফাবেটের চল নেই। যেমন আফ্রিকার আম্‌হারিক সিলেবারি। জাপানে যদিও ভাবলিপির সঙ্গে সঙ্গেই সিলেবারির প্রচলন আছে তবু বলব সেটা ব্যতিক্রম। সেদেশে ছু-ধরণের লিপির সহাবস্থানের কারণ আগেই আলোচনা করেছি। আবার যেসব ভাষায় অ্যালফাবেটের ব্যবহার আছে সেসব ভাষায় শুধু অ্যালফাবেটই চলে। সিলেবারি বা ভাবলিপি থাকার প্রশ্ন ওঠেনা। ভারতবর্ষের লিপিগুলো না ভাবলিপি, না সিলেবারি, না অ্যালফাবেট। এদের নাম দেওয়া হয়েছে 'কারেক্‌টার'। পাঁচ রকম লক্ষণযুক্ত অক্ষর নিয়ে গড়ে উঠেছে ভারতীয় 'কারেক্‌টার'। এ-কায়দাটা ভারতের নিজস্ব। ভারতীয় লিপির তামিল বাদে সবগুলোই 'কারেক্‌টার'-ধর্মী। মোটকথা চার রকম চরিত্রের অক্ষরের সহ-অবস্থান কোনও ভাষাতেই থাকেনা। থাকতে পারেনা। থাকাটাই আজগুবি। মোহেন্-জো-দড়োর প্রচলিত লিপিতে ঐ আজগুবি ব্যবস্থা চালু থাকার প্রশ্নই ওঠেনা।

এহ বাহ্য। চার কায়দার লিপির সহ-অবস্থানের আজগুবি ব্যবস্থার কথা লেখার পরে আর এক খটকা এসে যাচ্ছে। নানান ধরণের লিপির মধ্যে তথাকথিত 'চিত্রলিপি'-গুলো সবই যে মিথ্যার কারবারীদেরই 'আবিষ্কার'। যতগুলো চিত্রলিপির সন্ধান পাচ্ছি তার সবই যে ওঁদেরই 'সৃষ্টি'। তাহলে? চীনা ভাবলিপির মধ্যে সামান্য কিছু

চিত্রলিপি-ধর্মী লিপি থাকলেও ওটা মূলতঃ ভাবলিপিই। সিলেবারি-লিপির যে দু-একটা নমুনা পাওয়া যাচ্ছে তাও ত' দেখছি সবই আধুনিক উদ্ভাবন। ওগুলো যে খুব একটা প্রাচীন এও ত' মনে করার কারণ দেখছিনা। বাকি থাকছে অ্যালফাবেট, ভাবলিপি আর কারেক্টার। আধুনিক কালে উদ্ভাবিত জাল লিপিগুলো বাদ দিলে থাকছে শুধু আজকের প্রচলিত লিপিগুলোই। স্বভাবতই কয়েকটি প্রশ্ন আসছে। তবে কি সিন্ধুলিপিটাকে ভারতীয় লিপিমালাগুলোর জনক সাজানোর ব্যবস্থা হয়েছিল? এবং সেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল বলেই কি ওটা কারেক্টার-ধর্মী? তবে কি ঐ লিপিমালায় অ্যালফাবেট, চিত্রলিপি, সিলেবারি এবং একস্বর শব্দের অস্তিত্বের নানান গল্পকথা ভাড়াটে পণ্ডিতেরা বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্যই বানিয়ে রেখেছেন? তাইত' মনে হচ্ছে।

সিন্ধুসভ্যতা এবং উগ্রজাতীয়তাবাদী বাঙ্গালী পণ্ডিতের ভূমিকা

অত্যুৎসাহী পণ্ডিতের অভাব কোনও দেশেই নেই। মোহেন্-জো-দাড়ো-হরপ্পার প্রত্ন-উপকরণের মধ্যে মাছ ধরার বঁড়শী পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে বেশ কিছু মাছেরও চিত্রকল্প। এ-ছাড়া সরিষা চাষের ব্যবস্থাও যে ওখানে ছিল—এমন ইঙ্গিতও নাকি পাওয়া গেছে। এসব দেখেশুনে বাঙ্গালী পণ্ডিত লোভ সামলাতে পারেননি। পারার কথাও নয়। এ-সুযোগ কি ছাড়া যায়? ঋগ্বেদে পণি শব্দের উল্লেখ থাকাতে দ্রাবিড়-পণ্ডিত যদি উল্লসিত হতে পারেন বাঙ্গালী-ইবা কি দোষ করেছেন? মাছের ভক্ত বাঙ্গালীরা যে সিন্ধুর অসুরদেরই বংশধর এই উপাদেয় তথ্য উপহার দিয়ে বসলেন মোহেন্-জো-দাড়ো-হরপ্পা-মুগ্ধ (মো-হ-মুগ্ধ?) বাঙ্গালী পণ্ডিত ডাঃ অতুল সুর। তিনি লিখলেন:
"সিন্ধুর অসুররা যে বাঙ্গালীদের পূর্বপুরুষ তা সহজেই অনুমেয়, ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলে (১/৫৩) বর্ণিত বঙ্গৃদ নামক অসুর বাঙ্গালী কিনা তা বিবেচ্য।"

উৎস: হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক
ভাষ্য—লেখক ডাঃ অতুল সুর।

ঋগ্বেদ-নামক পুণ্যগ্রন্থে যখন বঙ্গৃদ-নামক অসুরের নাম পাওয়া যাচ্ছে—আর মোহেন্-জো-দড়ো-হরপ্পায় যখন বাঙ্গালীর একান্ত প্রিয় খাবারের ইঙ্গিত রাখা হয়েছে—তখন মেনে নিতেই হয় তথ্যটি 'বিবেচ্য'। প্রশ্ন হল কোলাকুলি যে সেয়ানে সেয়ানেই হয়। কোলব্রুক সাহেবদের মিথ্যা-বানানোর কারখানায় 'ঋগ্বেদ' লেখানোর আয়োজন হয়েছিল। সে আয়োজন যাঁদের উদ্যোগে করা হয়েছিল তাঁদের উদ্যোগেই যে ঐ মোহেন্-জো-দড়ো-হরপ্পার 'প্রত্নউপকরণ' বানানো হয়েছিল। ঋগ্বেদে 'বঙ্গৃদ' শব্দটা পরিকল্পিতভাবেই রাখা হয়েছিল সম্ভবত অত্যুৎসাহী কিছু বাঙ্গালী পণ্ডিতকে বোকা বানানোর জন্যই। অসুর, পণি, বঙ্গৃদ অধিবাসীবাচক নানান শব্দই রাখা হয়েছিল ঐ কেতাবে—বলা বাহুল্য নানান জাতের পণ্ডিতদের 'গবেষণা' করার সুযোগ করে দেওয়ার তাগিদেই।

সিন্ধুসভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের কর্মকাণ্ডে জড়িত অতুল সুর আরও কিছু তথ্য উপহার দিয়েছেন। সিন্ধুসভ্যতায় গণিতের ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি এক জায়গায় লিখলেন :

"দৈর্ঘ মাপবার জন্য তারা যে দশমিক প্রথা ব্যবহার করত তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। সরু Shell-এর ওপরে 6·9 মিলিমিটার অন্তর দাগ দেওয়া একটা মাপকাটি থেকে।" উৎস—সিন্ধুসভ্যতার স্বরূপ ও অবদান—লেখক শ্রীঅতুল সুর।

অকাট্য যুক্তি ত একেই বলে! 6·9 মিলিমিটার অন্তর দাগ দেওয়া মাপকাটি যখন পাওয়া গেছে—আর জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি যখন তা জানিয়েছেন তখন তথ্যটি মেনে নিতেই হয়। প্রশ্ন হল মিলিমিটার-নামক দৈর্ঘ-এককটি কি প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে দুনিয়া জুড়েই চালু ছিল? এই আজগুবি কথা-প্রসঙ্গে আর কিছু লেখার দরকার বোধ করছি না। স্বভাবতই সন্দেহ আসছে তবে কি সুর-মশাই-ও মিথ্যার চক্রীদেরই একজন? না হলে ঐ ধরণের উদ্ভট তথ্যটি তিনি দিতে গেলেন কেন?

প্রাগৈতিহাসিক 'সাম্রাজ্যের' গল্প—ফরাসী পণ্ডিত রেনোর কীর্তি

ফরাসী ঐতিহাসিক রেনোর মতে সিন্ধুসভ্যতা নাকি কোনও দিক দিয়েই বেদের কাছে ঋণী ছিলনা। বেদও ঋণী ছিলনা ঐ সিন্ধুসভ্যতার কাছে। সভ্যতাদুটো গড়ে উঠেছিল অন্যনিরপেক্ষ ভাবেই। তিনি এক জায়গায় লিখলেন:

"The Aryan tribes may well have overrun it (Indus civilization) without in any way being influenced by it, settling on the ruins of a decayed or decaying empire"

বানানো গল্পের উপর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে রেনো সাহেব নিজেকেই প্রকাশ করে ফেলেছেন। তাঁর ঐ 'তত্ত্ব'-সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজন দেখছি না। তাঁর ব্যবহার-করা একটি শব্দ সম্পর্কেই বক্তব্য রাখছি। ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর উদ্যোগেই যে প্রাচীন ইতিহাস লেখানোর আয়োজন হয়েছিল এ কথা আগেই লিখেছি। মজার কথা এই যে ওঁদের তৈরী করে নেওয়া 'ইতিহাস'-এর কল্যাণে দেশে দেশে প্রাচীন কালে কম 'সাম্রাজ্যে'র প্রতিষ্ঠা ঘটেনি। ভারতে, চীনে, পারস্যে, মেসোপটেমিয়ায়, রোমে বা গ্রীসে সর্বত্রই একই খেলা ওঁরা খেলেছেন। সর্বত্রই ওঁরা 'সাম্রাজ্য' বানিয়েছেন। 'সাম্রাজ্য' ভেঙ্গেছেন—গড়েছেন। ভারতেও ঐ বস্তু কম বানানো হয়নি। কম বানানো হয়নি চীনেও। 'ইং বিং মিং মার্কা কত সব নামই না পাচ্ছি! দেখে শুনে মনে হয় আধুনিক সাম্রাজ্যবাদীরা দেশে দেশে উপনিবেশ বানিয়ে এমন কি আর অপরাধ করেছেন। ওবস্তু যে ইতিহাসের জন্মলগ্ন থেকেই আমাদের সঙ্গী। আমাদের অর্থে দুনিয়ার ইতিহাস-গর্বী সবদেশেরই। সাম্রাজ্যবাদীদের যৌথউদ্যোগে লেখা ঐ 'ইতিহাস'-এ প্রাচীন সব 'সাম্রাজ্যের' পীড়ন-উৎপীড়নের ছবি আঁকা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম-নামক অত্যন্ত মূল্যবান আইডিয়া প্রসারে কিংবা কোনও

মূল্যবান ধর্মের বিরুদ্ধতা করার কাজে ঐসব 'সাম্রাজ্যের' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও তুলে ধরা হয়েছে। ব্যবস্থাটা ভালোই। ধর্মটা যেন যুগ যুগ ধরেই বেঁচে আছে। সাম্রাজ্যবাদ-টাও যেন তাই। মজার কথা আরও আছে। শুধু ইতিহাসের জন্মলগ্নে 'সাম্রাজ্য' প্রতিষ্ঠা করেই ওঁরা ক্ষান্ত হননি। তথাকথিত প্রাক্-ইতিহাস-টাও (বলা বাহুল্য ওঁদেরই আরেক 'সৃষ্টি') সাজানো হয়েছে নানান 'সাম্রাজ্য' দিয়ে। প্রাগৈতিহাসিক রাষ্ট্রগুলোতে ঐজন্যই হরেক নামের 'সাম্রাজ্য' বানানোর প্রয়োজন ওঁরা বোধ করেছিলেন। রেনো-সাহেবের অন্য কিছু লেখার সুযোগ ছিলনা কারণ তিনি ছিলেন ঐ মিথ্যার চক্রীদেরই একজন। এবং তা ছিলেন বলেই ঐ 'decayed or decaying empire' এর বিভ্রান্তিকর তথ্যটি তিনি হাজির করেছিলেন।

তিন 'সুপ্রাচীন' সভ্যতার ঐক্য—গর্ডন চাইল্ডের বক্তব্য

সিন্ধু, সুমের এবং ইজিপ্টীয় সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যেসব প্রত্নউপকরণ পাওয়া গেছে বলে প্রচার করা হয়েছে সেসব কিছুর মধ্যে বেশ মিল খুঁজে পেয়েছেন পণ্ডিতেরা। মৌলিক ধ্যানধারণা এবং উদ্ভাবনী শক্তির দিক দিয়ে সভ্যতা তিনটির মধ্যে যে বেশ ঐক্য ছিল—এটা তাঁরা লক্ষ্য করেছেন। সভ্যতার উপকরণের দিক দিয়েও বেশ ঐক্য ছিল। যেসব ব্যাপারে ঐ ঐক্য ছিল সেগুলিকে গর্ডন চাইল্ড সনাক্ত করেছেন। নাগরিক জীবন, দানা শস্যের চাষ, গবাদি পশুকে পোষ মানানো, ধাতুনিষ্কাষণবিদ্যা, বয়নশিল্প, ইট এবং নানারকম পাত্র তৈরী করার কৌশল, নানান পাথর থেকে মালা তৈরী করার উপযোগী গুটিকা বানানো, রাজপট্ট বা নীলকান্তমণির প্রতি অনুরাগ এবং চিত্রিত মাটি বা চীনামাটির পাত্র বানানোর জ্ঞান—এই নটা ব্যাপারে যে সভ্যতাতিনটির মধ্যে লক্ষণীয় ঐক্য ছিল তা গর্ডনসাহেব তাঁর "New light on The Most Ancient East"নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। গর্ডন সাহেব প্রচণ্ড পরিশ্রমই করেছেন। তবে দুঃখের

সঙ্গেই বলতে হয় তিনি সন্দেহ করার ক্ষমতাটাই হারিয়ে ফেলেছিলেন। নানান দেশের প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসাবশেষগুলোতে 'প্রত্নউপকরণ'গুলো যে বেশ পরিকল্পিতভাবেই গুছিয়ে গাছিয়ে রাখা হয়েছিল—এইটাই তিনি ধরতে পারেননি। 'প্রত্নউপকরণ'গুলোর সমধর্মিতাটাকে তিনি সন্দেহের চোখে দেখেননি। নেপথ্যশিল্পীদের সযত্নলালিত নানান তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার দায় যে ঐসব প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসাবশেষের ওপর চাপানো হয়েছিল—এই সোজা কথাটা হয় তিনি বুঝেও বোঝেননি—সেক্ষেত্রে তাঁকে মিথ্যার কারবারীদের শরিক হিসাবে সনাক্ত করে নিতে হয়—নয় তিনি কিছুই বোঝেননি।

সূক্ষ্ম কাজেও ওস্তাদ ছিলেন প্রাগৈতিহাসিক 'শিল্পী'

মোহেন্-জো-দড়োর লিপিগুলো শিলালিপি আকারে পাওয়া যায়নি। পাওয়া গিয়েছিল সীলমোহরে। সেসব সীলমোহরের প্রতীকগুলো সত্যিই দেখবার মত। পরিচিত জীবজন্তুর উদ্ভট রূপকল্প অনেক সীলমোহরেই রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। উদ্ভট জন্তু একশৃঙ্গী (unicorn) -র সংস্থান বেশ কিছু সীলমোহরে ছিল। ছিল নানান জীবজন্তুর প্রতিরূপ রাখার ব্যবস্থাও। রূপকল্পের মধ্যে যতই ঔদ্ভট্য থাক ঐসব সীলমোহরের উচ্চাবচতা (relief) সত্যিই প্রশংসনীয়। আজকের যুগেও ঐধরণের উন্নতমানের রিলিফযুক্ত সীল বানানোর শিল্পী ভারতে খুব কমই আছেন। ঐ ধরণের উঁচুদরের রিলিফ তখনকার দিনের মানুষ তৈরী করে নিয়েছিলেন এটা একটা আজগুবি কথা। আজগুবি কারণ সে যুগে সূক্ষ্ম কাজ করার মতন উপকরণ অঢেল ছিল এটা মনে করাটাই বাতুলতা। বলা হয়েছে ওসব নাকি 'পাঞ্চ' করা হয়েছিল। পাঁচ হাজার বছর আগে 'পাঞ্চ' করাটা হত কি দিয়ে এবং কিভাবে এ-প্রশ্ন তোলার দরকার ভারতীয় পণ্ডিতেরা কেউই বোধ করেননি। বোধ করেননি কারণ সাহেব পণ্ডিতেরা কেউই সে প্রশ্ন তোলেন নি।

হরপ্পার খবর বেদেও আছে !

তথাকথিত বৈদিকযুগে মৃতদেহ দাহ করার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। প্রচলিত ছিল সমাধি দেওয়ার ব্যবস্থাও। সমাধিতে মৃতব্যক্তির বাঁ হাতে তীরধনুক রাখার ব্যবস্থার কথা ঋগ্বেদে (১০, ১৮, ৯) আছে। মজার ব্যাপার, হরপ্পার Cemetary H চিহ্নিত সমাধির শবাধারে অঙ্কিত চিত্রে ঐ ব্যবস্থার ইঙ্গিত প্রতিফলিত হয়েছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের (১৪, ১৬, ১৮) সূক্তে সমাধি সম্পর্কিত আচার অনুষ্ঠান এবং বিশ্বাস সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে ঐসব চিত্রে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। তথাকথিত বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড এবং মোহেন্-জো-দড়ো-হরপ্পার প্রত্ন-উপকরণের বক্তব্যের মধ্যে এরকম অনেক মিলই আছে। বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ নেই। প্রশ্ন হচ্ছে ঐসব মিল পাওয়া যাচ্ছে কেন। দু-রকম অনুমান করা যায়। এক, বেদবর্ণিত তথ্যের সঙ্গে মিল আছে এমন কিছু উপকরণ ঐ হরপ্পায় রাখার ব্যবস্থা হয়েছে অথবা হরপ্পায় প্রাপ্ত উপকরণ বা তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে ঋগ্বেদের ঐ অংশটা লেখা হয়েছে। দ্বিতীয় অনুমানটা গ্রহণযোগ্য নয়। গ্রহণযোগ্য নয় কারণ হরপ্পার ঐসব উপকরণের বেশীর ভাগের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল ১৯২২ সালেরও পরে। (কিছু উপকরণ অবশ্য উনিশ শতকেই পাওয়া গিয়েছিল। পাওয়া গিয়েছিল কানিংহামের অনুসন্ধানের সূত্রে) ঋগ্বেদ পূর্ণতঃ প্রকাশিত হয়েছিল ওর চল্লিশ বছর আগেই। সিদ্ধান্ত একটিই তা হচ্ছে এই : ঋগ্বেদের ঐ অংশটি এবং সিন্ধুসভ্যতা সম্পর্কিত প্রচ্ছন্ন বক্তব্য সমৃদ্ধ সব অংশই ১৮২৬ সালের পরে লেখা। কারণ ঐ হরপ্পার তিবির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল ১৮২৬ সালে। তথাকথিত বক্তব্যসমৃদ্ধ প্রত্ননিদর্শনগুলো রাখার ব্যবস্থা হয়েছে পরে। অর্থাৎ ১৮২৬ সাল থেকে ১৯২২ সালের মধ্যে কোনও এক সময়ে।

হরপ্পার প্রাগৈতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত ধ্বংসাবশেষের খবর আঠারো শ' ছাব্বিশ সালেই কর্তৃপক্ষ পেয়েছিলেন। এ-তথ্য ইতিহাসে পাওয়া

যাচ্ছে। প্রশ্ন হল সে-তথ্য জানা থাকা সত্ত্বেও ওখানে খননকার্য বা অনুসন্ধানের কাজ প্রায় একশ' বছর ফেলে রাখা হয়েছিল কেন? তবে কি ঐ সুদীর্ঘ সময়টা 'প্রাগৈতিহাসিক' কিছু উপকরণ, বিচিত্র-উদ্ভট আধাচিত্রলিপি—আধাঅক্ষরমার্কা 'প্রাগৈতিহাসিক' লিপিমালা উদ্ভাবনের জন্যই খরচ হয়েছিল? সন্দেহের আরও কিছু কারণ পাচ্ছি। তথ্যদৃষ্টে বুঝতে কষ্ট হয়না ঐ সময়েই (অর্থাৎ ১৮২৬ সালের পরে বেশ কয়েক বছর ধরে) বেদ-নামক পুণ্যগ্রন্থটি বৈদিক ভাষায় রচিত হচ্ছিল। ঐ বেদে হরপ্পার নাম জড়িয়ে কিছু গল্প লেখা হলে পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকদের বিভ্রান্ত করা যাবে—এই চিন্তা কি মিথ্যার কারবারীদের মধ্যে কাজ করেছিল? এবং সেই চিন্তাতেই কি ঐ হরপ্পার গল্পটা পবিত্র ঐ বেদে রাখা হয়েছিল? নাহলে হরিয়ুপিয়া নামক নদীর কথা ঐ বেদে পাচ্ছি কেন? হরপ্পা এবং হরিয়ুপিয়া নাম দুটোর মধ্যে ধ্বনিগত কিছু সাদৃশ্যত আছেই। অর্থহীন বিচিত্র ঐ 'বৈদিক' শব্দটা যে ঐ গল্পের স্বার্থে তৈরী করা হয়েছিল—এটা কি বলার দরকার আছে? বলে রাখা ভালো পরবর্তীকালের পণ্ডিতেরা ঐ ফাঁদেই পা দিয়েছেন। তাঁরা ঐ ধ্বনিসাদৃশ্য থেকে নানা তথ্য এবং কিছু তত্ত্বও তৈরী করে নিয়েছেন। সে তত্ত্বের উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছিনা। কারণ মিথ্যা থেকে তত্ত্ব তৈরী হয়না—তৈরী হয় মিথ্যার ডালপালা।

একটি নিবেদন

প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কিত এই প্রতিবেদনকে যাঁরা ভারতবিদ্বেষী অপপ্রচার বলে মনে করে বসবেন এবং বে-আইনী ঘোষণা করার দাবী তুলবেন তাঁদের কাছে আমার নিবেদন এই: শুধু ভারতের ইতিহাস সম্পর্কেই আমার বক্তব্যটা সীমাবদ্ধ রাখিনি। বক্তব্য রেখেছি সারা দুনিয়ার প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কেই। মিথ্যাটা শুধু ভারত সম্পর্কেই বানানো হয়নি। হয়েছে দুনিয়া জুড়েই। সারা পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাসটাই যে ভুয়ো—ওসবই যে আধুনিককালে বানিয়ে নেওয়া

কল্পনাবিলাস—ওসবই যে ইউরোপের রাষ্ট্রপোষ্য নেপথ্যশিল্পীদের চক্রান্ত—এইটা প্রমাণ করাই আমার উদ্দিষ্ট। শুধু ভারতেরটাই নয়। যদিও শুরু করেছি ভারত সম্পর্কিত আলোচনার মধ্য দিয়ে তবু বলব দুনিয়ার প্রাচীন ইতিহাস লেখার চক্রান্তটাকে ফাঁস করাটাই আমার মূল উদ্দেশ্য। তথ্যের জাল ছিন্নভিন্ন করে মূল সত্যে পৌঁছানোরই চেষ্টা করেছি। ভারতবিদ্বেষী অপপ্রচারের কিছুমাত্র অভিপ্রায় আমার নেই। এ-দেশ সম্পর্কে শ্রদ্ধাভক্তি কারুর চেয়ে আমার কম নেই। আসলে মিথ্যা ইতিহাসকে সত্যি মনে করে গর্ব বোধ করার কোনও যুক্তি খুঁজে পাইনি এবং পাইনি বলেই অপ্রীতিকর সত্যের সন্ধান করে নিতে কোনও কুণ্ঠাবোধ আসেনি। অকুণ্ঠচিত্তেই সবকিছু লিখেছি। ভারতের বাইরের প্রাচীন যুগের ইতিহাস লেখার পশ্চাতেও যে ঐ একই শিল্পীদের কর্মতৎপরতা কাজ করেছিল তা তথ্যপ্রমাণ দিয়ে এ-বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে জানাব।

প্রসঙ্গ ঃ বৈদিক সাহিত্য

পুণ্য পবিত্র বেদ-উপনিষদের জন্মরহস্য

বেদ-উপনিষদের নাকি বয়সের গাছপাথর নেই। শ্রৌত, গৃহ্য, ধর্মসূত্রেরও নাকি সেই দশা। পুরাণের ত কথাই নেই। পুরাকালীনত্ব যে তার নামেই প্রকট। জন্মলগ্নেই ওসব 'পুরাণ' নিঃসন্দেহে পুরানো সাজার জন্যই। প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে নাকি ঐ বেদ 'রচিত' হয়েছিল। আর তার শ-পাঁচেক বছর পরে নাকি ঐ উপনিষদ। সূত্র স্মৃতি পুরাণগুলো নাকি 'রচিত' হয়েছিল এর পরে কয়েক শ' বছর ধরে। 'রচিত' শব্দটার একটু ব্যাখ্যা দরকার। যেযুগে ঐ বেদ-উপনিষদ 'রচিত' হয়েছিল বলে প্রচার করা হয় সেযুগে লেখার রেওয়াজই ছিল না। ছিলনা তার কারণ ভারতে তখনও কোনও লিপির জন্মই হয়নি। এবং লিপির জন্ম হয়নি বলেই তখন সব কিছু 'রচিত' হত—লিখিত হত না। সব কিছুই মুখে মুখে চলত। এই আজগুবি তথ্যের একটা সুন্দর নাম দেওয়া হয়েছে—শ্রুতিপরম্পরা। শ্রুতিপরম্পরাতেই নাকি বেদ-উপনিষদ বেঁচে থাকত। বেঁচে থাকত গুরুশিষ্যপরম্পরায়। বেঁচে থাকত পুরুষপরম্পরায়। ভারতের প্রায় তাবৎ পণ্ডিত এই জলজ্যান্ত মিথ্যাটা বিশ্বাস করে নিয়েছেন। করে আনন্দ পেয়েছেন। অবিশ্বাস যে দু-চারজন করেছেন তাঁরা আবার আরেক আজগুবি তথ্যের অবতারণা করেছেন। এঁদের প্রসঙ্গে পরে আসছি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বেশীর ভাগই তাঁদেরই আরোপিত ঐ সালতামামি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করার দরকার বোধ করেননি। যে দু-একজন সন্দেহ করেছিলেন তাঁরা দু-চারশ' বছর এদিক ওদিক করার খেলা দেখিয়েছিলেন। ঐ পর্যন্তই। ভারতের পণ্ডিতেরা শুধু তথ্যটি বিশ্বাস করেই ক্ষান্ত হননি। ঐ দুই

গ্রন্থাবলীর ওপর ভিত্তি করে নানান তত্ত্বও তৈরী করে নিয়েছেন। রাজ্যের থিসিস তৈরী হয়েছে। ডক্টরেট পেতেও অসুবিধা হয়নি। দরাজ হাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁদের পাণ্ডিত্যের। মূলেই যে ফাঁকি এইটাই তাঁরা ধরতে পারেননি।

ইতিহাস আলোচনা করা যাক। ইতিহাসে সবকিছুর প্রাচীনত্বের স্বীকৃতি আছে। এবং সে-স্বীকৃতি দেওয়ার মধ্য দিয়ে ইতিহাস তার নিজের প্রাচীনত্বটাও প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে। বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ, সূত্র, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ সবই নাকি ঐ প্রাচীনযুগে ছিল। এবং বেশ জঁাকিয়েই নাকি ছিল। সূত্রের দুর্ভাগ্য—সৌত্রযুগের কল্পনা ঐতিহাসিকেরা করেননি। তা না করলেও বৈদিকযুগ, উপনিষদের যুগ, পৌরাণিক যুগ গ্রন্থাশ্রয়ী (গ্রন্থই ছিলনা—তবু গ্রন্থাশ্রয়ী!) হরেক রকম যুগের কল্পনা করে নিতে তাঁদের কোনও অসুবিধাই হয়নি। যুগপ্রবর্তক (ফলতঃ যুগান্তকারীও বটে) অস্তিত্বহীন বইগুলোকে কেউ যুগের দর্পন হিসাবে মনে করেছেন—কেউবা যুগদর্শন হিসাবে। গবেষকেরা নানান তত্ত্ব তৈরী করে পণ্ডিত সমাজকে উপহার দিয়েছেন। ঐতিহ্যের রোমন্থন-সর্বস্ব পণ্ডিতেরা সে-তত্ত্ব পড়ে পুলকিত হয়েছেন।

বেদ উপনিষদের কোনও আবেদন এখন নেই

বাঙ্গালী শিক্ষিত জনমানসে বেদ-উপনিষদ-সূত্র-পুরাণের কোনও আবেদনই এখন নেই। সত্যি কথা বলতে কি ও-সব এখন কেউ পড়েনই না। শোকেস সাজানোর জন্য ওসব কিছু বিক্রী হয় ঠিকই। তবে ঐ পর্যন্তই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি বিভাগীয় পাণ্ডিত্যের আসরে ও-সবের কিঞ্চিৎ আলোচনা হয়। ছাত্রেরা বাধ্য হয়ে পড়েন। না পড়লে নয় তাই। পুরো কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড যে জালভেজালে বোঝাই—তা পণ্ডিতেরাই জানেন না। ছাত্রেরা জানবেন কোথেকে? ব্রিটিশ সরকারের তৈরী করা একটা তঞ্চকতার নাম যে ঐ বেদ আর একটা প্রতারণার নাম যে ঐ উপনিষদ এই সোজা কথাটা পণ্ডিতেরাই

বোঝেননি। ছাত্রেরা বুঝবেন কি করে? সাহেবদের অর্ডারী লেখা-গুলোকে জ্ঞানকাণ্ড মনে করে ভারতের বিদ্বজ্জনমণ্ডলী পুলকিত। 'ঐতিহ্যানুরাগ'—নামক ছোঁয়াচে রোগের এপিডেমিক ছড়ানোর কাজে এখনও তাঁরা লিপ্ত।

বেদ-উপনিষদের বক্তব্য সম্পর্কে আলোচনা যথেষ্ট হয়ে গিয়েছে। ওসব বইয়ের ঐতিহাসিকত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে আমার বক্তব্য। মূল্যায়নের চেষ্টা করবনা। করার দরকারও বোধ করছি না।

ইতিহাসে পাচ্ছি বেদরচনার পাঁচ ছ' শ' বছর পরে নাকি উপনিষদ 'রচিত' হয়েছিল। ইতিহাসে যাই থাক, প্রকাশনার ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে উপনিষদ প্রকাশের ছত্রিশ বছর পরে বেদের আংশিক প্রকাশ ঘটেছিল। আর তা পূর্ণতঃ প্রকাশিত হতে আরও বছর চল্লিশ সময় লেগেছিল। প্রকাশকালের দিক দিয়ে উপনিষদ প্রাচীনতর—বেদ নয়। তাই উপনিষদের প্রাচীনত্ব সম্পর্কেই আলোচনাটা শুরু করা যাক।

উপনিষদের জন্মকথা

উপনিষদের 'জন্মের' ইতিহাসটা দেখা যাক। দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ করব। এক, ফরাসী ভারততত্ত্ববিদ্ আঁকেতি দুপের ভারতে এসেছিলেন ১৭৫৪ সালে। আট বছর তিনি এদেশে ছিলেন। ঐ ক-বছরে সংস্কৃত এবং 'আবেস্তার ভাষা' দু-দুটো ভাষা শিখে নিয়ে তিনি ইউরোপে ফিরে গিয়েছিলেন ১৭৬২তে। ফেরার সময় বেশ কিছু ফারসী পুঁথি তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। উপনিষদের ফারসী অনুবাদের সেইসব পুঁথি থেকে ল্যাটিন অনুবাদ করার কাজ তিনি শুরু করলেন ওখানে গিয়েই। উপনিষদের দুরকম ফারসী অনুবাদ থেকে তুলনামূলক সূক্ষ্মবিচার সেরে ১৭৮৬ সালে চারটি উপনিষদের ল্যাটিন অনুবাদ তিনি করলেন। সিরিজের মোট পঞ্চাশটা উপনিষদের অনুবাদ করতে আরো কয়েক বছর সময় নিতে হল তাঁকে। ১৮০১ (১৮০২?)

সালে উপনিষদগুলোর ল্যাটিন অনুবাদের কাজটা শেষ হল। অনুবাদটির ল্যাটিন নাম তিনি রাখলেন Oupnik'hat। নিঃসন্দেহে বিচিত্র বানান। ছুই, কঠোপনিষদের ফারসী অনুবাদ থেকে রামমোহন রায় ইংরাজী ও বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮১৭ সালে আর ইংরাজী অনুবাদটা ১৮১৯ সালে। এ-ছাড়া বাংলায় আরও পাঁচটি উপনিষদের অনুবাদ তিনি করেছিলেন (কেন, ঈশ, মাণ্ডুক্য, শ্বেতাশ্বতর ও মুণ্ডক)। হিন্দীতে চারটি উপনিষদের অনুবাদও তিনিই করেছিলেন।

ঘটনা ছুটির মধ্যে আমাদের ঐতিহাসিকেরা সন্দেহজনক কিছুই খুঁজে পাননি। প্রশ্নও তোলেননি। অথচ তোলা উচিত ছিল। বেশ কয়েকটি প্রশ্ন ত' এমনিতেই আসছে। এক, সংস্কৃত উপনিষদ যদি থেকেই থাকবে তবে তার অনুবাদের অনুবাদ করার দরকারটা পড়ল কেন? সোজাসুজি সংস্কৃত বই থেকে অনুবাদ করার কি কিছু অসুবিধা ছিল? ছুই, তবে কি সংস্কৃত উপনিষদ নামক বইয়ের অস্তিত্বই ছিলনা? তবে কি অস্তিত্বহীন সেই সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর ফারসী সংস্করণটা আসলে একটা তৈরীকরা (manufactured) বই? তিন, সাহেব পণ্ডিতদের নির্দেশে লেখা একটা মতলবের নামই কি ঐ ফারসী উপনিষদ? কোনও ভাড়াটে ফারসী পণ্ডিতকে দিয়ে কি ঐ ফারসী উপনিষদ-গুলো লেখানো হয়েছিল? এ-সব প্রশ্ন আসছেই। স্পেনীয় নাটকের অস্তিত্বহীন বইয়ের বাস্ক্ অনুবাদ থেকে কি ইংরাজী অনুবাদ করা হয়? টমাস মানের 'হারিয়ে যাওয়া' কোনও বইয়ের আদি টিউটনিক ভাষায় অনুবাদ করা বই থেকে কি আমরা বাংলা অনুবাদ করি? গোলমাল আরও আছে। ছুপের্ঁ সাহেব শিখেছিলেন 'আবেস্তার ভাষা'। আর তর্জমা করে বসলেন ফারসী ভাষা থেকে। এটা কি করে সম্ভব হল? আধুনিক ফারসী ভাষা তিনি শিখলেন কবে? আর যদি মনে করে নেওয়া যায় উপনিষদগুলো 'আবেস্তার ভাষা'য় লেখা হয়েছিল তাহলেও ত আর এক প্রশ্ন আসছে। রামমোহন রায়ই-বা সেগুলির তর্জমা

করলেন কি করে? তিনি ত' আধুনিক ফারসী ভাষাটাই জানতেন—'আবেস্তার ভাষা'টা নয়।

প্রশ্ন আরও আসছে। যে সংস্কৃত উপনিষদ গ্রন্থাবলীকে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অত্যন্ত মূল্যবান বলে মনে করে বসলেন—যে উপনিষদের ল্যাটিন অনুবাদ করার কাজে দীর্ঘ চল্লিশ বছর তাঁরা কাটিয়ে দিলেন—সেই সংস্কৃত উপনিষদ ঐ চল্লিশ বছরের মধ্যে ভারতে প্রকাশ করা হলনা কেন? সংস্কৃত বইয়ের সন্ধান নেই—তার ল্যাটিন তর্জমা করারই-বা এত দরকার পড়ল কেন? ল্যাটিন ভাষাটা কি দুনিয়ার 'ধার্মিকজালিয়াতি' পুষে রাখার মাধ্যম? তবে কি ঐ তর্জমা করার ব্যাপারটাই একটা ভাঁওতা? তবে কি ঐ চল্লিশ বছর ধরে সংস্কৃত উপনিষদগুলো ভারতে কোথাও লেখানো হচ্ছিল? 'কালহরণম' নামক খেলাটা খেলার জন্যই কি ঐ ল্যাটিন অনুবাদের আয়োজন হয়েছিল? অনুবাদ করার কাজে একজন ফরাসী পণ্ডিতের নাম জড়িয়ে ইংল্যাণ্ডের মিথ্যার কারবারীরা কি নিজেদের সন্দেহের উর্ধে রাখার ব্যবস্থা করে নিচ্ছিলেন? এ-সব প্রশ্ন আসছেই। কোনটিরই উত্তর পাচ্ছিনা।

আর একটু অতীতে যাওয়া যাক। উপনিষদ-নামক মূল্যবান গ্রন্থাবলীর 'মনে হয়' (এইচ. গাওয়েন) বেশ কয়েকটি ফারসী অনুবাদ সম্রাট আকবরের আমলে করানো হয়েছিল। বলা বাহুল্য, কল্পিত সেই সব অনুবাদের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্রাচীনতম বলে প্রচারিত যে ফারসী পুঁথি অবলম্বন করে দুপের্ঁ সাহেব ল্যাটিন অনুবাদের দায়িত্ব নিয়েছিলেন তা নাকি আওরঙ্গজেবের আমলের। মজার ব্যাপার। এই ফারসী অনুবাদটা আবার কে করতে গেলেন? ইতিহাসের গল্পটা একটু দেখা যাক্। শাহজাহানের পুত্র দারা শীকোহ্ কাশ্মীরে গিয়েছিলেন ১৬৪০ সালে। ওখানে থাকার সময় সংস্কৃত ভাষায় লেখা উপনিষদ গ্রন্থাবলী নাকি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বইটির অন্তর্নিহিত তত্ত্বের মহিমায় মুগ্ধ হয়ে কিনা জানিনা তিনি নতুন উদ্যমে বইটির আর এক প্রস্থ তর্জমা করার ব্যবস্থা করে বসলেন। মতান্তরে

মহাপণ্ডিত দারা শীকোহ্‌ নিজেই নাকি ঐ অনুবাদটা করেছিলেন। ১৬৫৭ সালে দিল্লীতে তর্জমার কাজটা শেষ হয়েছিল। এবং এর তিন বছর পরেই তাঁর প্রাণদণ্ড হয়েছিল 'সম্ভবতঃ' (এইচ. গাওয়েন) ঐ 'অপরাধে'র জন্যই। বেশ সুন্দর গল্প। আওরঙ্গজেবের আদেশে দারা শী:কোহ্‌-র প্রাণদণ্ড ঐতিহাসিক ঘটনা কিনা সেটা আমার বিচার্য নয়। বিধর্মী অপবাদটাও ওজর হিসাবে আদৌ দেওয়া হয়েছিল কিনা সে-প্রশ্নেও যাচ্ছিনা। তবে এইটুকু বলতে পারি উপনিষদের তর্জমা করার অপরাধের গল্পটা আরোপ করার ব্যবস্থা হয়েছিল পরিকল্পিতভাবেই। ব্যবস্থা হয়েছিল কারণ মধ্যযুগেও যে অনেকে 'উপনিষদ'-এর চর্চা করতেন—এই বানানো গল্পটাকে প্রমাণসিদ্ধ করার তাগিদ ঐতিহাসিকেরা বোধ করেছিলেন। সম্ভবত কর্তৃপক্ষের সেই রকমই নির্দেশ ছিল। মিথ্যার ডালপালা গজানোর ব্যবস্থা করতে হয়।

আর একটা কথা। ঐ ফারসী তর্জমা করার সময় কি ঐ সংস্কৃত উপনিষদ গ্রন্থাবলীটা হারিয়ে গিয়েছিল? আর হারিয়েই যদি না যাবে তবে ফারসী ভাষা থেকে অনুবাদ করার দরকার-ইবা পড়ল কেন? সংস্কৃত গ্রন্থাবলীটা গেল কোথায়?

প্রশ্ন আরও আসছে। দুপের্ঁ সাহেব কি সত্যি সত্যিই ঐ সংস্কৃত আর 'আবেস্তার ভাষা' শিখতে চন্দননগরে এসেছিলেন? এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে প্রাসঙ্গিক একটি তথ্য দিয়ে নেওয়া যাক। ইণ্টেলেক্‌চুয়াল ষড়যন্ত্র করার মানসিকতা যে ১৭৬৩ সালে ইংরাজদের এসে গিয়েছিল তার প্রমাণ স্ক্র্যাফ্‌টন সাহেবের লেখা A History of Bengal Before And After the Plassey (1739-1758 বইয়ে বর্ণিত 'বিদম' নামক কল্পিত বইয়ের তত্ত্বপ্রচারের সূত্রে পাওয়া যাচ্ছে (এ-বইয়ের প্রসঙ্গে পরে আসছি) প্রশ্ন হল ঐ ষড়যন্ত্র সৃষ্টির তাগিদে ফরাসী পণ্ডিতের নাম জড়ানোর ব্যবস্থাটা কি পরবর্তীকালে নেওয়া হয়েছিল? ব্যাপারটা সহজ করে বলা যাক। দুপের্ঁ সাহেবের ঐ ভাষাদুটো শেখার গল্পটা কি পরে তৈরী করে

নেওয়া হয়েছিল? এবং ফরাসী ভদ্রলোক কি মিথ্যাটা মেনে নিয়েছিলেন? তাইত মনে হচ্ছে। অস্তিত্বহীন পুঁথি নিয়ে যিনি জাহাজে উঠতে পারেন আর ঐ পুঁথির অনুবাদ করার খেলায় চল্লিশ বছর কাটিয়ে দিতে পারেন তিনি সত্যি কথা বলবেন এটা আশা করা যায় না। দুপের্ঁ সাহেব নাকি চন্দননগরে 'আবেস্তার ভাষা'টাও শিখে নিয়েছিলেন। 'আবেস্তার ভাষা' শেখানোর স্কুল ঐ ১৭৫৬ সালে কে খুলেছিলেন? খোলা হলই-বা কি করে? ঐ সময়ে যে ভাষাটার নাড়ীনক্ষত্র কেউ-ই কিছু জানতেন না। কীলকাকৃতি লিপির পাঠোদ্ধার হয়েছিল ১৮৪৬ সালে। তার আগে কি ঐ ভাষাসম্পর্কে কোনও তথ্য কারুর জানা ছিল? উনিশ শতকে তৈরী করে নেওয়া ঐ ভাষাটার খবর চন্দননগরের মাস্টার মশাই আঠারো শতকে জানলেন কি করে? আবেস্তার গল্প অবশ্য আঠারো শতকের শেষাশেষি তৈরী হয়ে গিয়েছিল। যেমন তৈরী হয়ে গিয়েছিল বেদের গল্পটাও। কিন্তু বইদুটোর ভাষা সম্পর্কে কিছু জানার প্রশ্ন তখনও ছিল অবান্তর। সেটা জানা সম্ভব হয়েছিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি। বইদুটো প্রকাশের পরে। সে যাই হোক, আসল কথায় আসা যাক। দুপের্ঁ সাহেব যে মিথ্যার আন্তর্জাতিক কারবারীদের ক্রীড়নক ছিলেন—এটা বুঝে নিতে কষ্ট হয়না।

আসলে সাহেব পণ্ডিতদের নির্দেশে কিছু ভাড়াটে দেশী পণ্ডিতদের দিয়ে উপনিষদ লেখানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। হয়েছিল কারণ ঐতিহ্যগর্বী ধর্মভীরু 'মানুষ' তৈরী করার জন্য ঐ ধরণের বই লেখার দরকার ঐ সাহেব পণ্ডিতেরা বোধ করেছিলেন। বোধ করেছিলেন নানান দেশে ধর্মের বন্যা বইয়ে দেওয়ার সুপরিকল্পিত মতলব ওঁদের ছিল বলেই। শুধু শ্বেতাশ্বতর উপনিষদই নয় সমস্ত উপনিষদ লেখানোর পরিকল্পনা যে শ্বেতাশ্বতর ঐ সাহেবদের উর্বরমস্তিষ্কসঞ্জাত—এই সোজা কথাটা কেউ বুঝলেননা। বোঝার চেষ্টা করলেন না। সাহেবী ম্যাজিকে বিজাতীয় অধ্যাত্মবাদ আত্মা, ব্রহ্মচিন্তা আর জন্মান্তরবাদের তত্ত্ব নিয়ে এসে হাজির

হল আমাদের এই ভূখণ্ডে। প্রভূত আজগুবি লৌকিক সংস্কারের সঙ্গে 'আজগুবিতর' ব্রহ্মের মেলবন্ধন ঘটল।

ব্রহ্মচিন্তা প্রচারের কর্মকাণ্ড

রামমোহন রায় এই ব্রহ্মচিন্তা প্রচার করার দায়িত্ব প্রাথমিকভাবে পেলেন। তৈরী হল ব্রাহ্মধর্ম। কল্পিত সংস্কৃত উপনিষদের কল্পিত ফারসী অনুবাদের কল্পিত ল্যাটিন অনুবাদের ইংরাজী 'অনুবাদের' সংস্কৃত অনুবাদ বাজারে আত্মপ্রকাশ করল। আত্মপ্রকাশ করল ব্রহ্মনামক ক্লীবলিঙ্গ। যা কস্মিনকালেও ভারতে ছিল না সেই 'পরম' ব্রহ্মের আকস্মিক আত্মপ্রকাশে কি কেউ সন্দেহ করেছিলেন? কিছু ব্যক্তি নিশ্চয়ই করে থাকবেন। না হলে রামমোহন রায় ঐ ব্রহ্মের প্রাচীনত্বের সাফাই গাইতে যাবেন কেন? তিনি লিখলেন:

"আর পূর্ব্বেও পণ্ডিতেরা যদি এই মতকে কেহো না জানিতেন এবং উপদেশ না করিতেন তবে ভগবান বেদব্যাস এই ব্রহ্মসূত্র কিরূপে করিয়া লোকের উপকারের নিমিত্ত প্রকাশ করিলেন এবং বাদরি বশিষ্ঠাদি আচার্য্যেরা কি প্রকারে এইরূপ ব্রহ্মোপদেশে প্রচুর গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন ভগবান শঙ্করাচার্য্য এবং ভাষ্যের টীকাকার সকলেই কেবল ব্রহ্ম স্থাপন এবং ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ করিয়াছেন নব্য আচার্য্য গুরু নানক প্রভৃতি এই ব্রহ্মোপাসনাকে গৃহস্থ এবং বিরক্তের প্রতি উপদেশ করেন এবং আধুনিকের মধ্যে এই দেশ অবধি পঞ্চাব পর্য্যন্ত সহস্র ২ লোক ব্রহ্মোপাসক এবং ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশকর্তা আছেন তবে আমি জাহা না জানি সে বস্তু অপ্রসিদ্ধ হয় এমত নিয়ম যদি করহ তবে ইহার উত্তর নাই।"

সত্যিই ত উপনিষদীয় ব্রহ্মের প্রাচীনত্বের এতগুলো নজীর থাকা সত্ত্বেও সন্দেহ করার কি কোন মানে হয়? আর সন্দেহ কেউ করলে তার উত্তর দেওয়ার দরকারই বা কি?

এখানে একটি প্রশ্ন আসছে। 'ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশকর্তা'দের

লেখা গ্রন্থগুলো বা বাদরি বশিষ্ঠাদি আচার্যদের 'রচিত' 'প্রচুর গ্রন্থ' 'প্রকাশিত' হওয়ার খবর রামমোহন রায় পেলেন কোত্থেকে? ওসব বই যে তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিতই হয়নি। ও-সবই যে প্রকাশিত হয়েছিল উনিশ-শতকের শেষার্ধে। তাহলে? ও-সব বইয়ের নামগুলোই শুধু তখন ও পর্যন্ত প্রচার করা হয়েছিল। কায়দাটা একটু খুলেই বলা যাক। মিথ্যার কারবারীরা যেসব বই লেখানোর পরিকল্পনা নিতেন সে-সব বইয়ের নাম গুলো পূর্বাহ্নে প্রচার করার দায়িত্বও নিয়ে নিতেন। 'কৌটিলীয় অর্থ-শাস্ত্র' লেখানোর পরিকল্পনা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বইটার নামের প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছিল। বইয়ের সন্ধান নেই—বইয়ের নামের প্রচারটা শুরু হয়ে যেত। ধুরন্ধর কোলব্রুক সাহেব এ-রকম অনেক বইয়ের নাম (লেখকের নামসহ) পূর্বাহ্নেই প্রকাশ করেছিলেন যেসব বই তখনও লেখাই হয়নি। দু-একজন লেখকের নাম দেওয়া যাক। 'আর্যভট' 'ব্রহ্ম-গুপ্ত' 'বরাহমিহির' ইত্যাদি। মজার কথা আরও আছে। প্রাচীন **সমস্ত** সংস্কৃত বই-ই 'আবিষ্কার' করেছিলেন বিশেষ জাতের পণ্ডিতেরা। আজ মিস্টার জন একটি বই 'আবিষ্কার' করলেন ত' কাল করলেন মিস্টার বুল। পরের দিন কোনও বিশ্বাসভাজন আমলা বা মহামহোপাধ্যায় কিংবা কোনও রায়বাহাদুর। 'সুপ্রাচীন' সংস্কৃত সাহিত্যের **সমস্ত** পুঁথি-অহল্যাই মিস্টার Ram-দের কিংবা তাঁদের অনুচরদের স্নেহধন্য স্পর্শে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল। জীবন্ত হয়েছিল। প্রকাশিত হয়েছিল। বাৎসায়নই বলুন, অর্থশাস্ত্রই বলুন, ভাসের নাটকগুলোর কথাই ধরুন সবই একই চক্রান্তের নানান নাম। বলাবাহুল্য Rig-বেদ (Rig=trick), Psalm-বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারতগুলো অন্য কিছু নয়। অন্য কিছু নয় তথাকথিত চাতুবর্ণের বিধান বাৎলানো মনুসংহিতাটাও।

প্রশ্ন হল যাঁরা 'ম্যানুফ্যাকচারিং স্কেলে' 'সুপ্রাচীন' উপনিষদ লেখানোর ব্যবস্থা করলেন তাঁরা কি ঐ বইয়ের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা না করে থাকতে পারেন? আর সেই চেষ্টারই যে নানারকম নাম। কোনটার ব্রহ্মসূত্র, কোনটার বা বেদান্তভাষ্য, কোনটার বা অন্য কিছু।

প্রতারণা মার্কা বইয়ের প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠার তাগিদে বানানো সবই জাল 'প্রমাণ'।

দু-চারজন ঐ ব্রহ্মের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সন্দেহ করলেও বেশীর ভাগ লোকই কিন্তু মেনে নিলেন ঐ মিথ্যাটা। তাঁরা মনে করলেন কীটদষ্ট উপনিষদগুলো বুঝিবা শতাব্দীর পর শতাব্দী কোনও অজ্ঞাত জায়গায় চাপাচোপা দেওয়া ছিল। কয়েকজন উৎসাহী ধর্মবীরের কল্যাণে বুঝিবা ওগুলোর উদ্ধার সম্ভব হয়েছে। যে বই কস্মিন-কালেও ভারতে ছিলনা—যে বইয়ের মূল্যবান (?) তত্ত্ব কস্মিনকালেও ভারতে আলোচিত হতনা—সেই বই প্রচারের ঠেলায় হয়ে দাঁড়াল হিন্দুদের মহান ধর্মগ্রন্থ।

তথাকথিত ব্রহ্মের স্বরূপ রামমোহনের না জানার কথা নয়। তিনি সবই বুঝেছিলেন। সংস্কৃত বইয়ের পাত্তা নেই—তস্য ফারসী অনুবাদের বাংলা, হিন্দী এবং ইংরাজী অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি পুরো ব্যাপারটাই অনুমান করে নিয়েছিলেন। জালিয়াতি-উদ্যোগের শরিক তিনি হয়েছিলেন সজ্ঞানেই। ইন্দোব্রিটিশ ইন্টেলেক্চুয়াল ষড়যন্ত্রের তিনি ছিলেন পথিকৃত। ইংল্যাণ্ডের ওরিয়েন্টালিস্ট চক্রের ক্রীড়নক রাম-মোহন নিজে উপনিষদের অনুবাদ করেও বলতে পেরেছিলেন সে তত্ত্ব সাধারণ মানুষের জন্য নয়। সাধারণ মানুষ যেন 'স্পিরিট' থেকে দূরে থাকে। ওসব তত্ত্ব শিক্ষিত মানুষের জন্য। সত্যিই ত উচ্চমার্গের চিন্তা কি সাধারণ লোকের মধ্যে মানায়? উপনিষদকে জাতে তোলার এ এক কায়দা। তথাকথিত ব্রাহ্মধর্মের প্রসার সীমায়িত হল শিক্ষিত ভারতীয়দের (বিশেষ করে বাঙ্গালীদের) মধ্যে। আগে ত' উপনিষদটা জাতে উঠুক—'পপুলার' করার দায়িত্ব পরে নিলেও চলবে। এই রকম ব্যবস্থা। আর একটা কথা। রামমোহনের যুগেই আবার ইংল্যাণ্ডের অ্যাংলিসিস্ট-গোষ্ঠী সাময়িকভাবে তৎপর হয়েছিলেন। ওরিয়েন্টালিস্ট চক্রের নেপথ্য কর্মকাণ্ড চলতে থাকলেও বাহ্যত ঐ অ্যাংলিসিস্টদের প্রভাবপ্রতিপত্তি বেড়ে গিয়েছিল। এঁদের চাপে এবং বেন্টিঙ্ক মেকলে-

দের প্রচেষ্টায় বেশ কিছু সেকুলার চিন্তাভাবনা ভারতে প্রসার লাভ করতে শুরু করেছিল। ফলে যথার্থ সংস্কারমূলক ব্যবস্থাও তৎকালীন ভারত সরকার নিয়েছিলেন। সেকুলার চিন্তাসমৃদ্ধ ভাবধারা ভারতে প্রসার হওয়ার সূত্রে ব্রহ্মবিজ্ঞাপনের জোরটা স্বভাবতই কিছু কমে গিয়েছিল। কমে যাওয়ার কিছু কারণও ছিল বৈকি। স্বয়ং রামমোহন রায়ও যে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচারে খুব একটা 'অনুপ্রেরণা' পেয়েছিলেন—এটা মনে করার কোনও কারণই নেই। ঐ ব্রহ্মতত্ত্ব নামক ফক্কিকারির সবই যে তাঁর জানা ছিল। সম্ভবত সেইজন্যই মনপ্রাণ দিয়ে ঐ কাজে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েননি। নিজে বেদান্তবাদী সেজেছিলেন বলেই বেদান্তের বিরোধিতা করে তিনি লিখেছিলেন, "Nor will youths be fitted to be better members of the society by the vedantic doctrines which teach them to believe that all visible things have no real existence, that as father, brother etc. have no actual entity. they consequently deserve no real affection and therefore the sooner we escape from them and leave the world, the better."

ব্রিটিশ সরকারের বানানো বৈদান্তিক ধর্মপ্রচারের দায়দায়িত্ব বেশ কয়েকজন 'মহাপুরুষ' বুঝে নিয়েছিলেন। আঠারো শতকের রামমোহন (কর্মকাণ্ড উনিশ শতকের প্রথমার্ধে), উনিশ শতকের নরেন্দ্রনাথ দত্ত আর তথাকথিত আট বা ন' শতকের কল্পিত শঙ্কর। এঁরা সজ্ঞানে বেদান্তের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। কল্পিত শঙ্কর-সম্পর্কে 'সজ্ঞানে' শব্দটা খাটেনা। নেপথ্যে তাঁর নাম নিয়ে যিনি লিখেছিলেন তাঁর সম্পর্কেই শব্দটা প্রযোজ্য। এছাড়া প্রাচীন বেশ কয়েকজন কল্পিত মহাপুরুষের সন্ধান পাচ্ছি যাঁরা ঐ বেদান্তের হরেক রকম ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁদের সম্পর্কে আলাদা করে কিছু লেখার দরকার বোধ করছি না। কারণ কল্পিত পুরুষ সমালোচনার যোগ্য নন।

তথাকথিত সংস্কার যুগের মহিমা

আঠারো শ' আশিতে শুরু হল তথাকথিত সংস্কারযুগ (Reformation)। একদা বেদনিষ্ঠ পরবর্তীকালে উপনিষদপ্রেমিক ম্যাক্সমুলারের 'গবেষণা'সূত্রে উপনিষদের আভিজাত্য আরও বেড়ে গেল। রাজ্যের উপনিষদের প্রকাশ ঘটতে শুরু হয়েছিল ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই। প্রচারের উদ্যমও তখন থেকেই নেওয়া হয়েছিল। তাসত্ত্বেও কাজ খুব একটা এগোয়নি। ব্রাহ্মধর্মের নেতাদের ঐকান্তিক চেষ্টাতেও ঐ উপনিষদকে 'পপুলার' করা সম্ভব হয়নি। সেটা সম্ভব হয়েছিল পরে। 'আবির্ভূত' হলেন উপনিষদের নব্য প্রচারক নরেন্দ্রনাথ দত্ত। রামমোহনের চেয়ে বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য বেদান্তবাদী। ইংল্যাণ্ডের ওরিয়েণ্টালিষ্ট বনাম অ্যাংলিসিষ্ট দ্বন্দ্বের প্রভাব নরেন্দ্রনাথের ওপর আদৌ পড়েনি যা পড়েছিল রামমোহনের ওপর। ঐ দ্বন্দ্বের প্রভাবে রামমোহনকে কখনও বৈদান্তিক সাজতে হয়েছিল। কখনও কখনও সেকুলার-মনোভাবাপন্ন কখনও-বা বাইবেল ভক্তের ভূমিকায়ও তাঁকে নামতে হয়েছিল। নরেন্দ্রনাথের সে বিপদ ছিল না। তিনি তত্ত্বের দিক দিয়ে কৈবল্যবাদীর ভূমিকা নিলেন। বেদান্তকেই তিনি হিন্দু ধর্মের একমাত্র বক্তব্য বলে প্রচার করলেন। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সর্ব-ব্যাধির সর্বরোগহর (panacia) নাকি ঐ বেদান্ত। প্রচারের কৌশলটা কিছুটা পাল্টানো হল। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে রামমোহনীয় জেহাদ থাকল না। দেবদেবীদের স্বমহিমায় থাকার ব্যবস্থা হল পাকা। তত্ত্বের দিক দিয়ে কৈবল্যবাদী হয়েও কখনও ঈশ্বরবাদী কখনও-বা বেদান্তবাদী পরস্পরবিরোধী দ্বৈতচরিত্রে অভিনয় করে চললেন নরেন্দ্রনাথ। উপনিষদে ফুলবেলপাতা গোঁজা হল একটু বেশী মাত্রায়। গেরুয়ারঙে ছোপানো হল ঐ উপনিষদ। মলাট পাল্টে নাম দেওয়া হল বেদান্ত। একই বই মলাট বদল করে দু-দুটো 'যুগের' পত্তন করল। বলে রাখা ভালো তথাকথিত রেনেশাঁস

যুগটাও ঐ উপনিষদকে নিয়ে নাচানাচির মধ্য দিয়েই শুরু হয়েছিল। সে যাই হোক, বইটির মহিমা স্বীকার করতেই হয়। দ্বিযুগস্রষ্টা ঐ বই নরেন্দ্রনাথের হাতে পড়ে নতুন করে আলোড়ন সৃষ্টি করল। সাহেবদের সার্টিফিকেট পাওয়া বই বলে কথা!

কার জিনিষ কে ফেরী করে!

অমুক রাজার দেওয়া নাম আর তমুক রাজার দেওয়া টাকা নিয়ে নরেন্দ্রনাথ বিশ্বপরিক্রমা করেছিলেন ব্রিটিশ সরকারের তৈরী করা একটা চালাকিকে 'ভারতাত্মা'র 'শাশ্বত' 'বাণী' হিসাবে প্রচার করতে। শ্রীমতী ধাঁধা ঐ উপনিষদকেই তিনি পরম সত্য বলে প্রচার করে বেড়ালেন। 'চালাকির দ্বারা মহৎ কার্য হয়না'—এই 'মহান' বাক্যের প্রবক্তা নিজে চালাকির দ্বারাই মহৎ কার্য করতে এগিয়ে গেলেন। পুরানো মদকে নতুন বোতলে তিনি ঢালেননি—ঢেলেছিলেন নতুন মদ পুরানো-লেবেল-আঁটা বোতলে। সোঽহম, অমৃতস্য পুত্রাঃ এইসব অর্থহীন শব্দব্রহ্মের মহিমা প্রচার করতে সুদূর আমেরিকাতেও গিয়ে হাজির হয়েছিলেন তিনি। ইংল্যাণ্ডের পত্র পত্রিকায় প্রচণ্ড উল্লাস প্রকাশিত হয়েছিল ঐ শিকাগো-বক্তৃতার পরেই। নরেন্দ্রনাথের 'বৈদান্তিক' কাজকর্মে 'অনুপ্রাণিত' হয়ে আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে চলে এলেন মার্গারেট নোব্‌ল্। তিনি নাকি নরেন্দ্রনাথের মন্ত্রশিষ্যা। ভগিনী নিবেদিতা। এ-জাতীয় ভগিনীদের সংখ্যা কম নয়। ব্রিটিশ সরকার ঐ জাতীয় অনেক 'ভগিনী'কেই এদেশে পাঠিয়েছিলেন। পাঠিয়েছিলেন প্রতিনিধিদের কাজকর্মে চোখ রাখার জন্য। নরেন্দ্রনাথের মন্ত্রশিষ্যা, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর দক্ষিণ হস্ত মীরাবেন (ইনি আবার ব্রিটিশ এজেন্ট রোমাঁ রলাঁর রিক্রুট), মুচলেকাবিপ্লবী অরবিন্দের (ইঙ্গফরাসী গোপন সমঝোতায় ঋষি ছদ্মবেশীর) মন্ত্রশিষ্যা (ইনি আর এক মীরা—পরবর্তীকালে 'শ্রীমা')। কত নাম করব? অবশ্য পাকেচক্রে পরবর্তীকালে শ্রীমারই বন্দনা গাইতে হয়েছিল ঐ অরবিন্দকে। সে

যাই হোক, মজার কথা ঐ অরবিন্দকেও ব্রিটিশের তৈরী ঐ বেদান্তের মহিমা প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। বেদান্তবাদীদের জীবনী লেখানোর আয়োজনও ব্রিটিশ সরকার কিছু কম করেনি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সেবক মহাপণ্ডিত ম্যাক্সমুলার সাহেব এবং সুইজারল্যাণ্ডে বিতাড়িত রোমাঁ রলাঁ (শান্তিবাদীর ছদ্মবেশে ব্রিটিশ এজেন্ট) দু-জনেই লিখেছিলেন বেদান্তবাদীর জীবনী।

উপনিষদের ইথারীয় ধাঁধা

বৃহদারণ্যক উপনিষদের ধাঁধামার্কা একটা অংশ নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। সংস্কৃত বাণীটা না রেখে 'অরিজিনাল' ইংরাজী-টাই রাখছি। আত্মার স্বরূপলক্ষণ ঐ উপনিষদে প্রকাশ করা হয়েছে এইভাবে:

"It is not large and not minute, not short, not long, without blood, without fat, without shadow, without darkness, without ether…"

আর এগুনো কষ্টকর। থামতে হচ্ছে। যে অর্থে 'ইথার' শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে সেই অর্থের মধ্যেই গোলমাল। 'ইথার' নামের ঐ অর্থযুক্ত ম্যাজিক শব্দটা উনিশ শতকে তৈরী। সর্বব্যাপ্ত ইথারের কল্পনা তখনকার বিজ্ঞানীরা করেছিলেন। করেছিলেন একটি বৈজ্ঞানিক তথ্যসম্পর্কে মনগড়া 'তত্ত্ব' খাড়া করার জন্য। পার্থিব সবকিছুর মধ্যে ইথারের অস্তিত্ব কল্পনা করে নিলে অপার্থিব ব্রহ্ম বা আত্মার মধ্যে সেটাকে রাখা যায় না। তাই ঐ 'without ether'-এর 'তত্ত্ব'।

আত্মা বা ব্রহ্মের সঙ্গে ইথারের সমীকরণের চিন্তা শুধু বৃহদারণ্যক উপনিষদেই আসেনি। এসেছিল ছান্দোগ্য উপনিষদেও।

ছান্দোগ্যের সেই ইথারীয় ধাঁধাটা এইরকম (বলা বাহুল্য সেই 'অরিজিনাল' ইংরাজীতেই)

"The Intelligent, whose body is spirit, whose form

is light, whose thoughts are true, whose nature is like ether (omnipotent and invisible), from whom all works, all desires, sweet odours and tastes proceed ; he who embraces all this, who never speaks and is never surprised”.

এখানে ঐ ইথারের ব্যঞ্জনাটা আরও স্পষ্ট। উনিশশতকীয় ইথারের ধর্ম বন্ধনীর মধ্যে অংশত পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। ইথার-এর প্রতিশব্দ হিসাবে ঐ উপনিষদ দুটোতে কি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছিল ? করা হয়েছিল 'আকাশ'। আকাশ-এর অক্ষম অনুবাদে 'ইথার' আসে না। ether-এর সংস্কৃত প্রতিশব্দ বানাতে গিয়েই যে ঐ 'আকাশ'-এর আমদানী হয়েছিল এটা বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। পেটের মধ্যে 'আকাশ' আছে—বস্তু-নিচয়ের মধ্যে প্রকাণ্ড 'আকাশ'-টা ঢুকে বসে আছে—এধরণের রসিকতা উপনিষদেই মানিয়ে গিয়েছিল। প্রাচীন বই বলে কথা ! প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঋগ্বেদেও ঐ ether ঢুকে বসে আছে। তবে 'আকাশ' হিসাবে নয়। আছে আকাশ-এর প্রতিশব্দ 'অম্বর'-এর র-ইৎ 'অম্ব' বিকল্পে 'অম্ভ' হিসাবে। সত্যিই ত উনিশ শতকে লেখা ঋগ্বেদে ether না থাকলে কি ভালো দেখায় ?

প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় ব্রহ্মবিদ্-দের গল্প

ব্রহ্ম এসে হাজির হলেন ভারত নামক রঙ্গমঞ্চে। শুধু উপনিষদের মধ্য দিয়ে তার আবির্ভাবটাকে যে সবাই মেনে নেবেননা—কেউ কেউ যে সন্দেহ করে বসবেন—এ-চিন্তা সম্ভবত মিথ্যার চক্রীদের এসেছিল। এবং সে-চিন্তা এসেছিল বলেই ব্রহ্মের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদনের আরো কিছু ব্যবস্থা তাঁরা করে রেখেছিলেন। ব্যবস্থা অর্থে আরও কিছু 'মৌলিক' বইয়ের প্রকাশ। 'প্রাচীন' ব্রহ্মের 'প্রাচীন' সাক্ষ্য। ঋগ্বেদ লেখানো হল—সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থের (ভিন্ন ভিন্নও বটে) ব্রহ্ম শব্দের আমদানী হল ঐ বেদে। সত্যই ত' প্রাচীনতর বেদে ব্রহ্মের উল্টোপাল্টা

অর্থ যে থাকতেই পারে তাই কেউ সন্দেহই করলেন না। ব্রহ্মের ওপর ঐধরণের অর্থ আরোপ করার ব্যবস্থা দেখে পণ্ডিতেরা ঋগ্বেদকে প্রাচীনতর যুগে স্থাপন করলেন। উপনিষদের চেয়ে বেদ হয়ে গেল প্রাচীনতর। উপনিষদ পূর্ণতঃ প্রকাশিত হওয়ার পরে বেশ কয়েক বছরের মধ্যে যে বেদ অংশতও প্রকাশিত হয়নি—এই সোজা কথাটা বোঝার চেষ্টা কেউই করেননি। সে যাই হোক, সঙ্গে সঙ্গে মহাভারত লেখানো হল। ভীষ্মপর্বে ব্রহ্মের মহিমা কীর্তিত হল। বেদান্তের ওপর 'বশিষ্ঠ' 'বাদরায়ন', 'শঙ্করাচার্য' ইত্যাদি কল্পিত মহাপুরুষদের নামে বেশ কিছু বইপত্র লেখানো হল। এঁরা নাকি সব প্রাচীন-কালের বেদান্তবোদ্ধা! ব্রহ্মের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদনের স্বার্থে একপ্রস্থ বইপত্র এঁদের নামে লিখিয়ে রেখেই মিথ্যার কারবারীরা ক্ষান্ত হলেন না। আরও কিছু প্রমাণ দরকার। মধ্যযুগে ব্রহ্ম কি বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিল? তাই বা কি করে হয়? তাই ঐ যুগেরও কিছু চরিত্র বানিয়ে নেওয়া হল। বাংলার 'শ্রীচৈতন্য', মহারাষ্ট্রের 'তুকারাম,' পাঞ্জাবের 'নানক' ইত্যাদি ইত্যাদি। কল্পিত ওইসব চরিত্রসৃষ্টির মধ্য দিয়ে জানানো হল ব্রহ্মচিন্তার প্রসার মধ্যযুগেও নাকি ঘটেছিল এবং ঘটেছিল সারা ভারতেই। প্রাচীন ব্রহ্মের মধ্যযুগীয় অনুধ্যানের গল্পটা পণ্ডিতেরা সকলেই মেনে নিলেন। ঐ-সব ব্রহ্মবিৎ-দের ঐতিহাসিকত্ব সম্পর্কে সন্দেহ করার প্রয়োজন কেউই বোধ করেননি। প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় ব্রহ্মভাবে গদগদ কল্পিত মহাপুরুষদের নামাবলী লিখে প্রবন্ধের কলেবর বাড়ানোর ইচ্ছা নেই।

বেদ কি সত্যই প্রাচীন?

বেদ নামের কোনও ধর্মগ্রন্থ যে ভারতে ছিল এ-তথ্য কেউ-ই জানতেন না। আর ঐ ধর্মগ্রন্থে কি ছিল আর কি ছিলনা—এটা জানার প্রশ্নও ছিল অবান্তর। বেদের পুঁথি কেউ-ই দেখেননি। ব্রিটিশেরা আসার বেশ কিছু পরে বেদ-নামটার প্রচার শুরু হয়।

শুরু হয় ওঁদেরই তৈরী করে নেওয়া কিছু বইয়ে 'বেদ'-এর নাম জড়িয়ে গল্প লেখার সূত্রে। প্রচারটা নানারকম কায়দাতেই রাখা হয়েছিল। বেদের সন্ধান নেই তবু আর্য-বাইবেল-এর গল্প প্রচার করতে কোনও অসুবিধাই হয়নি। 'আর্য বাইবেল' শব্দটা লক্ষণীয়। সতেরো শ' ছিয়াশি সালের আগে ঐ 'আর্যভাষা' বা 'আর্যজাতি'-র ধারণার জন্মই হয়নি। এবং সে ধারণার জন্মের আগে যে ঐ 'আর্যবাইবেল'-এর গল্পটাও চালু হতে পারেনা—এটা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। সিদ্ধান্ত নিতেই হয় সতেরো শ' ছিয়াশি সালের পরেই ঐ গল্পের জন্ম। প্রচারটা এমন কায়দায় করা হয়েছিল যাতে মনে হয় ঐ সুপ্রাচীন গ্রন্থ বুঝিবা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছিল আর ভারতবর্ষের মানুষ বুঝিবা ঐ গ্রন্থের কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। আর ভুলে যাওয়া সেই বই আবিষ্কারের পুরো কৃতিত্ব বুঝি ইংরাজদেরই প্রাপ্য। সত্যিই ত ওঁদের মহিমা কি কম! ওঁরা বেদের কল্পিত পুঁথির অর্থাৎ অস্তিত্বহীন পুঁথির সবই ইউরোপে পাচার করে দিয়েছিলেন। কোনওটা ফ্রান্সে—কোনটা জার্মানিতে—কোনটা বা ঐ ইংল্যাণ্ডে। অস্তিত্বহীন পুঁথির ওপরও যে গবেষণা করা যায় এবং সে গবেষণার সঙ্গে জার্মানী, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের ডাকসাইটে সব পণ্ডিতও যে জড়িত থাকতে পারেন এটা ভাবতেও অবাক লাগে। আরও অবাক লাগে ঐ মিথ্যা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বিব্লিওথেক নাশিওনালের নাম জড়ানোর ব্যবস্থা দেখে। বুঝতে কষ্ট হয়না একটা আন্তর্জাতিক সুসংহত এবং সুসংগঠিত চক্রান্ত ঐ কর্মকাণ্ডের পিছনে কাজ করেছিল। না করলে বেদ-বেদান্তের ওপর 'গবেষণা'-ও হতনা। প্রাচীন ইতিহাসও লেখা হতনা।

বেদ সম্পর্কে সবচেয়ে 'প্রাচীন' এবং 'প্রামাণ্য' যে লেখাটা পাচ্ছি সেটা ছাপা হয়েছিল আঠারো শ' পাঁচ সালে। 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' পত্রিকার অষ্টম খণ্ডে একটি প্রবন্ধ আকারে সেটা ছাপা হয়েছিল। লেখক ছিলেন কোলব্রুক। প্রবন্ধের নাম দেওয়া হয়েছিল "On the Vedas Or Sacred writings of the Hindus" 'Or' শব্দটা

তাৎপর্যপূর্ণ। "বেদ অর্থাৎ হিন্দুদের পবিত্র রচনা"। বোঝা যাচ্ছে বেদ নামক শব্দের অর্থটাও তখনও পর্যন্ত স্থিরীকৃত হয়নি। হয়ে থাকলে ঐ 'Or' শব্দটা ওখানে বসত না। বসত একটি কমা। সে যাই হোক, ঐ প্রবন্ধে ছিলটা কি? ছিল ঐ বেদের কিছু নমুনা। যে বেদের নাম জড়িয়ে ১৮০৫ সালের আগেই কিছু বই লেখা হয়ে গিয়েছিল সেই বেদের কিছু নমুনা দিয়েই প্রবন্ধটি শেষ হল। শুধুই নমুনা দিয়ে। কারণটা কি? বেদ যে তখনও পর্যন্ত লেখা শেষ করা হয়েই ওঠেনি। লেখাটা যে তখনও শেষ হয়নি তার একটি প্রমাণ দেওয়া যাক। ১৮২৬ সালে প্রাগৈতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত হরপ্পার ঢিবির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। আর ঐ হরপ্পার নাম জড়িয়ে (হরিয়ুপিয়া নামক নদীর ছদ্মনাম চাপিয়ে) কিছু গল্পও লেখা হয়েছিল ঐ বেদে। সে গল্প যে ১৮২৬ সালের আগে লেখা সম্ভবই ছিলনা। একটা ব্যাপার পরিষ্কার। বেদ লেখাটা ১৮০৫ সাল নাগাদ সবে শুরু হয়েছে। নমুনা ছাড়া আর কি-ই বা দিতে পারতেন ঐ কোলব্রুক সাহেব। মজার ব্যাপার, পরবর্তী কয়েক দশক ধরে ঐ নমুনাটাকেই পণ্ডিতেরা বেদসম্পর্কিত একমাত্র প্রামাণ্য রচনা হিসাবে বিবেচনা করে বসলেন। আর ঐ নমুনার ওপর ভিত্তি করেই নানান গম্ভীর আলোচনা শুরু করে দিলেন।

কোলব্রুকের ঐ নমুনা প্রকাশের দীর্ঘ তেত্রিশ বছর পরে ১৮৩৮ সালে ঋগ্বেদের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল। সংস্কৃতে নয়, ল্যাটিনে। তাও ভারতে নয়—সুদূর লণ্ডনে! সেই খণ্ডটিতে ছিল ঋগ্বেদের ঐ অংশের ল্যাটিন অনুবাদ এবং সে-অনুবাদের ওপরে লেখা অসম্পূর্ণ কিছু ল্যাটিন টীকা। বইটা সম্পাদনা করেছিলেন ফরাসী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত রোঝাঁ। ফরাসী পণ্ডিতের সম্পাদিত বই ছাপা হল ইংল্যাণ্ডে।

(উৎস—নীরদ. সি. চৌধুরীর The Scholar Extraordinary)

ব্যবস্থাটা ভালোই। অনেকটা ঐ উপনিষদের মতই। সেই ফরাসী পণ্ডিতের নাম জড়ানোর ব্যবস্থা—সেই ল্যাটিন অনুবাদের খেলা।

বেদ রচনার ইতিহাসের পরের অংশটা দেওয়া যাক। রোর্ঝ্যার সম্পাদিত ঋগ্বেদের ঐ বই আর বিব্লিওথেক নাশিওনালে রক্ষিত বলে প্রচারিত বেদের পাণ্ডুলিপির (বলা বাহুল্য অস্তিত্বহীন) ওপর নির্ভর করে ফরাসী ভারততত্ত্ববিদ্ বুর্নু বেদ সম্পর্কে কিছু 'গবেষণা' করে নিলেন। বক্তৃতাও করে বেড়ালেন। তবে ঐ পর্যন্তই। বিরাট আকৃতির কোনও লেখা তিনি প্রকাশ করেননি। ঋগ্বেদের প্রথম ইংরাজী অনুবাদ করেন এইচ. এইচ. উইল্সন। বইটা প্রকাশিত হয় লণ্ডন থেকে ১৮৫০ সালে। রিচার্ড রাইটসনের The Sacred literature of the Hindus ডাবলিন থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে। থিওডোর বোনফে সামবেদের জার্মান অনুবাদ করেন ১৮৪৮ সালে। ভেবার যজুর্বেদের জার্মান অনুবাদ করেন ১৮৫২ সালে। সে যাই হোক, ঐ সময়েই বেদের সবচেয়ে বড় বোদ্ধা ম্যাক্সমুলারের প্রয়াস যুক্ত হল বেদঘটিত কর্মকাণ্ডে। ঋগ্বেদের প্রথম খণ্ড তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হল ১৮৪৯ সালে। পরবর্তী বছরগুলোতে অন্য খণ্ডগুলো ক্রমশঃ প্রকাশিত হতে থাকল। ছ-খণ্ডে সমাপ্ত ঐ ঋগ্বেদ পূর্ণতঃ প্রকাশিত হল ১৮৭৫ সালে। বৈদিক ভাষার বয়ানসহ ঋগ্বেদ পূর্ণতঃ প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ সালে। জার্মান ঋগ্বেদ আলফ্রেড লুডভিগ-এর সম্পাদনায় পূর্ণতঃ প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ সালে। ফরাসী ভাষায় অনূদিত লাঁলোয়া সম্পাদিত ঋগ্বেদ পূর্ণতঃ প্রকাশিত হয় ১৮৭০ সালে। সিদ্ধান্ত নিতেই হয় ১৮৭০ সালের আগে কোন ভাষাতেই ঋগ্বেদ পূর্ণতঃ প্রকাশিত হয়নি।

উইলসনের লেখা ঐ ঋগ্বেদ সম্পর্কে কিছু তথ্য দেওয়া যাক। ঐ বইয়ের পরিশিষ্টে কিছু 'বৈদিক' শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও বেদের বৈদিক বয়ানটা রাখার আয়োজন হয়নি। কিছু নির্বাচিত শব্দের উদ্ভট ব্যুৎপত্তির গল্প কিংবা কিছু গ্রীক শব্দের সঙ্গে ঐসব শব্দের কল্পিত মিলের কাহিনী রাখারই ব্যবস্থা হয়েছিল ঐ পরিশিষ্টে। তথাকথিত বৈদিক ভাষায় লেখা ঋগ্বেদের ঋকগুলো রাখার দরকার বোধ করেননি উইলসন সাহেব। স্বভাবতই প্রশ্ন এসে

পড়ছে 'অরিজিনাল' ঋগ্বেদ অংশতও ঐ বইয়ে প্রকাশ করা হয়নি কেন? তবে কি ওসব তখনও 'বৈদিক' ভাষায় লেখা হয়েই ওঠেনি? 'বৈদিক' নামক পরিকল্পিত ভাষায় বেদটা কি তখনও লেখা চলছিল? তাইত মনে হচ্ছে। বেশ কিছু বাঙ্গালীকে কাশীবাসী করে ঋগ্বেদটা কি তাঁদের দিয়েই লেখানো হচ্ছিল? তথাকথিত বৈদিক ব্রাহ্মণদের এক অংশ কাশীতে, অন্য অংশ ভাটপাড়া-বিষ্ণুপুর-ঝাঁপড়দায় থাকতেন কেন? মহান বেদ-টা কি ঐসব কাশীবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণদের দিয়ে ঐ সময়েই লেখানো হচ্ছিল? এ-সব সন্দেহ আসছেই। আর শুধু বৈদিকই-বা কেন? অবৈদিক ব্রাহ্মণও ত বেশ কিছু কাশীতে ছিলেন। উদ্ভট উদ্ভট সব শব্দের ফাঁকে ফাঁকে ঋগ্বেদে কেন বাঙ্গালীর অতি পরিচিত লৌকিক শব্দের এত আনাগোনা ঘটেছে? এই সন্দেহজনক ব্যাপারটার ব্যাখ্যা কোনও পণ্ডিতই দেওয়ার চেষ্টা করেননি কেন? (এ সম্পর্কে বিস্তৃততর তথ্য দ্বিতীয় খণ্ডে ভাষাসম্পর্কিত আলোচনায় রাখব) বেদ লেখার বিরাট কর্মযজ্ঞে শুধু বাঙ্গালীই ছিলেন এটা মনে করলেও ভুল হবে। গুজরাতি আধারিয়া (অধ্বর্য্যু) ব্রাহ্মণও বেশ কিছু ছিলেন। ছিলেন ভারতের নানান জাতের তথাকথিত বৈদিক ব্রাহ্মণেরাও। ছিলেন অবৈদিক ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ পণ্ডিতও।

বেদবেদান্ত প্রকাশ করার ব্যাপারেও কম খেলা খেলা হয়নি। বেদের আগেই বেদান্ত ছাপা হয়েগিয়েছিল! 'বাইপ্রোডাক্ট' তৈরী হয়ে গেল আগেই—আসলের দেখাসাক্ষাৎ নেই। বেদের বৈদিক বয়ান কেউ দেখলেন না তার আগেই তস্য ইংরাজী, ল্যাটিন, ফরাসী ও জার্মান অনুবাদের ব্যবস্থা হয়ে গেল। নিঃসন্দেহে মজার ব্যাপার। অপ্রকাশিত-পূর্ব বেদ-এর প্রসঙ্গ রামমোহন রায়ও করেছেন তাঁর বেদান্ত সম্পর্কিত আলোচনায়।

ঋগ্বেদে ইংরাজী শব্দও ঢুকে বসে আছে

খাঁটি ইংরাজী লৌকিক শব্দেরও বেশ কিছু ঐ ঋগ্বেদে ঠাঁই পেয়েছে। ঠাঁই পেয়েছে 'বৈদিক' ছদ্মবেশ চাপিয়েই। দু-একটা উদাহরণ দেওয়া

যাক। greedy থেকে গৃধ্নু—grabbed থেকে 'গৃভীত', night থেকে 'নক্তম', right থেকে ঋতম্‌, rite থেকে আর এক অর্থের ঋতম্‌ শব্দ তৈরী করে নিতে ঋগ্বেদী পণ্ডিতদের কোনও অসুবিধাই হয়নি। আধুনিক পণ্ডিতদের দিয়ে বানানো ঐ 'সুপ্রাচীন' ঋগ্বেদের জালিয়াতিটা কেউ ধরতে পারেন নি—এইটাই আশ্চর্যের।

ঋগ্বেদ প্রকাশনার অর্থ কে যুগিয়েছিলেন?

বিপুলায়তন ঐ বেদের প্রকাশনার কাজে অর্থব্যয় কিছু কম হয়নি। প্রচণ্ড ব্যয়সাপেক্ষ ঐ কর্মকাণ্ডে অর্থের যোগান দিয়েছিলেন কে? দিয়েছিলেন ঐ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। প্রশ্ন আসছেই। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেনিয়ারা এত ধর্মপ্রাণ হয়ে উঠলেন কেন? বেদ-বেদান্ত ইংরাজী এবং ল্যাটিনে তর্জমা করার মোচ্ছব-ই বা তাঁরা করতে গেলেন কেন? কোম্পানীর টাকা খরচ করে তাঁরা বইগুলো প্রকাশ করতে গেলেন কিসের উন্মাদনায়? তবে কি এহ্‌ বাহ্য? কোম্পানীর বকলমে ব্রিটিশ সরকারই কি ঐ সব খরচ বহন করেছিলেন? একদিকে ভারত নামক ভূখণ্ডের ভবিষ্যৎ ঝরঝরে করার ব্যবস্থা আর অন্যদিকে তার অতীতকে উজ্জ্বল বানাবার খেলাই কি শুরু করেছিলেন মহানুভব ব্রিটিশ সরকার? তাইত' আসছে।

বেদের অনুবাদ করার হিড়িক পড়ল কেন? বেদনামক মহান ধর্মগ্রন্থটিকে যদি ইংরাজেরা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া ভারতীয় ঐতিহ্যের স্মারক হিসাবেই মনে করে থাকেন তবে ত' সেটা ভারতীয় ভাষাতেই অনুবাদ করার দরকার ছিল। তা না করে আগেই ইংরাজী বা ল্যাটিনে অনুবাদ করার ব্যবস্থা করা হল কেন? সাহেবেরা ঐ বেদ পড়ে বৈদিক হ'য়ে উঠবেন— এমন প্রত্যাশা কি তাঁরা পোষণ করতেন?

তবে কি ঐ অনুবাদের ব্যাপারটাই একটা ভাঁওতা? তবে কি ঐ সময়েই কৃত্রিম বৈদিক ভাষায় বেদটা লেখা হচ্ছিল? কালহরণম-নামক খেলাটা উপনিষদের মত বেদরচনার ক্ষেত্রেও কি হয়েছিল?

কল্পিত বেদের অনুবাদ না করে 'অরিজিনাল' ইংরাজী বেদের বৈদিক অনুবাদ-ই কি ঐ সময় করা হচ্ছিল ? তাইত' আসছে।

আর একটা কথা। যে বেদকে সাহেব পণ্ডিতেরা এত মূল্যবান বলে মনে করে বসলেন সেই বেদটা ভারতবর্ষে ১৮০৫ সাল থেকে ১৮৪৯ সালের মধ্যে প্রকাশ করা হলনা কেন ? আরও বেশ কয়েক বছর পরে কেন ঐ 'বৈদিক' বেদ ভারতে প্রকাশিত হল ? কোনও প্রশ্নেরই উত্তর পাচ্ছি না।

ঋগ্বেদ প্রকাশের পরে পণ্ডিতদের প্রতিক্রিয়া

বেদ-চতুষ্টয় কোথায় লেখা হয়েছিল সেটা জানার উপায় নেই। কোলব্রুকের গাজীপুরের 'কারখানা'য়, না বারানসীতে, না, ফোর্ট উইলিয়ামের গোপন কুঠরীতে ঐ বেদ-চতুষ্টয় লেখা হয়েছিল তা বোঝার উপায় আজ আর নেই। এসিয়াটিক সোসাইটির কোনও অবদান ঐ চারটি 'মহাগ্রন্থ' রচনার ব্যাপারে ছিল কিনা তাও পরিষ্কার নয়। কোথায় ওসব লেখা হয়েছিল সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা ঐ চারটি বই প্রকাশের পরে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল সেইটাই। বেদের শব্দব্রহ্মের মহিমা আছে। ভাষাতাত্ত্বিকেরা দৌড়ে এলেন। বেদ খুঁটিয়ে পড়াশোনা করে নানান তত্ত্ব তৈরী করে ফেললেন। সমাজতাত্ত্বিকেরাই বা দূরে থাকেন কেন ? তাঁরাও এলেন। সমাজের বিবর্তন বুঝে নিতে বেদের মত বই নাকি হয় না। ঐতিহাসিকেরা ইতিহাসের মালমসলা বেদ থেকেই সংগ্রহ করে নিলেন। লিখিত নজীরের বড়ই অভাব। তাই বেদ নামক মহান ভাঁওতাকে উনিশ শতকে লিখিত রূপ দেওয়া হল। ইতিহাসের উৎসগ্রন্থ হওয়ার যোগ্যতা বেদের এসে গেল রাতারাতি। শ্রুতি বা জনশ্রুতির যা থাকবার কথাই নয়।

আসলে দুনিয়ার প্রাচীন বলে প্রচারিত সব ভাষাসৃষ্টির পশ্চাতে অবস্থানকারী 'ভাষাতাত্ত্বিক'-দের (বলা বাহুল্য এঁরা সকলেই মিথ্যার কারবারী-দেরই অনুগৃহীত) সাধনা সিদ্ধিলাভ করেছিল ঐ ঋগ্বেদের মধ্য

দিয়েই। সুসংগঠিত ভাষাতত্ত্বের চর্চা শুরু হয়েছিল ঐ বেদ-প্রকাশের পরেই। আসলে রাজ্যের মিথ্যাকে ভিত্তি করেই ভাষাতত্ত্ব নামক জ্ঞানের শাখাটি পল্লবিত হয়ে উঠেছে। পল্লবিত হয়ে উঠেছে কস্মিনকালেও-প্রচলিত-না-থাকা 'সুপ্রাচীন' ভূতুড়ে ভাষাগুলোর তুলনা-মূলক আলোচনার সূত্রে।

লুক্ স্ক্র্যাফ্টনের লেখা বইয়ে প্রকাশিত কিছু তথ্যের বিশ্লেষণ

লুক্ স্ক্র্যাফ্টন-এর লেখা A History of Bengal Before and After the Plassey (1739—1758) বইটা লণ্ডনে প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৬৩ সালে। বইটির প্রণিধানযোগ্য অংশটা রাখছি। তিনি লিখেছেন :

"The Bramins say that Brumma, their law-giver, left them a book, called the Vidam, which contains all his doctrines and institutions. Some say the original language in which it was wrote is lost, and that at present they only possess a comment thereon, call the Shastra, which is wrote in the Sanscrit language, now a dead language, and known only to the Bramins who study it. In this they are taught to believe in one Supreme Being, who has created a regular gradation of beings; some superior and some inferior to man; in the immortality of the soul, and a future state of rewards and punishments, which is to consist of a transmigration into different bodies, according to the lives they have led in their pre-existent state. ······and though all the gentoos of the continent from Lahore to Cape Comorin, agree in acknowledging

the Vidam, yet they have greatly varied in the corruptions of it; and hence different images are worshipped in different parts; and the first simple truth of Omnipotent Being is lost in the absurd worship of a multitude of images, which at first were only symbols to represent his various attributes."

উদ্ধৃতিটা নিঃসন্দেহে মূল্যবান। কারণ ঐ উদ্ধৃতি থেকে এমন সব তথ্য বেরিয়ে আসছে যা অভিনব এবং চাঞ্চল্যকরও বটে। লেখকের ঐতিহাসিক হিসাবেও খ্যাতি ছিল। যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে উদ্ধৃতিটা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কয়েকটি তথ্য পেয়ে গেলাম। এক, সতেরো শ' তেষট্টি সালে বেদ লেখার পরিকল্পনার জন্মই হয়নি। দুই 'বেদ' এই শব্দটিও পরিকল্পিত বইয়ের নাম হিসাবে তখনও পর্যন্ত স্থিরীকৃত হয়নি। তিন, তখনও পর্যন্ত যে বই লেখার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল সেটা বেদ নয়—উপনিষদ। কারণ 'বিদম' পরিচয় দিয়ে লেখক যে বইয়ের প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন তার সঙ্গে বেদের কোনও সম্বন্ধই নেই—আছে উপনিষদের। চার, Omnipotent Supreme Being-এর তত্ত্বসমৃদ্ধ সেই বইয়ের নাম তখনও পর্যন্ত 'উপনিষদ' রাখা হয়নি—রাখা হয়েছিল 'বিদম' (Vidam)। পাঁচ, ঐ 'বিদম্' নামক কল্পিত বইয়ের 'উপনিষদ' নামকরণ হয়েছিল সতেরো শ' তেষট্টি খ্রীস্টাব্দেরও পরে। ছয়, সর্বোচ্চ সত্তা, আত্মার অবিনশ্বরত্ব, জন্মান্তরবাদ এবং কর্মফলের 'তত্ত্বসমৃদ্ধ, ঐ 'বিদম' (অর্থাৎ উপনিষদ) লেখার পরিকল্পনাই প্রাথমিক-ভাবে নেওয়া হয়েছিল। বেদ লেখার সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয়েছিল পরে। সাত, 'ব্রহ্মার কাছ থেকে পাওয়া' বলে কথিত 'বিদম'-নামক বইয়ের আদিরূপের সন্ধান ঐ সতেরো শ' তেষট্টি সালেও পাওয়া যায়নি—যেটা পাওয়া গিয়েছিল সেটা ঐ 'বিদম্'-এর টীকাভাষ্য। আট, সর্বোচ্চ সত্তা (Supreme Being)-এর ভারতীয় সংস্করণ 'ব্রহ্ম'-নামটি উদ্ধৃতিটিতে পাচ্ছিনা। তাই সিদ্ধান্ত নিতেই হয় 'ব্রহ্ম' নামটাও সতেরো শ' তেষট্টি

সালে সৃষ্টি করা হয়নি। যদিও 'ব্রহ্মা'-শব্দের 'সৃষ্টি' ঐ সালের আগেই হয়ে গিয়েছিল। সিদ্ধান্ত নিতেই হয় ঐ ব্রহ্মা(পুং)কে নিরাকার (ব্যাকরণগত এবং অর্থগত) বানিয়ে নিয়েই ঐ ব্রহ্ম-নামক ক্লীবলিঙ্গের 'জন্ম' এবং নামকরণ হয়েছিল। আর তা হয়েছিল সতেরো শ' তেষট্টি সালেরও পরে। বাইবেলীয় আব্রাহাম (BRHM) শব্দ থেকে বানিয়ে নেওয়া আঠারো শতকীয় 'ব্রহ্মণ্' শব্দের ওপর 'পুরুষত্ব' আরোপ করা হয়েছিল আগে—ক্লীবত্ব আরোপ করার ব্যবস্থা হয়েছিল পরে। একই শব্দ 'ব্রহ্মণ্' লিঙ্গভেদে কখনও হলেন ব্রহ্মা—কখনও হলেন ব্রহ্ম। একটা শরীরী—অন্যটা অশরীরী। নিঃসন্দেহে বিচিত্র ব্যবস্থা।

আসছে আরও কয়েকটা প্রশ্ন। 'বিদম'-এর আদিরূপের সন্ধান তখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি কেন? তবে কি ঐ আদিরূপ পরবর্তীকালে তথাকথিত বানপ্রস্থ-আশ্রমের কোনও কুঠরীতে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল? তবে কি 'বিদম'-এর আদিরূপটা সংস্কৃত ভাষায় লিখতে তখনও পর্যন্ত মিথ্যার কারবারীরা ভরসা পাননি? তাইত আসছে।

'উপনিষদ'কে সাজানো হয়েছিল কিছু 'দার্শনিক' তথ্য এবং কিঞ্চিৎ 'বিজ্ঞান' দিয়ে। বিমূর্ত চিন্তার প্রচণ্ড অগ্রগতি যেন ঐ বই লেখার পূর্বেই ঘটে গিয়েছিল এমন একটা ধারণা করে নিতেই হয় ঐ বই পড়ে। পণ্ডিতেরাও সেই ধারণাই করে নিয়েছেন। বিমূর্ত চিন্তার আধার ঐ বই লেখার পরে মিথ্যার চক্রীদের কি কিছু খট্‌কা লেগেছিল? ঐ বই সবচেয়ে প্রাচীন বলে প্রচার করলে অনেকে সন্দেহ করে বসবেন—এ-সন্দেহ কি তাঁদের এসেছিল? এবং সে-সন্দেহ আসার সূত্রেই কি দ্বিতীয় চিন্তার পরে ঐ বেদ-রচনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল? 'দর্শনে'র মাত্রাটা কমিয়ে 'বিজ্ঞান'-এর রূপক বানানোর কায়দাটা কি ঐজন্যই ব্যবহার করা হয়েছিল ঐ বেদে? তাইত আসছে।

বেদ লেখা হল একটি পরিকল্পিত ভাষায়

বেদ লেখা হল একটি পরিকল্পিত ভাষায়। তৈরী করে নেওয়া সেই

পরিকল্পিত ভাষার নাম পরবর্তীকালের পণ্ডিতেরা দিলেন 'বৈদিক'। সত্যিই ত' বইয়ের নাম থেকেই ত ভাষার নাম হয়! উদ্ভট, অপ্রচলিত কিম্ভূতকিমাকার শব্দের শোভাযাত্রার নাম ঐ বেদ। ঔদ্ভট্য না থাকলে কেউ যে প্রাচীন বলে মানবেনই না। তাই ঐ ব্যবস্থা। আজগুবি কাণ্ডকারখানার কথাও কিছু কম নেই বেদে। সে ত' থাকতেই পারে। বাইবেলেও কি কিছু কম আছে? পারম্পর্যহীনতা, একই বক্তব্যের বিরক্তিকর পৌনঃপুনিকত্ব, প্রচলিত শব্দের উদ্ভট অর্থে ব্যবহার সবই আছে ঐ বেদে। যেমন আছে ঐ বাইবেলেও। ভাষাটা কি বোধগম্য? না, তা কি করে হবে? সাড়ে তিন হাজার বছরের পুরানো ভাষা আজকের যুগেও বোধগম্য হবে এমন আশা করাটাই ত' বাতুলতা। শ' খানেক বছরের পুরানো ভাষাই যেখানে কসরৎ করে পড়তে হয়। মিথ্যার কারবারীরা কায়দাটা ভালোই নিয়েছিলেন।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে 'রচিত' বলে প্রচারিত বেদ লেখা ত' হল। কিন্তু বেদের বিচিত্র বিকটদর্শন শব্দের অর্থোদ্ধার কে করবেন? আর অর্থোদ্ধার না করে পড়তেই-বা যাবেন কে? তাই সে-ব্যবস্থাও হয়ে গেল। মধ্যবর্তী খাড়া করা হল কল্পিত সায়নাচার্যকে। খাড়া করা হ'ল মহীধর নামক কল্পিত চরিত্রটিকেও। ঠিক হল ওঁরাই সহজ সংস্কৃতে বাৎলে দেবেন ঐ-সব উদ্ভট শব্দের অর্থ। একটি মহান কাজ করলেন 'দুজনে'। ওঁরা না থাকলে আমরা বৈদিক শব্দসমুদ্রে মণিমুক্তা না পেলেও খাবি যে খেতাম তা জোর দিয়েই বলা যায়। জাল বইয়ের আবার জাল টীকাকারের দরকার হয়। প্রাচীন যুগের টীকাকার বলে কথা! টীকাগুলো সংস্কৃতে না লিখে রাখলে লোকে যে সন্দেহ করে বসবে। তাই ঐ ব্যবস্থা।

বেদের 'তৈরী করে নেওয়া' শব্দ

কৃত্রিম শব্দও প্রচুর তৈরী করা হয়েছিল ঐ বেদে। দু-একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। 'পর্জন্য' শব্দটা যে কৃত্রিম এটা বুঝে নিতে খুব

একটা পাণ্ডিত্যও লাগেনা। 'বৃষ্টি'র 'ব' পরিবর্তিত হয়ে হল 'প' আর ঐ 'প'-এর সঙ্গে ঋ-এর গুণ 'অর্' যোগ করা হল। মূর্ধণ্য 'ষ'-এর বদলে আনা হল বর্গীয় 'জ' কে—তারপর কোত্থেকে আনা হল—কেন আনা হল জানিনা 'অন্য'-প্রত্যয় যোগ করার ব্যবস্থা হল। বৈদিক পণ্ডিতদের শব্দের ধাঁধাসৃষ্টির পরিকল্পিত বজ্জাতির ঠেলায় তৈরী হল 'পর্জন্য'। সাংকেতিক ভাষায় ঐ-জাতীয় বর্ণচোরা শব্দ তৈরী করে নেওয়ার রেওয়াজ আছে। গোপন সূত্র অনুযায়ী অক্ষরের পরিবর্তন ঘটিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্বোধ্য শব্দ বানানো হয়। বানাতে হয়। কারণ রাষ্ট্রের দেশরক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে গোপনীয়তার দাম খুবই বেশী। কোনও গোপন খবর বা তথ্য শত্রুপক্ষের হাতে পৌঁছে গেলেও যাতে ফাঁস না হয়ে যায় সেটা দেখতে হয়। আর সে-বিপদ থেকে বাঁচার জন্য সাংকেতিক দুর্বোধ্য শব্দ তৈরী করার আয়োজনও করতে হয়। প্রশ্ন হল, বৈদিক ভাষায় ঐ কারবারের দরকারটা পড়তে যাবে কেন? সে যাই হোক, পণ্ডিত-ঠকানো এ-রকম প্রচুর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ঐ বেদে। আর সে-সব শব্দের মহিমাও ছিল প্রচণ্ড। ত্রিবাঙ্কুর থেকে পণ্ডিত দৌড়ে এসেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মাত্র বৈদিক শব্দের ব্যাখ্যা করতে। শব্দের নাম ছিল বৃষ্ণি। বলা বাহুল্য, সেটি আর একটি পর্জন্য-মার্কা শব্দ। ভাগ্যিস 'কৃষ্টি' থেকে তাঁরা 'গর্জন্য' শব্দটা বানাননি। তাহলে প্রাচীন 'গর্জন্য' সংস্কৃতির গর্জনে কান পাতা দায় হত। আর একটা কথা। পণ্ডিতেরা এই সোজা ব্যাপারটাতে কেন যে 'ভর্জন্য' (= দৃষ্টি) দেননি সেইটাই বিস্ময়ের। ভালো কথা, স্বনামধন্য ঐ পণ্ডিতের নামটাই বলা হয়নি। মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী ঐ মহান কর্মব্যপদেশে কলকাতা এসেছিলেন।

মহাপণ্ডিত উইলসন সাহেব 'পর্জন্য'—শব্দের উদ্ভট ব্যুৎপত্তির গল্পটাকে বিশ্বাস করে নিয়েছেন। মেনে নিয়েছেন ঐ মিথ্যাটাকে। না মেনে উপায়ও ছিলনা তাঁর। তিনি যে মিথ্যার চক্রীদেরই একজন

ছিলেন। বিভ্রান্তি আনার জন্য তিনি ঐ শব্দটির আর একটি উদ্ভট ব্যুৎপত্তির গল্পও শোনালেন। তিনি লিখলেন:

"Sayana cites Yaska, Nirukta, 10.10 for various fanciful etymologies, as *par* derived from *trip* to satisfy, by reversing the final consonant of the latter, and rejecting its initial, *janya* may imply either victor, *jeta* or generator, *janayita*, or impeller, *prajayita* of fluids, *rasanam*".

প্রশ্ন আসছেই। উইলসন সাহেব যাস্ক-নির্দেশিত ব্যুৎপত্তির তথ্যটাকে অলীক চিন্তাপ্রসূত বলে মনে করে বসলেন কেন? তবে কি 'উণাদি-সূত্র-বিহিত' ব—> প; ঋ—> অর্; য—> জ—এর আমদানীর উদ্ভট গল্পটাকে কিছুটা সুচিন্তাপ্রসূত বলে চালাবার জন্যই ঐ বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা তিনি করেছিলেন? আর একটা কথা। etymology দুটো যদি ভ্রান্তিই হবে তবে তা যত্ন করে লেখারই বা দরকার পড়ল কেন?

বেদে ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দের ছড়াছড়ি কেন?

তথাকথিত ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দ একটু বেশী মাত্রায় ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে একটি মহান কর্ম পরিকল্পিত ঐ ঋগ্বেদে করা হয়েছিল। সতেরো শ' ছিয়াশি সালে তৈরী করে নেওয়া আর্যতত্ত্বের প্রমাণ যোগানোর দায়িত্ব যে ঐ ঋগ্বেদের ওপরেই বর্তেছিল তাই ঐ ব্যবস্থা। সে-সব শব্দের বেশীর ভাগই ভারতীয় ভাষায় গৃহীত হয়নি। বেঁচে থাকার প্রশ্নও ছিল অবান্তর। গৃহীত হয়নি কারণ কৃত্রিম শব্দকে ধাতস্থ করে নেওয়া জীবিত ভাষার স্বভাবধর্ম নয়। তা সত্ত্বেও ঐ জাতীয় বেশ কিছু শব্দ যে অভিধানের কলেবর বাড়ানোর জন্য ঢুকে বসেছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। সে-সব শব্দের লৌকিক ব্যবহার নেই। নিছক পাণ্ডিত্য ফলানোর জন্য কেউ কেউ ব্যবহার করে বসেন। বলা

বাহুল্য কালেভদ্রে। এবং সেইটাই রক্ষে। ঋগ্বেদে ব্যবহার করা তথাকথিত ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দের তালিকা এ-বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করব। দুর্গন্ধযুক্ত নামের অধিকারী 'শুনঃশেপ'-ঋষির শুনঃ-অংশটা ইন্দো-ইউরোপীয় আর ইংরাজী shape-এর ইঙ্গিতাত্মক বৈদিকায়নের নাম 'শেপ'।

মহাপণ্ডিত ম্যাক্সমুলারের কীর্তি

ম্যাক্সমুলার সাহেব ঋগ্বেদের ভূমিকার এক জায়গায় লিখলেন:

"The religious traditions of the Persians or the Zorastrians have been traced back to their source in the Veda. Many of the most obscure grammatical forms of the arrow-headed inscriptions of Darius and Xerxes have been deciphered by means of the Veda."

ম্যাক্সমুলার সাহেব ঋগ্বেদের অনুবাদই শুধু করেননি। নানান তত্ত্বও তিনি হাজির করেছিলেন। প্রাচীন পারসিক বা জরথুষ্ট্রীয় ধর্মীয় ঐতিহ্যের উৎস তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন ঐ ঋগ্বেদের মধ্যে। তা ত' পাবেনই। অর্ডারী লেখা ঋগ্বেদটা যে সেইভাবেই লেখানো হয়েছিল। আর শুধু ঋগ্বেদই-বা কেন? জরথুষ্ট্রও ত' আর একটি তৈরী করা কাণ্ডকারখানা। তথাকথিত বৈদিক ভাষার মত 'আবেস্তার ভাষা' (বইয়ের নাম থেকেই যে ভাষার নাম হয়!)-ও যে তৈরী করে নেওয়া—এটা কি বুঝে নিতে কষ্ট হয়? শ্রুতিস্মৃতির আজগুবি খেলা কি শুধু ভারতেই হয়েছিল? তা ত নয়। পারস্যেও হয়েছিল। সে-খেলা খেলেছিলেন কারা? ঐ একই জাতের পণ্ডিতেরা। সবই ঐ ইউরোপের। এক খেলা—এক খেলোয়াড়। মাঠটাই শুধু আলাদা। আবেস্তার অংশগুলোর নাম যস্ন, বিস্‌পরদ্, বেন্দিদাদ্, যশ্‌ত্ আর খোর্দ আবেস্তা। এগুলোর মধ্যে যস্ন আর বিস্‌পরদ্ হচ্ছে শ্রুতি অর্থাৎ revelation

এবং বেন্দিদাদ্ অংশটা স্মৃতি। 'বৈদিক ভাষা' আর 'আবেস্তার ভাষা'র মধ্যে বেশ মিলও আছে। সে-সব মিলের কথা বলার দরকার বোধ করছিনা। পণ্ডিতেরা ঐ সাদৃশ্য নিয়ে অনেক আলোচনাই করেছেন। করেছেন সংগঠিত মিথ্যার (organised lie) স্বরূপটা না বুঝে। সুপরিকল্পিত বেদ এবং আবেস্তা দুটোই যে মিথ্যার কারবারীদের তৈরী করে নেওয়া এইটাই কেউ বুঝতে পারেননি। ভাষার মিল আর শব্দের মিল রাখা হয়েছিল পরিকল্পিতভাবেই। রাখা হয়েছিল পণ্ডিতদের বিভ্রান্ত করার জন্যই। সিদ্ধান্ত আর একটি আসছে—ঐ কীলকাকৃতি (cuniform) লিপিটাও একটি জালিয়াতি। আসলে দেশে দেশে সুপ্রাচীন ভাষা তৈরী করে নেওয়ার খেলাটা মিথ্যার কারবারীরা সুপরিকল্পিত ভাবেই খেলেছিলেন। খেলেছিলেন ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রাচীনতা এবং সার্বদেশিকতা প্রতিপন্ন করার তাগিদেই। এবং সে-খেলার একজন পাকা খেলোয়াড় ছিলেন ম্যাক্সমুলার সাহেব স্বয়ং। প্রচণ্ড পাণ্ডিত্যের ছদ্মবেশের আড়ালে ঐ-টাই তাঁর অ'সল পরিচয়। তিনি ছিলেন মিথ্যার কারবারীদের এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। কোলব্রুকের যোগ্য উত্তরসাধক।

পরম পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার সাহেব বেশ কিছু গ্রীক পৌরাণিক নামের সঙ্গে ঋগ্বেদের কিছু নামের প্রচণ্ড মিলের তত্ত্ব খাড়া করেছিলেন। ঋগ্বেদের 'অর্জুনি' নাকি গ্রীসে গিয়ে 'আর্জিনোরিস' হয়ে বসেছিল! আমাদের 'বৃষয়' নাম থেকেই নাকি ওঁদের ব্রিসেইস। দহনা থেকে দফ্নে, উষস্ থেকে এওস, সরমা থেকে হেলেন, সরণ্যু থেকে এরিনিস, অহনা থেকে এথেনা—সবই নাকি ভারত থেকে গ্রীসে পাড়ি দিয়েছিল। পাড়ি দিয়েছিল আমাদের ঋভু বা অর্ভুরাও—ওরা গ্রীসে গিয়ে একাকার হয়ে হয়েছিল অর্ফিউস। ম্যাক্সমুলারের পাণ্ডিত্যের প্রচণ্ডতা স্বীকার করে নিতেই হয়। উল্টোপাল্টা তত্ত্ব তিনি কম দেননি। এক্ষেত্রে একেবারে উল্টোতত্ত্ব দিতে গিয়েই ভদ্রলোক গোলমাল করে ফেলেছিলেন। ঋগ্বেদ পূর্ণতঃ প্রকাশিত হওয়ার অনেক আগেই গ্রীক মিথলজি লেখানোর আয়োজনটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। ঐ মিথলজি প্রকাশিত হয়েছিল

ঋগ্বেদ পূর্ণতঃ প্রকাশিত হওয়ার অনেক আগেই। আসলে ঋগ্বেদই বলুন—বাইবেলই বলুন—গ্রীক মিথলজিই বলুন সবই কয়েকটি রাষ্ট্রের যৌথ উদ্যোগে লেখানো 'ডিপার্টমেণ্টাল আণ্ডারটেকিং'। ধ্বনিভগ্নাংশগত কিংবা কষ্টকল্পিত শব্দের মিল বইগুলোতে রাখা হয়েছিল পরিকল্পিতভাবে —বিভ্রান্তিটাকে পাকাপোক্ত করে তোলার জন্যই। আর সে-উদ্যোগের একজন মহান উদ্যোগীপুরুষ ছিলেন স্বয়ং ম্যাক্সমুলার সাহেব।

বেদের পুঁথি হয় না।

বেদের পুঁথি হয় না। বেদের প্রাচীন পুঁথি থাকতেই পারেনা। থাকার প্রশ্নই ওঠেনা। কারণ বেদ-সম্পর্কে যে গল্পটা বানানো হয়েছিল তাতে ঐ বইয়ের পুঁথির সংস্থান ছিল না। বেদ লিপিবদ্ধ হলে রাজ্যের অশুদ্ধি ঢুকে বসবে—এ-আশংকা ছিল। আর তা ছিল বলেই ঐ বই লিখে রাখার ব্যবস্থা হয়নি। বেদ যাতে কোনওক্রমে লিপিবদ্ধ না হয় তারজন্য 'বিধান' ছিল যাঁরা বেদ লিপিবদ্ধ করবেন তাঁরা নরকগামী হবেন।

> বেদবিক্রয়িনশ্চৈব বেদানাং চৈব লেখকাঃ
> বেদানাং দূষকাশ্চৈব তে বৈ নিরয়গামিনঃ।

বলা বাহুল্য, তথাকথিত ঐ বিধান থাকার গল্পটাও মিথ্যার কারবারীদেরই তৈরী করে নেওয়া।

বেদ মানতে গেলে বেদ-সম্পর্কিত তথ্যগুলোকেও বিশ্বাস করার প্রশ্ন ওঠে। আর তা করতে গেলেই বেদের পুঁথির তথ্যটা আজগুবি হয়ে দাঁড়ায়। আসলে বেদটাই প্রাচীন নয় তার আবার প্রাচীন পুঁথি থাকার প্রশ্ন ওঠেই বা কি করে?

কুক্ষিগত গুপ্তজ্ঞান—বেদ-উপনিষদ

বেদ এবং উপনিষদ নাকি যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের বিশেষ গোষ্ঠীর কুক্ষিগত গুপ্তজ্ঞান (esoteric knowledge) হিসাবেই

রক্ষিত হত। অন্ততঃ পণ্ডিতদের সেই রকমই ধারণা। 'ভাগ্যবান' ব্রাহ্মণ ছাড়া উপনিষদের জ্ঞান নাকি অন্য ব্রাহ্মণেরা পেতেননা। ঠিক তেমনি 'ভাগ্যবান' ছাড়া বেদের জ্ঞানও নাকি অন্য ক্ষত্রিয়েরা পেতেন না। গুপ্তজ্ঞান ছড়িয়ে পড়ার ভয় ছিল। আর তা ছিল বলেই নাকি ওসব লেখা হতনা। সংস্কৃতের লিপিহীন অবস্থায় লেখার প্রশ্নই ছিল অবান্তর। পরে যখন লিপির আবিষ্কার হল তখনও বেদ-উপনিষদ লিখে রাখার ব্যবস্থা হয়নি। বেশ সুন্দর গল্পটা বানানো হয়েছিল। তবে গল্পকার শেষরক্ষা করতে পারেননি। গল্পের দারা শীকোহ্ কাশ্মীরে গিয়েই গল্পটাকে ডুবিয়ে দিলেন। তিনি উপনিষদগ্রন্থাবলী দেখে বসলেন। নিঃসন্দেহে বিচিত্র সংবাদ! যে 'বই' লেখার ব্যবস্থাই হয়নি সেই কল্পিত 'বইটা' তিনি শুধু দেখেই ক্ষান্ত হননি—বইটির ফারসী অনুবাদ করার ব্যবস্থাও তিনি করে বসলেন। তথাকথিত গুপ্তজ্ঞানী ক্ষত্রিয়েরা তাঁদের মহাজ্ঞানের 'মনোপলি'টা নষ্ট হতে দেখেও কিছুমাত্র বিচলিত হয়েছিলেন এমন খবর গল্পটিতে রাখা হয়নি। অথচ রাখা উচিত ছিল।

নানান পণ্ডিতের নানান কীর্তি

বেদের বিচিত্র ভাষার বিচিত্রতর শব্দগুলোর ব্যাখ্যা এক এক পণ্ডিত এক এক কায়দায় করেছেন। 'সায়নাচার্য' এক রকম ব্যাখ্যা করলেন ত' উইলসন সাহেব আর এক কায়দায় ব্যাখ্যা করে বসলেন। ম্যুর সাহেব আবার অন্যসুরে কথা বললেন। 'নিঘণ্টু'—নামক উদ্ভট নামের 'প্রাচীন' অভিধানে পাওয়া গেল শব্দের ভিন্নতর অর্থ। পণ্ডিতচূড়ামণি ম্যাক্সমুলার সাহেব সব ব্যাখ্যাকে নস্যাৎ করে পাণ্ডিত্যের অভিনয় করে খেলাটাকে বেশ জমিয়ে তুললেন। উত্তরসূরী পণ্ডিতেরা শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে আর এক প্রস্থ গোলমাল পাকালেন। এই হচ্ছে বেদ-ব্যাখ্যার ইতিহাস। নানান দেশের নানান পণ্ডিতের সুপরিকল্পিত বেদ-চর্চা এবং ব্যাখ্যানের ফলে আর কিছু হোক আর না হোক বেদের বিশ্বাসযোগ্যতাটা যে বেড়ে গেছে এটা মানতেই হয়। বেদ বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে—'প্রামাণ্য' হয়ে উঠেছে ঐসব পণ্ডিতের চেষ্টাতেই।

Revelation-এর সংস্কৃত প্রতিশব্দ শ্রুতি!

প্রচারের ঠেলায় বেদউপনিষদ প্রাচীন বনে গেল। পবিত্রতা আরোপ করার গুঁতোয় সে-প্রাচীনতা হল বিশ্বাসযোগ্য। Revelation নামক ইংরাজী শব্দের অনুবাদ হিসাবে তৈরী করে নেওয়া 'শ্রুতি' শব্দটিও বেশ সুন্দর কাজে লাগল। সেমিটিক সব ধর্মের ধর্মগ্রন্থ যদি revelation হতে পারে ত' মহান আর্যদেরটাই বা না হবে কেন? সংহিতা-ব্রাহ্মণ-আরণ্যকসহ বেদ আর উপনিষদের ওপর 'শ্রুতি' শব্দ আরোপ করাতে বইদুটোর আভিজাত্যও বেড়ে গেল। শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী বলে কথা! অবিশ্বাস করার প্রশ্নই যে ওঠে না! পণ্ডিতেরাও ধর্মপ্রাণ হয়ে গেলেন। সব কিছু বিশ্বাস করে বসলেন। আর একটা কথা। 'রাম না হতেই রামায়ণে'র মত বেদ ছাপানোর আগেই বেশ কয়েকটি বইয়ে ঐ বেদের প্রসঙ্গ রাখা হয়েছিল। বলা বাহুল্য সে-সব বই তৈরী করে নেওয়া। অর্থাৎ জাল। তবে বেদের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলতে যে ঐসব পূর্ব-প্রকাশিত বইগুলো সাহায্য করেছিল এটা মানতেই হয়। তথ্যদৃষ্টে বুঝতে কষ্ট হয় না কি বিরাট সুসংহত প্রয়াসের ফলে ঐ বেদ-উপনিষদ রচনা সম্ভব হয়েছিল। সম্ভব হয়েছিল ওই বেদ-উপনিষদকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা।

'শ্রুতি' বলে চালানো হলেও ঋগ্বেদের নানা অংশের নানান লেখকের নাম জানানোর ব্যবস্থাও হয়ে গেল। বিচিত্র সব নামের ঋষিদের লেখা বলে চালানো হল ঐ বেদ। নিঃসন্দেহে মজার ব্যাপার। একাধারে শ্রুতি এবং ঋষি-প্রোক্ত বেদের মহিমা অপার।

ঋগ্বেদ-রচনার নেপথ্য শিল্পী—কে বা কারা?

ঋগ্বেদে 'লাঙ্গল'-শব্দটির ব্যবহার আছে (৪।৫৭।৪)। আছে লাঙ্গলাগ্র-বাচক 'ফাল'-শব্দেরও ব্যবহার। (উৎস—বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি—লেখক নৃপেন্দ্র গোস্বামী)। আছে কেন এ প্রশ্ন উঠবেই। উত্তরটাও খুব একটা দুরূহ কিছু নয়। ঋগ্বেদ-রচনার পশ্চাতে থাকা

আধুনিক বাঙ্গালী নেপথ্যশিল্পীদের অবদান যে ঐসব শব্দ তা বুঝে নিতে কিছুমাত্র কষ্ট হয়না। বাংলার 'লাউ' বৈদিক ছদ্মবেশে হয়েছে 'অলাবু'। বাংলার 'কুল' ব-কে আত্মঃস্থ করে নিয়ে হয়ে বসেছে 'কুবল'। পূর্ববঙ্গের জাম্বুরা (=বাতাবী লেবু)-ও বাদ যায়নি। বৈদিক পোষাকে সজ্জিত হয়ে ঐ জাম্বুরা 'জাম্বীল' সেজে বসে আছে ঐ ঋগ্বেদে। সম্ভবত পদ্মাপারের কোনও সদ্-ব্রাহ্মণের কৃপায়। ভালো কথা, ঐ-বস্তুর ভারতে আগমনত সাম্প্রতিক ঘটনা। তাহলে? অন্ধ্র মুলুকের 'গোধুম' (=গম)-ও ঠাঁই পেয়েছে ঐ ঋগ্বেদে। সম্ভবত তেলুগুভাষী কোনও নেপথ্য-শিল্পীর অত্যুৎসাহের সাক্ষ্য বহন করার জন্যই। তামিল ভাষার অরিস (=চাল) বৈদিক নবকলেবরে 'ব্রীহি'। বিরক্তিকর উদাহরণ বাড়িয়ে প্রবন্ধের আকৃতি বড় করার ইচ্ছা নেই। গুজরাতি 'খাদি' শব্দও ঢুকে বসে আছে ঋগ্বেদে। কারণটা বলাই বাহুল্য।

বৈদিক যুগের 'সব পেয়েছির আসরে' ছিল না বলে যে কিছুই ছিল না। বর্শার প্রচলনও নাকি ঐ যুগে ছিল। কিন্তু এটা ছিল—ওটা ছিল বলতে গেলেও কিছু নাম বানিয়ে নেওয়ার দরকার পড়ে। তাই নানান বস্তুর সুপ্রাচীন নাম রাখার আয়োজন করতেই হয়। নেপথ্য-শিল্পী রসিক বাঙ্গালী বর্শার 'সরু' ধারালো মুখের স-এর তালব্যীকৃত উচ্চারণের ব্যবস্থা করে বসলেন। তৈরী হল 'শরু'। আর ঐ 'শরু'-দিয়েই ঐ বৈদিক প্রহরণের নাম ঠিক হল। 'ছুঁচ'-এর ব্যবহারও বৈদিক যুগে কিছু কম হত না। সত্যিই ত ঐ বস্তুর ব্যবহারের লিখিত নজীর কিছু না থাকলে লোকে যে আজেবাজে সন্দেহ করে বসবে। তবে কি তখনকার মানুষ পোষাক-আসাক কিছুই পড়তেন না? তাই ঐ ছুঁচ-এর তৎকালীন অস্তিত্বের স্বপক্ষে বেদে বক্তব্য রাখতে হল। তাছাড়া মোহেন-জো-দড়ো-হরপ্পার প্রত্ন-উপকরণের মধ্যে ছুঁচ-এর চাক্ষুস 'প্রমাণ' রাখার ব্যবস্থা যাঁরা পরবর্তীকালে করে রেখেছিলেন তাঁরা কি ও-বস্তুর বৈদিকযুগীয় অস্তিত্বের স্বপক্ষে কিছু না লিখে থাকতে

পারেন? প্রাচীনতর বলে প্রচারিত সিন্ধুসভ্যতায় যখন ছুঁচ-এর ব্যবহার ছিল তখন কি বৈদিকযুগে তা না থাকলে চলে? তাই সে-ব্যবস্থাও হয়ে গেল। বেশ (=পোষাক) তৈরী করতে ছুঁচ-এর দরকার ত' পড়েই। ঋগ্বেদী পরিভাষা তৈরী হয়ে গেল 'বেশী'। বেশী নমুনা লিখে বিরক্ত না করে প্রসঙ্গটা এখানেই শেষ করছি।

তবে কি অন্য কোনও বিস্মৃত লিপিতে বেদ লেখা হয়েছিল?

লিপির সন্ধান নেই অথচ সাহিত্যের ছয়লাপ আছে বৈদিক সাহিত্য-সম্পর্কিত এই আজগুবি তথ্য সম্পর্কে ডাঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। করেছেন এক বিভ্রান্তির ওপর আর এক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্যই। একটি প্রকাণ্ড মিথ্যার পাশাপাশি আর একটি বিচিত্র মিথ্যা বানাবার তাগিদে। তাঁর ঐ সন্দেহটা যদি সত্যি-সত্যিই আন্তরিক হত তবে তিনি ঐ সন্দেহের সূত্রেই সত্যে পৌঁছতে পারতেন। তা না করে আজগুবি একটি তথ্য ঐ ভাষাটির ওপর তিনি আরোপ করে বসলেন কেন? তিনি বলেছেন লিপিহীন ভাষায় ঐ ধরনের বিরাট সাহিত্য রচনা করা সম্ভব ছিলনা। অন্য কোনও লিপি (ব্রাহ্মী বা খরোষ্ঠী নয়) নিশ্চয়ই তখন প্রচলিত ছিল আর সেই লিপিতেই ঐ সাহিত্য রচিত হয়ে থাকবে এবং সে-লিপি পরবর্তীকালে নিশ্চয়ই বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে থাকবে—কোনও চিহ্ন না রেখেই। নিঃসন্দেহে বিচিত্র সিদ্ধান্ত! আজগুবি তথ্যকে সন্দেহ করার নামে 'আজগুবিতর' তথ্যের আমদানি একেই বলে!

'আজগুবিতর' তথ্যের ঐ কল্পিত লিপির সন্ধান করতে গিয়ে পেয়ে গেলাম এক মহামহোপাধ্যায়কে। মহীশূরের শামা শাস্ত্রীকে। প্রচণ্ড পণ্ডিত ঐ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদিত আদ্যন্ত প্রতারণা 'অর্থশাস্ত্রে' পেয়ে গেলাম ঐ লিপির সন্ধান। ঋগ্বেদ ঠিকমত প্রকাশ করতে ৬৪টি ধ্বনি-একক-সমৃদ্ধ লিপির প্রয়োজন ছিল। যজুর্বেদের ছিল তেষট্টিটির। আর শাস্ত্রীমশাইয়ের 'আবিষ্কার' ঐ 'অর্থশাস্ত্রে'র লেখক তথাকথিত

চাণক্য ওরফে বিষ্ণুগুপ্ত ওরফে কৌটিল্য তাঁর ঐ বইয়ের এক জায়গায় লিখলেন ঐ গ্রন্থ আদিতে এমনই একটি লিপিতে লেখা হয়েছিল যার অক্ষর সংখ্যা ছিল তেষট্টি। সত্যিই ত, এই লিপিরই যে খোঁজ করছিলাম। ১৯০৯ সালে ঐ 'অর্থশাস্ত্র' প্রকাশিত না হলে যে ঐ লিপির সন্ধানই মিলত না। শাস্ত্রীমশায়ের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতেই হয়। ভালো কথা, ভদ্রলোকের প্রতারণার প্রমাণ এ বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে লেখার ইচ্ছা থাকল।

লিপির নামে ঢুঁ ঢুঁ—ইটিমলজি আর ফোনেটিক্স্-এর ছয়লাপ

লিপির নামে ঢুঁ ঢুঁ—নিরক্ষর বৈদিক এবং সংস্কৃত ভাষাভাষীরা নাকি শব্দের ব্যুৎপত্তি নিয়ে বড্ড বেশী মাথা ঘামাতেন। আর ঐ ব্যুৎপত্তির জ্ঞানের নাম নাকি 'নিরুক্ত' দেওয়া হয়েছিল। ছান্দোগ্য উপনিষদে (VII, ১, ২) শাস্ত্রটিকে রসিকতা করে 'দেববিদ্যা' বলেও চালানো হয়েছে। শুধু তাই নয়। অক্ষরের সন্ধান না থাকলেও শব্দের উচ্চারণ শেখার প্রচণ্ড আয়োজন নাকি সেযুগে হত আর ঐ উচ্চারণশিক্ষার নাম তখন নাকি ছিল 'শিক্ষা'। মজার কথা আরও আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে (VII, ১, ২) তথাকথিত শিক্ষার 'ঔপনিষদিক' পরিভাষা হিসাবে 'ব্রহ্মবিদ্যা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আজগুবি তথ্য তৈরী করতে গিয়ে প্রচলিত শব্দের উদ্ভট অর্থ আরোপ করার নজীর কম নেই। আর ঐ ঔদ্ভট্যটাকেই প্রাচীনত্বের চিহ্ন মনে করে পণ্ডিতেরা আনন্দ পেয়েছেন। এ-রকম নির্মল আনন্দ তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই পেয়েছেন। একটি সুপ্রাচীন গ্রন্থ 'আবিষ্কৃত' হল। সে-গ্রন্থ থেকে জানা গেল সে-যুগে 'ডিম্ব'-শব্দের অর্থ ছিল 'বিপ্লব করার ইচ্ছা'। উদ্ভট অর্থ আরোপ করার মহিমায় পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন ঐ বই নিশ্চয়ই খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের লেখা। বইটার নাম 'কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র'। বলে রাখা ভালো, ঐ বইটার ওপরে 'গবেষণা' করে আজ পর্যন্ত কতজন যে ডক্টরেট পেয়েছেন তা জানতে গেলেও নাকি আর এক প্রস্থ গবেষণার দরকার।

বেদের মৌখিক প্রচলনের গল্প —'আল-বীরুনির' সাক্ষ্য

বেদ যে প্রাচীনকালে সত্যিসত্যিই এদেশে লোকের মুখে মুখে চলত আর ঐ বেদটা যে লিখে রাখার ব্যবস্থা ঐ প্রাচীনকালে আদৌ ছিলনা এ-সম্পর্কে মধ্যযুগের কোনও পণ্ডিত কি কিছু লিখে রেখেছেন ? না লিখে রাখলে ঐ বেদের 'মৌখিক প্রচলনে'র গল্পটা যে প্রমাণসিদ্ধ হয়না। তাই সে-ব্যবস্থাও হল। আরবী-জানা একটি ফারসী চরিত্র বানিয়ে নেওয়া হল—নাম দেওয়া হল আল-বীরুনি। প্রাচীন যুগের ফা-হিয়েন, হিউ-এন্-সাঙ, ই-ৎসিং-দের মধ্যযুগীয় 'সংস্করণ' ঐ আল-বীরুনি। প্রাচীন ইতিহাসের কাঁচা মাল বানিয়ে রাখার কাজে ঐসব কল্পিত চীনা চরিত্রগুলোর অবদান কিছু কম নয়। কম নয় মধ্যযুগের আল-বীরুনি, ফেরিস্তা নামক চরিত্রগুলোর অবদানও। যেযুগে সংস্কৃত-আরবী অভিধান ছিলইনা (বলে রাখা ভালো এখনও নেই) সেই যুগে এক ফারসী ভদ্রলোক আরবী ভাষায় ভারত সম্পর্কে এন্সাইক্লোপিডিয়া-চরিত্রের বিপুলায়তন গ্রন্থটি কোন যাদুবলে লিখে ফেললেন তা ভেবেও অবাক হতে হয়। ঐ 'আল-বীরুনি' বেদ-সম্পর্কে এক জায়গায় লিখলেন :

"They (Indians) do not allow the Veda to be committed to writing, because it is recited according to certain modulations, and they therefore avoid the use of the pen, since it is liable to cause some error, and may occasion an addition or a defect in the written text. In consequence it has happened that they have several times forgotten the Veda and lost it".

নিঃসন্দেহে মজার ব্যাপার। অতীতে নাকি মাঝে-মধ্যে ঐ বায়বীয় বেদটা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেত। পরে নাকি তা (ভগবৎকৃপায় কিনা জানিনা) বুদ্বুদ আকারে ভেসে উঠত। সম্ভবত বায়বীয় সত্তা

নিয়ে আর এক প্রস্থ বেঁচে থাকার জন্যই। উদ্ভট গল্প কিছু কম বানাননি ঐ আল-বীরুনি নামের আধুনিক ভাড়াটে লেখকটিও।

আল-বীরুনিকে সনাক্ত করে নিতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি। কারণ যেসব প্রাচীন বই-সম্পর্কে ঐ ভদ্রলোক নিখুঁত বিবরণ লিখেছেন সে-সব বইয়ের কোনটাই ঐ মধ্যযুগে 'রচিত' বা 'লিখিত' হয়নি। বইগুলো সবই আধুনিক কালে বানিয়ে নেওয়া।

শতাব্দীপরম্পরায় ঋগ্বেদের মৌখিক প্রচলনের গল্প।

The Ramakrishna Mission Institute of Culture-এর উদ্যোগে প্রকাশিত 'The Cultural Heritage of India'—গ্রন্থের সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ তিনজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। ঋগ্বেদসম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সম্পাদকমণ্ডলী যৌথ-উদ্যোগে লেখা ভূমিকার এক জায়গায় লিখলেন :

"The preservation of the entire text of the Ṛg-Veda intact by oral transmission throughout centuries is a unique phenomenon in the annals of world literature. This preservation of the text without corruption was ensured by introducing at least five modes of recitation of individual mantras from the Ṛg-Veda : (i) The sanhita-paṭha (continuous recitation) was the normal text governed by the rules of metre and rhythm. (ii) In the pada-paṭha (word recitation) each word in the Sanhita text was recited without sandhi (compound) in its own specific accent. (iii) The third was the Krama-paṭha (step recitation), where each word of the pada-paṭha was recited twice, being connected both with what precedes and what follows, e. g. ab, bc, cd etc.

(iv) The jaṭa-paṭha (woven recitation), which was based on the Krama-patha, recited each of its combination twice, the second time in a reverse order, e. g. ab, ba, ab ; bc, cb, bc ; etc. (v) In the Ghana-paṭha (compact recitation) the order was ab, ba, abc, cba, abc ; bc, cb, bcd, dcb, bcd ; etc. The significance of the complete measure of success achieved by this system in preserving the text from interpolation, modification, or corruption will be realised when we find that in the entire text of the Ṛg-Veda, covering 1028 hymns or about 10,560 mantras or about 74,000 words, there is only one variant reading, viz. its maṁśatoḥ for māṁśatoḥ in VII. 44.3."

প্রণিধানযোগ্য উদ্ধৃতিটা পণ্ডিতত্রয়ের কার লেখা তা জানার উপায় নেই। যিনিই লিখুন দায়িত্ব তিনজনেরই। উদ্ধৃতি-সম্পর্কে এইটুকুই বলব আজগুবি কথা পণ্ডিতেরা লিখলেও গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনা তা তাঁরা যত বড় পণ্ডিতই হোন না কেন। শ্রুতিপরম্পরা—গুরুশিষ্য-পরম্পরা—বংশপরম্পরায় মুখে মুখে চলতে চলতে হাজার হাজার বছর যে ঐ বেদ-টা বেঁচে ছিল এ-তথ্যটাই আজগুবি। আর ঐ আজগুবি উদ্ভট গল্পে বিশদ বিবরণ (details) লিখে বিশ্বাসযোগ্যতা আনার একটা ক্ষিপ্ত প্রয়াস ছাড়া উদ্ধৃতিটা আর কিছুই নয়।

ঋগ্বেদের মৌখিক প্রচলনের গল্পটা সবাই বিশ্বাস করেননি।

বেদের ঐ Oral transmission throughout centuries-এর বানানো গল্পটাকে সবাই বিশ্বাস করেননি। করেননি ডাঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও। ঋগ্বেদ সংহিতার ভূমিকার এক জায়গায় তিনি লিখলেন :

"স্মরণ শক্তির সাহায্যে ঋগ্বেদের মত একটি বিরাট গ্রন্থ বংশ-পরম্পরায় শত শত বৎসর ধরে যে অভ্রান্তভাবে রক্ষিত হতে পারে এটি কল্পনা করাই আমার ধারণায় যুক্তিসংগত নয়। ঋগ্বেদে দশ হাজারের ওপর ঋক আছে। এমন শ্রুতিধর ব্যক্তি কে আছেন যিনি তার সকল সূক্তগুলি অভ্রান্তভাবে কণ্ঠস্থ করে রাখবেন? এ রকম ঘটেছে বিশ্বাস করতে হলে কল্পনার ওপর অত্যন্ত বেশী রকম নির্ভর করতে হয়"।

ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যুক্তিসংগত কথাই লিখেছেন। প্রশ্ন হল ঐ ভূমিকাতেই অন্যত্র তিনি যা বলতে চেয়েছেন তার সঙ্গে এই বক্তব্যটি মিলছেনা। অন্যত্র তিনি লিখেছেন:

"পদপাঠে প্রত্যেক পদের সন্ধি ও সমাস বিশ্লিষ্ট করে পাঠ করা হত। এমনকি কি কোথাও কোথাও বিভক্তি অংশ বিশ্লিষ্ট করে পাঠ করা হত। ক্রমপাঠে প্রথম ছাড়া প্রতি পদের পুনরুক্তি করা হত। জটা-পাঠ সত্যই জটিল। তাতে একসঙ্গে তিন রকম পাঠ হত। প্রথমে দুটি পদ পর পর বলা হত, তারপর পদদুটি উল্টে বলা হত এবং শেষে যথাক্রমে পাঠ করা হত।"

এই অংশটিতে তিনি যা বলতে চেয়েছেন তার সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে ঐ ঋগ্বেদ 'পাঠ' করার জন্য তখনকার মানুষ কি অক্লান্ত পরিশ্রমই না করতেন। তাঁরা দুটি পদ পাঠ করেই পদ দুটি উল্টে নিয়ে পাঠ করে নিতেন। পাঠাভ্যাসের বহর দেখে বুঝে নিতে কষ্ট হয়না বেদ মুখস্থ রাখার আজগুবি গল্পটাকে প্রমাণসিদ্ধ বানাবার তাগিদেই ঐ উপাখ্যানটা বানিয়ে নেওয়ার দরকার পড়েছিল। প্রশ্ন হল মুখস্থ রাখার এই প্রচণ্ড উদ্ভট প্রয়াস (সোজা বাংলায় পাগলামি) চালু থাকার উপাখ্যানটাকে হিরণ্ময়বাবু গুরুত্ব দিয়ে বসেছেন কেন? এতে কি আগের বক্তব্যের সঙ্গে অসংগতি এসে যাচ্ছেনা? তিনি একজায়গায় জানালেন মুখস্থ রাখার গল্পটা আজগুবি। অন্যত্র তিনি মেনে নিলেন মুখস্থ রাখার বিদ্যাটা একটু বেশী মাত্রাতেই কাজে লাগানো হত—

কোন্‌টা তাঁর আসল বক্তব্য ? এ-ধরণের স্ববিরোধিতা যথার্থ পণ্ডিত-দের কাছ থেকে কেউই আশা করেননা।

সমার্থক ও বিভিন্নার্থক শব্দের ছড়াছড়ি বেদে আছে কেন ?

লিপিহীন বৈদিক ভাষায় সমার্থক শব্দের ছড়াছড়ি আছে। আছে নানান অর্থযুক্ত শব্দেরও প্রাচুর্য। সমার্থক শব্দগুলোর কোনওটা বহুল-প্রচলিত বাংলা লৌকিক শব্দের রূপান্তর ঘটিয়ে—কোনওটা বা আর্যতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার তাগিদে তথাকথিত ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দের বিকৃতি-সুকৃতির মধ্য দিয়ে বানিয়ে নেওয়া হয়েছে। বেশ কিছু সেমিটিক শব্দও বৈদিক ছদ্মবেশ চাপিয়ে বেদে ঢুকে বসে আছে। সিনীবালী মার্কা সে-সব শব্দকে সনাক্ত করে নিতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। এ-ছাড়া তৈরী করে নেওয়া কৃত্রিম শব্দও কিছু কম তৈরী হয়নি ঐ ঋগ্বেদে। সে-সব কৃত্রিম শব্দের ওপর সাত-আটখানা অর্থ আরোপ করার ব্যবস্থাও হয়েছে। ব্যবস্থা হয়েছে ঐসব শব্দের প্রাচীন প্রচলনের গল্পটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্যই। এই শব্দের এতগুলো অর্থ ছিল—ঐ শব্দের অতগুলো অর্থ। এতগুলো অর্থযুক্ত শব্দটা প্রাচীন কালে ছিলই না ? তাই কি কখনও হয় ? বোথ সাহেব জানালেন ব্রহ্ম-শব্দের সাতখানা অর্থ ছিল। ১। প্রার্থনা, ২। মন্ত্র, ৩। পবিত্র বাক্য, ৪। জ্ঞান, ৫। সততা, ৬। পরমাত্মা, ৭। পুরোহিত। সত্যিই ত যে শব্দের এতগুলো অর্থ ছিল সে-শব্দের প্রচলনই প্রাচীন কালে ছিলনা—এ-কথা কি বিশ্বাসযোগ্য ? আসলে তা বিশ্বাসযোগ্য নয় বলেই যে এক একটা শব্দের ওপর নানান অর্থ আরোপ করার খেলাটা খেলা হয়েছে—এইটাই কেউ ধরতে পারেননি। লিপিহীন ভাষায় সমার্থক বা বিভিন্নার্থক শব্দের যে ছড়াছড়ি থাকার কথা নয়—ভাষার ক্রমোন্নতির একটি বিশেষ পর্বে এবং লিপি-প্রবর্তনের পরেই যে ঐ দু-ধরণের শব্দের সংখ্যা বাড়তে থাকে—এই সোজা কথাটাকে কেউই গুরুত্ব দেননি। গুরুত্ব দেননি কোনও পণ্ডিতই।

ভগবৎমুখনিঃসৃতা সুপ্রাচীনা বৈদিক ভাষার ক্রম-অবক্ষয়ের আজগুবি তত্ত্ব প্রচার করে কত পণ্ডিত যে নাম কিনেছেন তার ঠিকঠিকানা নেই।

উনিশ শতকে তৈরী করে নেওয়া বৈদিক 'ভাষা' থেকে অতি প্রাচীন কালের সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ-মার্কা বিশেষণে সবিশেষ নামের ভাষাগুলোর জন্মের গল্প তাবৎ পণ্ডিতই শুনিয়ে এসেছেন। বৈদিক ভাষা-নামক দেবদত্ত অমৃতফল কালক্রমে পচে গলে আধুনিক উত্তর ভারতীয় 'আর্য' ভাষাগুলোর জন্ম হয়েছে—এ-ধরণের 'তত্ত্ব'সমৃদ্ধ বই আজ পর্যন্ত কম লেখা হয়নি।

আগের প্রসঙ্গে ফেরা যাক। পৃষ্ণি-বৃষ্ণি-মার্কা বেশ কিছু শব্দ বানিয়ে নেওয়া হয়েছে ঐ বেদে। নানান অর্থ আরোপ করার খেলাও কিছু কম হয়নি। এক পণ্ডিত বললেন 'পৃশ্নি'—শব্দের অর্থ 'নানান বর্ণযুক্ত'। সায়ণাচার্য নামক কল্পিত পণ্ডিত জানালেন, না, ঐ শব্দের 'আসল' অর্থ পৃথিবী। নিঘণ্টু-নামক উদ্ভট নামের প্রাচীন বলে প্রচারিত অভিধানে 'পৃশ্নি'-শব্দের অর্থ দেওয়া হল 'আকাশ'। আবার পণ্ডিত-প্রবর বোথ সাহেব বললেন, পৃশ্নির অর্থ 'মেঘ'। বুঝন ঠেলা! যে শব্দের অস্তিত্বই ছিলনা তার অর্থের বাহার সত্যিই দেখবার মত। বিচিত্র উদ্ভট শব্দ যেমন তৈরী করে নেওয়া হয়েছে তেমনি প্রচলিত শব্দের বিচিত্রতর 'উদ্ভটতর' অর্থও বানিয়ে নেওয়া হয়েছে ঐ বেদে।

আসলে প্রাচীন বলে প্রচারিত দুনিয়ার সব বইয়ের ভাষা যে ভূতুড়ে অর্থযুক্ত কৃত্রিম শব্দ আর উদ্ভট অর্থযুক্ত প্রচলিত শব্দের সুপরিকল্পিত গোঁজামিল ছাড়া কিছুই নয়—এইটাই কেউ ধরতে পারেননি। দুনিয়ার সব 'প্রাচীন' কেতাবেই ঐ খেলা খেলা হয়েছে। ঋগ্বেদে, বাইবেলে, কোরাণে, ত্রিপিটকে। কোথায় নয়? হবে নাই বা কেন? সবই যে একই খেলার নানান নাম!

প্রাচীনকালে ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে কি সত্যিই সাংস্কৃতিক বন্ধন ছিল?

ভারতবর্ষ এবং আফগানিস্তানের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন নাকি প্রাচীন কালেও সুদৃঢ় ছিল। সিন্ধুনদ এবং হিন্দুকুশ পর্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চল সংস্কৃতির দিক দিয়ে নাকি ভারতেরই অঙ্গ ছিল। অন্ততঃ পণ্ডিতেরা

এই তথ্যই দিয়ে আসছেন। 'প্রমাণ'ও তাঁরা হাজির করেছেন। হাজির করেছেন একটু বেশী মাত্রাতেই। ঋগ্বেদে কুভা, ক্রুমু,' সুবাস্তু, গোমতী ইত্যাদি নদীবাচক নাম রয়েছে। সেসব নদীর অবস্থানগত নির্দেশ যা পাওয়া যাচ্ছে তাতে ঐসব নদীগুলো আফগানিস্তানের বলেই মনে হয়। এছাড়া ভলানস, অলিন, পক্‌থ এইসব জাতিবাচক নামেরও উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে। সত্যিই ত' কুভার সঙ্গে কাবুল, ক্রুমুর সঙ্গে কুর্‌রাম, সুবাস্তুর সঙ্গে সোয়াৎ এবং গোমতীর সঙ্গে গোমাল-এর ধ্বনিভগ্নাংশগত (যদিও কষ্টকল্পিত) কিছু সাদৃশ্য ত' রয়েছেই। রয়েছে পক্‌থ শব্দের সঙ্গে পশ্‌তু বা পখ্‌তু শব্দেরও কিছু মিল। মহাভারতে গান্ধারের নাম জড়িয়ে গল্প লেখা হয়েছে। গান্ধারী নাকি গান্ধার থেকেই এসেছিলেন। আর ঐ গান্ধার নাকি আসলে আফগানিস্তানের কান্দাহার। আফ্রিদি এবং মোমাণ্ড্‌ জাতিবাচক শব্দদুটি সংস্কৃতায়িত ছদ্মবেশে আপ্রীত এবং মধুমত হয়েছে ঐ মহাভারতে। এইসব মিল দেখে যদি কেউ সন্দেহ করে বসেন দেশদুটোর মধ্যে সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল তবে খুব একটা দোষ দেওয়া যায়না। প্রশ্ন হল সন্দেহ করতেও জানতে হয়। সবাই ঠিকমত সন্দেহ করতে জানেন না। এমনকি পণ্ডিতেরাও নয়। ঋগ্বেদ এবং মহাভারত নামক আধুনিক কালে তৈরী করে নেওয়া কেতাব দুটোতে বিভ্রান্তি আনার জন্যই যে নামগুলো পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল এই সন্দেহ কিন্তু কেউই করেননি। আর তা করেননি বলেই 'সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক সম্পর্কে'র গল্পটা বেঁচে আছে আর ইতিহাসের বইয়েও ঠাঁই পেয়েছে পরম প্রামাণ্যতার ছদ্মবেশ চাপিয়ে।

সিদ্ধান্ত আরও আসছে। 'ভারতীয় সঙ্গীত' নামক শাস্ত্রটা যতটা প্রাচীন বলে চালানো হয় ঠিক ততটা প্রাচীন ওটা নয়। ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম ইত্যাদি নামগুলো নেহাৎ-ই অর্বাচীন। অর্বাচীন কারণ কান্দাহার-এর 'সংস্কৃতায়ণ' আদ্যিকালে ঘটেনি। ঘটেছিল আঠারো কিংবা উনিশ শতকেই। তাছাড়া ভারতীয় কোনও লিপিতে আদিতে

ঐ ঋ এবং ষ ছিলই না। সামবেদ তিন সুরে গাওয়ার রেওয়াজ ছিল বলে পণ্ডিতেরা জানিয়েছেন। তিন সুরে 'গান' হয়না—হয় 'গোলমাল'। তানসেন-এর গানে তান নেই কেন? তবে কি ঐ 'তানসেন'-নামটাও ভাটপাড়া-নবদ্বীপ কোটালিপাড়ার পণ্ডিতেরা দিয়েছিলেন? তান-শব্দটা কি ইংরাজী tune-এর সংস্কৃত ছদ্মবেশ?

'ইন্দ্র' শব্দের ইটিমলজির বহর

'ইন্দ্র'-শব্দের 'ইটিমলজি'র বহর আছে। উইলসন সাহেব প্রচণ্ড পরিশ্রম স্বীকার করেই ঐ একখানা শব্দের এগারোখানা ইটিমলজি 'আবিষ্কার' করে বসেছেন।

1. He who sports (*romate*) in the Soma juice (*indu*);

2. He who shows this (*idam*) universe.

3.-11. He who divides (*drinati*) or gives (*dadati*), or takes (*dadhati*), or causes to worship (*darayati*) or posseses (*dharayati*) spirituous liquor (*iram*), or who runs or passes (*dravati*) the Soma juice (*indau*) ; or kindles or animates (*indhe*) living beings ; or he who beholds the pure spirit, or Brahma, which is this (*idam*). Universal grammarians derive it from *idi* to rule with the suffix *ran*".

দেখা যাচ্ছে লিপিহীন যুগে 'লেখা' বলে প্রচারিত ঋগ্বেদে ঠাঁই-পাওয়া শব্দগুলোর ব্যুৎপত্তির গল্প কিছু কম বানানো হয়নি। মজার কথা এই যে দুনিয়ার কোনও ভাষার মৌলিক শব্দের etymology হয়ইনা। মৌলিক শব্দের স্থানবদলের বা রূপবদলের ইতিহাস থাকতে পারে ঠিকই তবে ধাতুপ্রত্যয়গত ব্যুৎপত্তি থাকতেই পারেনা। ধাতু বা শব্দের ওপর বিদিগিচ্ছিরি সব নামের্ প্রত্যয় যোগ করে শব্দ বানিয়ে নেওয়ার খেলাটা যে প্রাচীনকালেই হয়েছিল এই

আজগুবি গল্পটা মেনে নিয়ে সব পণ্ডিতই তত্ত্ব তৈরী করেছেন। তত্ত্ব তাঁরা যাই দিন না কেন তথ্য যা পাওয়া যাচ্ছে তাঁতে দেখা যাচ্ছে ছনিয়ার কোনও ভাষার মৌলিক শব্দ ঐভাবে তৈরী হয়নি। তৈরী হয়না। তৈরী হয়না কারণ ঐ জাতের শব্দগুলো পণ্ডিতেরা তৈরী করেননা—বৈয়াকরণেরও সাধ্য নেই যে তা তৈরী করেন। ধাতু বা শব্দ এবং প্রত্যয় (কৃৎ বা তদ্ধিত)-এর যোগসাজসে প্রাচীনকালে কোনও ভাষার মৌলিক শব্দ তৈরী হয়েছে এটা বিশ্বাস করার মত কোনও প্রমাণই পাচ্ছিনা। আসলে etymology বানানোর খেলাটা আধুনিক যুগের। মিথ্যার কারবারীদের সুসংহত প্রয়াসের শরিক হিসাবে বেশ কিছু ভাষাতাত্ত্বিক জুটেছিলেন। এঁরা উত্তরকালের পণ্ডিতদের ঠকানোর নানান উদ্যোগ-আয়োজন নিয়েছিলেন। আর সে-আয়োজনের অংশ হিসাবেই ঐ etymology নামক শাস্ত্রটির জন্মের ব্যবস্থা তাঁরা করেছিলেন। ইটিমলজি-সমৃদ্ধ প্রত্যেকটি শব্দই আধুনিক। উল্টোদিক দিয়ে বলা যায় মৌলিক শব্দের etymology বলে যা চালানো হয় তা সবই কষ্টকল্পিত এবং উদ্ভট। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। 'খন'-শব্দটা বাংলা মৌলিক শব্দ। 'কিছুখন' (উচ্চারণ কিছুখ্‌খন), 'অনেকখন', 'যতখন' (উচ্চারণ যতখ্‌খন) শব্দগুলো খাঁটি বাংলা। 'খন'-শব্দ সংস্কৃত ছদ্মবেশে দাঁড়াল 'ক্ষণ'। (পণ্ডিতেরা 'ক্ষণ' শব্দ থেকে বাংলা 'খন'-এর আমদানির গল্প শোনালেন।) 'খন'-শব্দের ইটিমলজি হয়না। সংস্কৃত সেজে বসে থাকা অর্বাচীন 'ক্ষণ' শব্দের ইটিমলজি বানিয়ে নেওয়া হল ক্ষণ্‌-ধাতু থেকে আর ঐ ক্ষণ্‌-ধাতুর ওপর অর্থ আরোপ করা হল 'হত্যা করা'। ব্যাপারটা কি? আসলে বাংলা 'খুন করা' ক্রিয়া থেকে ক্ষণ্‌-ধাতু বানিয়ে নেওয়ার আয়োজন হয়েছিল। আর ক্ষণ শব্দের ইটিমলজি বানিয়ে নেওয়ার কাজে ঐ ধাতুর প্রয়োগ হয়েছিল। ঘটনা হ'ল এই। ক্ষণ-শব্দের সঙ্গে 'হত্যা করার' কোনও সম্পর্ক যে নেই তা বলাই বাহুল্য। আসলে তথাকথিত 'ক্ষণ' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন বলে প্রচারিত প্রত্যেকটি শব্দেরই

উদ্ভট ব্যুৎপত্তির গল্প তৈরী করে নেওয়া হয়েছিল। নেওয়ার দরকার পড়েছিল। মজার কথা আরও আছে। ক্ষ-কারাদি, ক্ষ-কারান্ত, এমন কি ক্ষ-মধ্য সংস্কৃত শব্দগুলোর প্রত্যেকটিই এই ভাবে 'তৈরী' করে নেওয়া হয়েছে। তৈরী করে নেওয়া হয়েছে বেশ কিছু বাংলা মৌলিক শব্দের ওপর সংস্কৃত ছদ্মবেশ চাপানোর জন্য। এছাড়া উত্তর ভারতীয় কিছু ভাষার তথাকথিত তদ্ভব (আসলে লৌকিক) খ-ঘটিত শব্দের ওপর সংস্কৃত ছদ্মবেশ চাপানোর প্রয়োজন ও আয়োজন হয়েছিল। যেমন আঁখ —> অক্ষি ; ইখ —> ইক্ষু ইত্যাদি। ইংরাজী X-ঘটিত কিছু শব্দের 'সংস্কৃতায়ণে'র স্বার্থেও ঐ ক্ষ-এর ব্যবহার হয়েছিল। যেমন Axis —> অক্ষ, Axle —> অক্ষ ইত্যাদি। মজার কথা এই যে ঐ 'অক্ষ'-শব্দটা প্রাচীন বলে প্রচারিত সংস্কৃত কেতাবে বেশ যত্ন করেই ব্যবহার করা হয়েছে। করা হয়েছে ঐ axis-অর্থেই। মজার কথা আরো আছে। ঋগ্বেদেও ঐ অক্ষ-শব্দটা ঢুকে বসে আছে। বসে আছে একাধিক উদ্ভটঅর্থযুক্ত হয়ে। প্রশ্ন হল আদ্যিকালের সংস্কৃত ভাষায় শব্দটা ঢুকলই-বা কি করে ? 'প্রাচীনতর' বৈদিক ভাষায় উল্টোপাল্টা অর্থযুক্ত হয়ে ব্যবহার করাই-বা হল কোন্ যাদুবলে ? এসব প্রশ্নের উত্তর পণ্ডিতেরা দেননি। দেওয়ার বিপদ ছিল বলেই। বলে রাখা ভালো 'ক্ষ' যুক্তাক্ষরটি সংস্কৃত ভাষার পেটেন্ট। ভারতের কোনও লিপিতেই আদিতে ঐ অক্ষরটি ছিলনা। প্রমাণ এ-বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে রেখেছি।

আসলে সংস্কৃত শব্দ ও ভাষাসৃষ্টির পশ্চাতে বাঙ্গালীরই অবদান সবচেয়ে বেশী ছিল। এত পণ্ডিত ভারতে অন্য কোথাও সুলভ ছিলও না। এঁদের প্রশংসনীয় উদ্যমেই 'ভাষা'টার জন্ম হয়েছিল। তথ্যপ্রমাণ এ-বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে রাখব। আগের প্রসঙ্গে ফেরা যাক। একটি শব্দের এগারো খানা etymology বানানোর কসরৎ করতে গিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলেন ঐ উইলসন সাহেব। ইটিমলজি-সমৃদ্ধ আধুনিক কোনও শব্দেরও একাধিক ইটিমলজি হয় না। ওটা উইলসনীয় ফাজলামি। যাস্কের মতে সংখ্যাটা মাত্র পনেরো !

বৈদিক, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, ভাষাগুলো কি সত্যিই প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল ?

মজার কথা এই যে ঐ বৈদিক, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, বা অপভ্রংশ-মার্কা নামের ভাষাগুলো কস্মিনকালেও ভারতে বা বহির্ভারতে প্রচলিত ছিলনা। ভাষাতাত্ত্বিকেরা ঐসব ভাষার শবব্যবচ্ছেদের যতই চেষ্টা করুন না কেন—পণ্ডিতেরা যতই গবেষণার ছয়লাপ করুন না কেন—তথ্য যা পাচ্ছি তা থেকে সিদ্ধান্ত নিতেই হয় ওসবের কোনটারই প্রচলন প্রাচীন-কালে ছিলনা। ছিলনা মধ্যযুগেও। ইউরোপীয়দের ভারতে আসার আগে পর্যন্ত ঐসব ভাষার নামগন্ধ কেউ-ই জানতেন না। তৈরী করে নেওয়া ঐসব ভাষার জন্ম হয়েছে ওঁদের আসার পরেই। বেশ পরিকল্পনা-মাফিকই-যে ভাষাগুলো বানানো হয়েছিল এটা মেনে নিতেই হয়। আর সে-পরিকল্পনার প্রশংসা না করে উপায়ও নেই। মিথ্যার কারবারীদের সুসংহত প্রয়াসের মাধ্যমে এবং বেশ কিছু ভারতীয় এবং সিংহলী সাকরেদদের সহযোগিতায় 'ভাষা'গুলোর জন্ম হয়েছিল। জন্ম হয়েছিল 'সুপ্রাচীন' সব ধর্মের 'বাণী' বানিয়ে রাখার এবং মনীষার প্রাচীনীকরণের উদ্যোগ-আয়োজনের অংশ হিসাবেই। প্রমাণ এ-বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে থাকবে।

জুয়াখেলা কি সত্যিই প্রাচীন ?

জুয়াখেলা কি সত্যিই ঐ প্রাচীনকালে ভারতে চালু ছিল? ইউরোপীয়দের ভারতে আসার আগে কি ঐ খেলার প্রচলন ভারতে হয়েছিল ? প্রশ্ন হল খেলাটার প্রচলন যদি নাই থাকবে তবে আমাদের তথাকথিত ক্লাসিকাল সাহিত্যের মধ্যে জুয়াখেলার এত উপাখ্যান বানানোর দরকার পড়েছিল কেন ? দরকার ছিল বৈকি। মহাভারত প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে ঐ খেলার গল্প থাকাতে। ঋগ্বেদেও ঐ খেলার প্রসঙ্গ রাখা হয়েছে। জুয়াড়ীরা কি ভাবে সর্বস্বান্ত হতেন, স্ত্রীপুত্র-পরিজনদের কাছে কি অমানুষিক ব্যবহার পেতেন তার সবই নিপুণভাবে রাখা হয়েছে ঐ ঋগ্বেদে। (ঋগ্বেদ ১০, ৩৪) রাখা হয়েছে বিজাতীয় ঐ

খেলাটার ওপর প্রাচীনত্বের প্রলেপ চাপাতে। এবং আগেই লিখেছি বানানো গল্পগুলোকে প্রাণবন্ত করার তাগিদও ছিল। জুয়া শব্দ কোথা থেকে এসেছে তা জানার উপায় নেই তবে 'দ্যূত' শব্দ থেকে যে আসেনি তা বেশ জোর দিয়েই বলা যায়। দ্যূতক্রীড়া নামক একটি সংস্কৃত শব্দ বানিয়ে নিলেই তা প্রাচীন হয়ে যায়না। সংস্কৃত—> প্রাকৃত—> অপভ্রংশ—> আধুনিক 'আর্য'-ভাষার ম্যাজিক দেখালেও সেটা প্রাচীন বনে যায়না। খেলাটা অর্বাচীন আর বুদ্ধিটাও ইউরোপের। ভারতের নয়।

Source-এর মধ্যেই ভূত !

ভাষাতাত্ত্বিক সব পণ্ডিতেরই বক্তব্যের এক সুর। আদ্যিকালের সংস্কৃত ভাষা থেকে ভারতের তাবৎ 'আর্য'-ভাষার উৎপত্তির গল্প বানানোর কাজে সব পণ্ডিতই এক সুরে কথা বলেছেন। ভারতীয় অভারতীয় সকলেই। উল্টোসুরে কথা বলার বিপদ ছিল কিনা জানিনা। তবে কেউই সে-পথে যাননি। যাননি কারণ ভাষাতত্ত্বের জন্মদাতাদের সুসংহত আর্কেস্ট্রা শুনে সব পণ্ডিতই বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। বিভ্রান্ত হয়েছেন। মিথ্যার সাকরেদদের কথা বাদ-ই দিলাম। স্বাধীন চিন্তাসমৃদ্ধ নিরপেক্ষ পণ্ডিতেরাও। Old Indo-Aryan, Middle Indo-Aryan, Neo Indo-Aryan-এর গুরুগম্ভীর নামের লীলাখেলা পণ্ডিতেরা অনেক দেখিয়েছেন। 'প্রমাণ'-ও হাজির করেছেন। করেছেন একটু বেশী মাত্রায়। মজার কথা এই যে যে-সব উৎসগ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে ওঁরা 'তত্ত্ব'-প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছেন তার সবই ভুয়ো। ও-সবই বানিয়ে নেওয়া হয়েছে আধুনিক কালে। প্রাচীনকালে নয়। ভাষাতত্ত্বের মিথ্যার ভূত তাড়াবেন কি দিয়ে? Source-এর মধ্যেই যে ভূত ! আর সে-ভূত যে প্রাচীন যুগের ইতিহাসের তাবৎ উৎসগ্রন্থের মধ্যেই ঢুকে বসে আছে ! যাবেন কোথায় ?

ঋগ্বেদে রাশিয়ার বৃত্তান্ত !

ঋগ্বেদে রাশিয়ার খবরও আছে। 'রুশম' নামক সে-দেশের 'রাজার' নাম রাখা হয়েছিল 'ঋণঞ্চয়'। উনিশ শতকে ঋগ্বেদ যখন লেখা

চলছিল তখন বা তার কিছু আগে রাশিয়ার জার কি কিছু ধার-দেনা করে বসেছিলেন? বিদেশী রাষ্ট্রের কাছে তাঁর কি কিছু দেনা হয়েছিল? জানিনা। জার-সম্পর্কে কিছু রসিকতা করার লোভ কি সামলাতে পারেননি ঋগ্বেদ লেখানোর পশ্চাতে অবস্থানকারী বিদেশী পরামর্শদাতারা? ওঁদের পরামর্শেই কি 'ঋণঞ্চয়'-নামটা ঐ ঋগ্বেদে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল? হওয়াটা বিচিত্র নয়। বৈদিক পণ্ডিতদের উদ্ভট উদ্ভট সব শব্দসৃষ্টির প্রাণান্তকর পরিশ্রমের একটি বিচিত্র ফসল ঐ 'ঋণঞ্চয়'। দুঃখের কথা অভিধানে ঐ মূল্যবান শব্দটা ঠাঁই পাইনি।

প্রাচীন কেতাবে এত 'ভূগোল' শেখানোর ব্যবস্থা কেন?

আসলে প্রাচীন বলে প্রচারিত দুনিয়ার সব কেতাবের ওপরে কিঞ্চিৎ ভূগোলের জ্ঞান পরিবেশন করার দায়িত্ব চাপানো হয়েছিল। চাপানো হয়েছিল উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই। ঋগ্বেদের 'ভূগোল'-টা একটু দেখা যাক:

তৃষ্টাময়া প্রথমং যাতবে সজূঃ সুসর্ত্বা রসয়া শ্বেত্যা ত্যা।

ত্বং সিন্ধো কুভয়া গোমতীং ক্রুমুং মেহৎন্বা সরথং যাভিরীয়সে ॥

(১০।৭৫।৬)

বিদেশী স্থান-নাম বা নদী-নামের অভাব বাইবেলে রাখা হয়নি। অভাব রাখা হয়নি পুরাণে, কোরাণে, হিরোদোতাস-এর মুগ্ধবোধ ইতিহাসে, হোমার-ভার্জিল-দান্তে-দের মহাকাব্যেও। কালিদাসের মেঘদূতেও কিঞ্চিৎ ভূগোল অছে। টলেমির ভূগোলেও ঐসব নামব্রহ্মের খেলা খেলা হয়েছে। সে ত' হতেই পারে। ওটা যে নামেও ভূগোল। প্রশ্ন হল প্রাচীন কেতাবে ভূগোলের ছয়লাপ দেখেও পণ্ডিতেরা সন্দেহ করেননি কেন? মিথ্যার কারবারীরা যে বেশ পরিকল্পিতভাবেই ব্যবস্থাটা নিয়েছিলেন এইটাই কেউ বোঝেননি। ভারতের বেশ কিছু স্থান-নাম বা নদী-নাম উচ্চারণগত কিছু রূপবদলের মধ্য দিয়ে গ্রীস-বা ইটালীর 'প্রাচীন' কেতাবে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। ব্যবস্থা হয়েছিল প্রচণ্ড মিথ্যাটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্যই। ওঁদেরই অর্ডারী লেখা ঋগ্বেদে একই খেলা খেলা হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে যাঁরা কথায় কথায় প্লিনী বা টলেমির 'রেফারেন্স' টেনে আনেন তাঁদের উৎসাহের প্রশংসা করতেই হয়। দুঃখের কথা এই যে ঐ প্লিনী বা টলেমিরাও যে ঐ মিথ্যার চক্রীদেরই সৃষ্টি—এইটাই তাঁরা বোঝেননি।

ঋগ্বেদেও ঘোড়দৌড়ের গল্প!

বৈদিক যুগে ঘোড়দৌড়-ও হত। শুধু হত বললে ভুল হবে খেলাটা বেশ 'পপুলার'-ও ছিল।

"O, Soma, give us money as a winning horse gets in the race".

"পবস্ব সোম ক্রত্বে দক্ষায়াশ্বো ন নিক্তো বাজী ধনায়"

(ঋগ্বেদ ৯, ১১০, ১০)

ঘোড়ার ওপর বাজি ধরা হত বলেই কি ঐ প্রাণীর বৈদিক বা সংস্কৃত 'বাজি' নামকরণ হয়েছিল? জানিনা। তবে এইটুকু বলতে পারি বৈদিক শব্দসম্পদের কোনটাই আকাশ থেকে পড়েনি। ঐভাবেই বানিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

'Money' নামক বস্তুটা যে ঐ যুগে ছিল এটা জেনে সত্যিই আনন্দ হয়। ব্রিটিশ যুগের মধ্যভাগেও ঐ money'র প্রচলন খুব একটা বেশী ছিল বললে ভুল হবে। দু-চারজন মহামহোপাধ্যায় কি রায়বাহাদুর, কি বিদ্যাসাগর বা আমলারা ঐ-বস্তু প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে কিছু পেতেন ঠিকই। প্রাচীন ইতিহাসের উৎসগ্রন্থ বা প্রাচীন সাহিত্যের নেপথ্য-লেখকেরা সম্ভবত বেশ কিছু পেয়ে থাকবেন। তবে সাধারণ মানুষ যে পরিমাণ money নিয়ে কারবার করতেন তা ভাবলে হাসি পায়। বৈদিক যুগে money! মুদ্রা নামক রাক্ষসের জন্মই যে তখনও হয়নি! হবেই বা কি করে? ধাতুর আবিষ্কার কি তখন হয়েছিল?

আর একটা কথা। প্রাচীন কালে দেশে দেশে 'ঘোড়দৌড়' প্রচলিত থাকার আজগুবি গল্পকথা বাদ দিলে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে

সিদ্ধান্ত নিতেই হয় খেলাটা মোটেই প্রাচীন নয়। ইংল্যাণ্ডেই ঐ খেলার জন্ম হয়েছিল। জন্ম হয়েছিল আধুনিক কালেই।

ঋগ্বেদে ঘোড়দৌড়ের গল্প দেখেও যে কেউ সন্দেহ করেননি এটা কম আশ্চর্যের নয়।

ইংরাজী ও বাংলা শব্দের অভাব ঋগ্বেদে নেই।

ছ্যাক্‌ড়া গাড়ীর ছ্যাক্‌ড়া-অংশ থেকে ঘসে মেজে বানিয়ে নেওয়া হল সংস্কৃত 'শকট'-শব্দটা। ছ্যাক্‌ড়া শব্দটা লৌকিক। etymology হয়না। সংস্কৃত সেজে বসে থাকা শকট-শব্দের etymology-র বহর আছে। ধাতু-প্রত্যয়গত ব্যুৎপত্তিতত্ত্ব বানিয়ে নিতে দেরী হয়নি: √শক্ + অট (অটন্)-ক। বলা বাহুল্য ব্যুৎপত্তিটা উদ্ভট। ইংরাজী sweat থেকে সংস্কৃত স্বেদ শব্দটা বানিয়ে নেওয়া হল। ব্যুৎপত্তি বানাতেও কিছু অসুবিধা হয়নি। শব্দের হাড়মাস আলাদা করার খেলার প্রতাপে পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন শব্দদুটো প্রাচীন না হয়ে যায় না। ঋগ্বেদে শকট শব্দটা শকটী সেজে বসে আছে। স্বেদ আছে অবিকৃতভাবেই। আঠারো শতকে তৈরী করে নেওয়া সংস্কৃত ভাষায় ইংরাজী বা বাংলা শব্দ না থাকলে কি চলে? উনিশ শতকে বানিয়ে নেওয়া বৈদিক ভাষায় ও-সব শব্দ যে থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি! বাংলার ঘাস ঋগ্বেদে ঘাসি সেজে বসে আছে, বাংলার ঘি ঋগ্বেদে অবিকৃত অস্তিত্ব নিয়েই বিরাজ করছে। ইংরাজি vagina শব্দ থেকে বানিয়ে নেওয়া ভগ-শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় ঢুকে বসে আছে। ঢুকে বসে আছে একই অর্থযুক্ত হয়ে। এই সোজা কথাটা যাতে কেউ না ধরে ফেলেন সেইজন্যেই ঐ ভগ-শব্দের ওপর নানান অর্থ চাপানোর আয়োজন হয়েছিল। এমনকি সূর্যের প্রতিশব্দ হিসাবেও শব্দটা ঋগ্বেদে ব্যবহার করা হয়েছিল। শব্দকে প্রাচীন সাজানোর জন্য নানান অর্থ আরোপ করার খেলাটা একটু বেশীমাত্রাতেই খেলেছিলেন মিথ্যার কারবারীরা। ধরে ফেলতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি। ভগবান-শব্দটাও অর্বাচীন আর অর্বাচীন বলেই শব্দটার অর্থ-পরিবর্তনের গল্পটা বানাতে

হয়েছিল। ঋগ্বেদে 'অর্থবান'-অর্থে—'পৌরাণিক' যুগে 'আপনি'-অর্থে ইত্যাদি। 'ষড়ৈশ্বর্য'-মার্কা অর্থ ঐ ভগ-শব্দের ওপর আরোপ করার ব্যবস্থাও হয়েছিল। ব্যবস্থা হয়েছিল বিভ্রান্তি সৃষ্টির আয়োজন হিসাবেই। শব্দটাকে প্রাচীন সাজানোর জন্যই। 'ষড়ৈশ্বর্য' বা 'পঞ্চদোষ'-এর প্রতিশব্দ দুনিয়ার কোনও ভাষাতেই নেই। সুপ্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় ছিল এটা ভেবে নিতে কষ্ট হয়। এ-রকম আর একটি বৈদিক শব্দ 'ভর্গ'। শব্দটার অর্থ নাকি 'সূর্যের ঐশী শক্তি'। 'সূর্যের ঐশী শক্তি', 'কুকুরের মানবিকতা', 'পাথরের বেদনা' এক শব্দে প্রকাশ করার ব্যবস্থা আধুনিক কোন উন্নত ভাষাতেও নেই। বৈদিক ভাষাতে ছিল এটা ভেবে নিতে কষ্ট হয় বৈকি।

অনেকে প্রশ্ন করে বসবেন ছ্যাকড়া গাড়ীর 'গাড়ী' শব্দটার কি হল? ঐ শব্দ থেকে বানানো হল 'কটিকা'। 'মৃচ্ছকটিকা' নামের মধ্যেই ঐ 'কটিকা'-কে পেয়ে যাবেন।

সংস্কৃত সমার্থক শব্দের রহস্য

সংস্কৃত ভাষার এক একটি শব্দের সমার্থক শব্দের বহর দেখে পণ্ডিতেরা মুগ্ধ হয়েছেন। শব্দগুলো বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনও তাঁরা বোধ করেন নি। Horse-এর প্রতিশব্দ সংস্কৃত ভাষায় কম নেই। তার মধ্যে গোটা তিনেক শব্দ যে সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারের ইংরাজী horse শব্দ থেকেই বানিয়ে নেওয়া হয়েছে এটাই পণ্ডিতেরা বোঝেন নি। হয়, হরি বা অশ্ব কোনও শব্দই ভারতে চালু ছিল না। ছিল ঘোড়া বা তার ধারে কাছের উচ্চারণের শব্দ। 'হ্রেষা'—শব্দটির মধ্যেও ঐ horse-এর ইঙ্গিত পাচ্ছি কেন? ওটাও কি ঐ horse শব্দ থেকেই বানিয়ে নেওয়া হয়েছিল? সন্দেহ আসার কারণটাও বলে নিই। শব্দটা ধ্বন্যাত্মক নয় আর ঐ মূর্ধণ্য ষ-টাও প্রাচীন কোনও অক্ষর নয়। ওটা ফোর্ট-উইলিয়ামে তৈরী করা অর্বাচীন অক্ষর। প্রমাণ ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

আসলে সমার্থক শব্দপুঞ্জের কোনটা আর্যতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার তাগিদে

[উদাহরণ তামার প্রতিশব্দ অয়স্ ←ল্যাটিন aes (এস্)]—কোনওটা বা খোদ ইংরাজী শব্দ থেকে [উদাহরণ গাছ-এর প্রতিশব্দ 'তরু' (←ইংরাজী tree)] থেকেই বানিয়ে নেওয়া হয়েছে এইটাই কেউ বোঝেন নি।

'অমরকোষে' নানান শব্দের সমার্থক শব্দের শোভাযাত্রা সত্যিই দেখবার মত। মজার কথা এই যে সে-সব শব্দের কোনওটা বাংলা, কোনওটা হিন্দী, কোনওটা-বা তামিল লৌকিক শব্দ থেকে—আবার কোনওটা গ্রীক বা ল্যাটিন বা ইংরাজী শব্দের বিকৃতির মধ্য দিয়ে বানানো। কিছু শব্দ নেহাৎই গুণবাচক কৃত্রিম শব্দ। সমার্থক-শব্দের ভীড়ের তাৎপর্যটাই পণ্ডিতেরা বোঝার চেষ্টা করেন নি। আর সমার্থক বলে সমার্থক! সমার্থক শব্দ সব ভাষাতেই অল্পবিস্তর আছে, তবে সে-সব শব্দের মধ্যে সূক্ষ্মঅর্থভেদ (nuances) কিছু থেকেই যায়। সংস্কৃত সমার্থক শব্দে ঐ সূক্ষ্ম-অর্থভেদের বালাই নেই। জল-শব্দের ১২২টা প্রতিশব্দ বানানোর কসরৎ শুধু ঐ সংস্কৃত ভাষাতেই হয়েছে।

ধাতু আর প্রত্যয়ের খেলা

তথাকথিত পাণিনীর 'অষ্টাধ্যায়ী' গ্রন্থের 'ধাতুপাঠে' ১৯৪৩টি সংস্কৃত এবং বৈদিক ধাতুর তালিকা আছে। ঐ পাণিনী যে কত প্রাচীন তা' আগের একটি অধ্যায়ে জানিয়েছি। এখন আলোচ্য ঐ ধাতুর প্রসঙ্গটাই। ঐসব ধাতুর প্রসঙ্গ অন্য ব্যাকরণেও আছে। এবং আছে বলেই কিছু প্রশ্নও এসে যাচ্ছে। ঐসব ধাতুর মধ্যে প্রায় চারশ' ধাতু শুধু বৈদিক সাহিত্যে আর প্রায় আটশ' ধাতু শুধু বৈদিকউত্তর সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যবহার করা হয়েছিল। ব্যবহার করা হয়েছিল ক্রিয়া হিসাবেই। বাকি সাতশ'র কিছু বেশী ধাতুর ক্রিয়া হিসাবে প্রয়োগের সাক্ষ্য বৈদিক বা সংস্কৃত সাহিত্যে নেই। নেই কেন এ-প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। পণ্ডিতেরা এর উত্তরও দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন ঐসব ধাতু নাকি নিছক শব্দের ব্যুৎপত্তি বানিয়ে নেওয়ার কাজেই দরকার

পড়েছিল—ক্রিয়া হিসাবে প্রয়োগের কাজে দরকার পড়েনি। নিঃসন্দেহে আজগুবি কথা। ব্যাপারটা কি? আসলে সংস্কৃত এবং বৈদিক ভাষাকে প্রাচীন সাজাবার তাগিদে কম কৃত্রিম শব্দ বানিয়ে নেওয়ার দরকার পড়েনি আর সেইসব 'শব্দের' ব্যুৎপত্তি বানানোর খেলাও কিছু কম হয়নি। কম হয়নি ঐ উদ্ভট খেলার কাজে নানান সব 'ধাতু'র প্রয়োজনও। এছাড়া লৌকিক (বেশীর ভাগই বাংলা) শব্দের সংস্কৃতায়িত ছদ্মবেশের উদ্ভট উদ্ভট সব ব্যুৎপত্তি বানিয়ে নেওয়ার কাজেও ঐজাতের বেশ কিছু ধাতুর সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। এই দু' ধরণের কাজে 'ধাতু'র প্রয়োজন যে একটু বেশী হবে এতে আর আশ্চর্য কি? ধাতু আর প্রত্যয়ের অর্বাচীন খেলাটাকে পণ্ডিতেরা প্রাচীন বলে মনে করে নিয়েছেন। শব্দসৃষ্টির রহস্য হিসাবে প্রচার করা ঐ খেলার ধারাবিবরণী দেখেই শব্দের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে যে পণ্ডিতদের 'পেত্যয়' (= বিশ্বাস) এসে যাবে—এটা মিথ্যার কারবারীরা জানতেন। আর জানতেন বলেই ঐ ব্যবস্থা। প্রত্যয় শব্দটাও যে ঐ 'পেত্যয়' নামক লৌকিক শব্দের সংস্কৃতায়ণ তা কি বলার দরকার আছে?

কবরী শব্দটা প্রাচীন (?) সংস্কৃত ভাষায় ছিল। অর্থ ছিল খোঁপা। শব্দটাকে প্রাচীন সাজানোর দরকার ছিল। সাজানো হল শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশের মধ্য দিয়ে। [কং শিরঃ বৃণোতি আচ্ছাদয়তি। (ক + বৃ + ত্যচ্ + জানপদেত্যাদিনা ঙীপ্। কু + অরন্ ঙীপ্ বা।) উৎস-শব্দকল্পদ্রুম।] দেখা যাচ্ছে পণ্ডিতেরা চেষ্টার কসুর করেন নি। ব্যুৎপত্তির ঘটা তাঁরা যতই দেখান না কেন শব্দটা কিন্তু আসলে ফরাসী শব্দ coiffure (কোয়াফ্যর) এর সংস্কৃত ছদ্মবেশ। বলাবাহুল্য ওটা নেহাৎই অর্বাচীন শব্দ। ইউরোপীয়দের ভারতে আসার আগে ঐ শব্দের প্রভাবে শব্দ-সৃষ্টির গল্পটা নেহাৎ-ই আজগুবি।

আরবী 'কিস্‌সা' শব্দ থেকে বাংলা 'কেচ্ছা' শব্দটা এসেছে। বলা বাহুল্য খুব একটা প্রাচীন কালে শব্দটা আসে নি। সে যাই হোক, বাঙ্গালী নেপথ্য-শিল্পীদের উৎসাহাধিক্যে কেচ্ছা-শব্দেরও সংস্কৃত বানানো

হল। বানানো হল 'কুৎসা'। ঋগ্বেদে কুৎসা থাক বা না থাক—আছে কুৎস—আছে কুৎসের পুত্র কৌৎসের বাণী। আরবী শব্দ চুরি-করা কুৎসা শব্দের etymology আছে আর তা যখন আছে তখন মেনে নিতেই হয় ওটা খাঁটি সংস্কৃত শব্দ। সত্যিই কি তাই? আসলে সংস্কৃত নামক ভারতের অর্বাচীনতম ভাষার অর্বাচীনত্বের সাক্ষ্য কম নয়।

ছেলে শব্দটা বাংলা লৌকিক শব্দ। ইটিমলজি হয় না। হয় না কারণ কোনও লৌকিক শব্দেরই তা নেই। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃত শাবক-শব্দের ওপর পর্যায়ক্রমে আল এবং ইয়া প্রত্যয় জোড়ার ব্যবস্থা করলেন—শ-এর জায়গায় ছ-এর আগমের বন্দোবস্ত করলেন। অপিনিহিতি-অভিশ্রুতির খেলার শেষে ঐ শাবক শব্দের রূপান্তর ঘটল 'ছেলে'-তে। ছেলে-শব্দটা যে অতিপ্রাচীন সংস্কৃত ভাষার একটি শব্দের নানান উদ্ভট খেলার সূত্রে এসে হাজির হয়েছে—এটা জেনে সবাই মুগ্ধ হলেন। মুগ্ধ হলেন পণ্ডিতেরাও। প্রশ্ন হল গল্পটা বানানোর দরকার পড়ল কেন? গল্পটা বানিয়ে আর কিছু হোক আর না হোক সংস্কৃত ভাষাটা যে সত্যিই প্রাচীন তা বোঝাবার ব্যবস্থা হয়ে গেল। এতগুলো ধাপ পেরিয়ে আসাটা কি দু'-এক শ' বছরে সম্ভব? গলদ যে গোড়ায় এইটাই কেউ বোঝার চেষ্টা করলেন না। শাবক শব্দটা এল কোত্থেকে? বাংলা ছা বা ছানা শব্দের সংস্কৃতায়িত ছদ্মবেশের নাম যে ঐ শাবক এবং শব্দটা যে আধুনিক কালেই বানিয়ে নেওয়া—এইটাই কেউ বোঝার চেষ্টা করেন নি। খাঁটি বাংলা শব্দ পানা (=সরবৎ)-কে যাঁরা সংস্কৃত 'পানক' বানাতে পেরেছিলেন তাঁরা যে বাংলা 'ছানা' থেকে 'শাবক' বানিয়ে নেবেন এতে আর আশ্চর্য কি? কালা-থেকে কল্ল, গাল থেকে গল্প বানানোর মতন নানান খেলা যে ভাটপাড়া (→ভট্টপল্লী) বা কোটালীপাড়া (→কোষ্ঠপালপল্লী?) ইত্যাদি জায়গার বাঙ্গালী ভাড়াটে পণ্ডিতদের কর্ম এইটাই কেউ বোঝার চেষ্টা করেন নি। সে যাই হোক ক্ষুদ্রার্থে ক-যোগের কৃত্রিম উদ্যোগান্তে শাবক শব্দটা যে সংস্কৃত সেজে বসে আছে

এইটাই কেউ ধরতে পারেন নি। তাছাড়া শাবক শব্দটা সংস্কৃত ভাষাতেও মনুষ্যসন্তান-অর্থে ব্যবহার করা হয় নি। হয়েছে জীবজন্তুর বাচ্চা অর্থেই। বাচ্চা শব্দটা এখন খাঁটি বাংলা শব্দ। ওটা এসেছে ফার্সী ভাষা থেকে। মজার কথা এই যে ঐ ফার্সী 'বাচ্চা'-শব্দটাকেও ঘসে মেজে সংস্কৃত 'বৎস'-শব্দ বানিয়ে নেওয়া হয়েছে। সংস্কৃত ভাষাটা যে কত প্রাচীন তা কি বুঝে নিতে কষ্ট হয়? বৎস-শব্দটা ঋগ্বেদেও আছে (৭, ১০, ২)। আর একটা কথা। আল এবং ইয়া কি সত্যিই বাংলা ভাষার ছুটো প্রত্যয়? আল বা ইয়া-ভাগান্ত শব্দ বাংলা ভাষায় কম নেই। এর মধ্যে আল-ভাগান্ত শব্দ যে একান্তভাবে বাংলা ভাষার নিজস্ব এটাও বলার দরকার আছে। আল-ভাগান্ত শব্দ থাকলেই যে আল-প্রত্যয় থাকবে একথার কোন মানে হয় না। প্রত্যয় হওয়ার যোগ্যতা কি সত্যিই ঐ আল-এর আছে? বিশেষ কোনও অর্থে কি ঐ আল-এর প্রয়োগ হয়েছে? দাঁতাল, পাতাল, মাতাল, চাঁড়াল, বাচাল ইত্যাদি শব্দে কি বিশেষ কোনও সুনির্দিষ্ট বাড়তি অর্থ আরোপ করার ব্যবস্থা ঐ 'প্রত্যয়'-এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে? তাছাড়া মৌলিক শব্দের প্রত্যয় খোঁজার চিন্তাটাই যে আজগুবি। প্রত্যয়সিদ্ধ সব শব্দই আধুনিক। তৈরী করে নেওয়া। মজার কথা আরও আছে। বাচাল-শব্দটা সংস্কৃত সব অভিধানে না থাকলেও বেশ কিছু অভিধানে ঠাঁই পেয়েছে। কয়েকটা অভিধানে ঐ অর্থে বাচাট নামক উদ্ভট একটি শব্দের সন্ধান পাচ্ছি। "মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম।" মহাভারতে আছে। মহাভারতে যখন রয়েছে তখন ধরে নিতেই হয় শব্দটা সংস্কৃত। কিন্তু খট্‌কা তো থেকেই যাচ্ছে। ব্যাপারটা কি? শব্দটা সংস্কৃতে ঢুকল কি করে? আসলে ব্যাসদেবের ছদ্মনামে নেপথ্যে-থাকা বাঙ্গালী লেখক বাচাল-শব্দের প্রয়োগের মধ্য দিয়ে নিজের বাঙ্গালীয়ানা-ই জাহির করে বসেছেন। ঘটনা হচ্ছে এই। বলে রাখা ভালো বাচাল শব্দটা বাংলার বাইরে কোথাও চালু নেই। এমনকি বাংলা ভাষার প্রভাবে বেশ

কিছুটা প্রভাবিত ওড়িয়া বা অসমীয়া ভাষাতেও নেই। 'তুলসীদাস' 'ওয়াচাল' শব্দ ব্যবহার করলেও ও-শব্দের লৌকিক প্রচলন ঐ আউধী ভাষায় নেই।

আমাদের মাথা, মুণ্ডু, চোখ, মুখ, নাক, কান, গলা, বুক, পেট, উরু বা ঠ্যাঙ্-এর কোনও etymology নেই। etymology নেই বোবা, কালা, হাঁদা, খ্যাঁদা, ট্যারা, টের্‌চা, পেছ্‌লা কোনও শব্দেরই। ও-বস্তু আছে শুধু সংস্কৃত শব্দের। দেখে শুনে মনে হয় আমাদের ভাষার নিজস্ব সব শব্দই নেহাৎ-ই মুখ্যুদের বানানো। আর প্রাচীন কালের সংস্কৃত ও বৈদিক শব্দের সবই প্রচণ্ড সব পণ্ডিতদের তৈরী করে নেওয়া। ছিরিছাঁদ-না-থাকা শব্দগুলো উচ্চারণ করতে আমাদের আটকায় না। আটকানোর কথাও নয়। কারণ সত্যিকথা বলতে কি জীবন্ত ভাষার কোনও শব্দই শ্রুতিমাধুর্য বা ছিরিছাঁদের সার্টিফিকেট নিয়ে জন্মায় না। ওসব নেহাৎ-ই প্রকৃতিজ। আসলে ভাষার মৌলিক শব্দ স্বয়ম্ভূ। কে বানিয়েছিলেন—কবে বানিয়েছিলেন—সে প্রশ্ন অবান্তর। অনেকটা অপরিচর্যার আগাছা বা বনজ উদ্ভিদের মতন। মৌলিক শব্দ আপনা থেকেই হয়। কিংবা হয়ে থাকে। ভাষা মানে ঐ আগাছার কেয়ারী। পরিচর্যার ফসল নয়। পরিচর্যায় পরিভাষা তৈরী হয় ঠিকই তবে মৌলিক শব্দ নয়। মৌলিক শব্দ বানানোর ক্ষমতা পণ্ডিতদেরও নেই। সেসব শব্দ নিজের জোরেই বেঁচে থাকে। শ্রুতিমধুর হল কি হল না ঐ জাতের শব্দের তা বড় কথা নয়। সবাই মেনে নিলেন—সবাই বুঝে নিলেন—এইটাই সেসব শব্দের চালু থাকার পক্ষে বড় কথা। শ্রুতিমধুরতা নয়। আর তা নয় বলেই বেয়াড়া বিচিত্র সব উচ্চারণের শব্দ নিয়েই জীবন্ত ভাষার কারবার। শিক্‌নি-কে পণ্ডিতেরা সংস্কৃত সাজিয়ে শিঙ্ঘাণ বানিয়ে নিলেও কিছু এসে যায় না। লোকে ঐ বেয়াড়া উচ্চারণের আগের শব্দটাই বলবে—পণ্ডিতদের কসরৎ করে বানানো শব্দটাকে পাত্তাই দেবে না। মজার কথা এই যে পণ্ডিতেরা কিন্তু একবাক্যে বলেছেন ঐ শিঙ্ঘাণ-শব্দ

থেকেই আমাদের 'শিক্‌নি'র জন্ম হয়েছে। আজগুবি কথা আর কাকে বলে? বলার যুক্তিটা এই রকম: এটার etymology আছে—ও-টার নেই। এই না হলে পাণ্ডিত্য! বেয়াড়া উচ্চারণের বাংলা লৌকিক শব্দ থেকে শ্রুতিমধুর কম শব্দ অর্বাচীন সংস্কৃত ভাষায় বানানো হয় নি। বেঁটে→বণ্ঠ; বেঁড়ে→বণ্ড; বেঁটে দেওয়া→বণ্টন; লেজ→লঞ্জ (এবং লাঙ্গুল); র‍্যাঁদা→রন্ধ্র; ছ্যাঁদা→ছিদ্র, হাড়→হড্ড (অস্থি-শব্দটা যে আর্যতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার তাগিদে ল্যাটিন Osteo-র অনুকরণে তৈরী করে নেওয়া হয়েছিল এটা কি বলার দরকার আছে?)। পণ্ডিতেরা তীরচিহ্নগুলোর মুখ উল্টে দিয়ে আনন্দ পেয়েছেন। তাঁরা বলেছেন শ্রুতিমধুর সংস্কৃত শব্দগুলোর etymology আছে আর তাই শব্দের আদিরূপ নাকি ঐগুলোই। মজার কথা ছিরিছাঁদ-না-থাকা ঐ শব্দগুলোর মধ্য থেকে মুখ আর উরু অবিকৃত-ভাবেই আত্মীকৃত হয়েছে সংস্কৃতে, বাকি বেশ কিছু শব্দ কিছুটা 'সুকৃতি'র মধ্য দিয়ে সংস্কৃতে ঢুকেছে। কিছু শব্দ এতই বেয়াড়া উচ্চারণের যা থেকে সংস্কৃত শব্দ বানানোর কসরৎ নেপথ্য পণ্ডিতেরা করেন নি। তাঁরা 'মাথা'-কে 'মস্তক' বানালেন। মুণ্ডু-কে মুণ্ড: চোখ-কে চক্ষু; নাক থেকে বানানো হল নক্র, নাসা, নাসিকা। নাসা বা নাসিকার সঙ্গে নাক-এর যত না মিল তার চেয়ে ইংরাজী nose-এর মিলটা একটু বেশী। বলা বাহুল্য পেট বা ঠ্যাং নিয়ে ওঁরা এগোন নি। বুক থেকে বানানো হল বক্ষস্‌-শব্দটা (পণ্ডিতেরা জানালেন ঐ বক্ষস্‌-শব্দ থেকেই নাকি আমাদের বুক-এর আমদানি!)। ব্যবস্থাটা ভালোই। ক্ষ'-র কল্যাণে শব্দটা সংস্কৃত সেজে বসল। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আর এক ধাপ এগিয়ে জানালেন বুক-শব্দটা সংস্কৃত বৃক্ক (=kidney) শব্দ থেকে এসেছে। আজগুবি কথা আর কাকে বলে? বৃক্ক-শব্দটা 'সুপ্রাচীন' ঋগ্বেদে (১, ১৮৭, ১০) আছে। বলা বাহুল্য উদ্ভট অর্থযুক্ত হয়েই আছে। প্রশ্ন হল ঋ-অক্ষরটাই যে ভারতের কোনও লিপিতে আদিতে ছিল না। ঋ-ঘটিত সব শব্দই যে কৃত্রিম (বলা

বাহুল্য ঐ কৃত্রিম শব্দটাও)। তাহলে? ভারতের কোন ভাষার মৌলিক শব্দে কি ঐ ঋ আছে? নেই। কারণ ফোর্ট-উইলিয়ামে তৈরী করা ঐ অক্ষরটা নিছক কৃত্রিম সংস্কৃত শব্দ বানানোর তাগিদেই ব্যবহার করা হয়েছে। এটা সংস্কৃত ভাষার পেটেন্ট। সিদ্ধান্ত নিতেই হয় বৃক শব্দটা কৃত্রিম। আর ঐ শব্দ থেকে বুক-শব্দের ক্রমপরিবর্তনের গল্পটা নেহাৎই আজগুবি।

আমাদের যুগের পণ্ডিতেরা প্রচণ্ড পরিশ্রম-সহকারে যে-জাতীয় শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বানিয়ে নিয়েছেন প্রাচীনকালের লিপিহীন যুগের মুনি-ঋষিরা সেসবের চেয়ে অনেক ভালো শব্দ বানাতেন। বানাতেন উপনিষদ-মার্কা শব্দ। বানাতেন নিদিধ্যাসন-মার্কা শব্দ। ইংরাজী না-জানা ঐ মুনিঋষিরা ইংরাজী 'to sit' ক্রিয়া থেকে 'সদ্' ধাতু বানিয়ে নিয়েছিলেন। আর ঐ ধাতুর বাঁয়ে ডবল উপসর্গ আর ডাইনে উদ্ভট নামের প্রত্যয় যোগ করে ওঁরা কি সুন্দর ঐ 'উপনিষদ' শব্দটা তৈরী করে নিয়েছিলেন তা ভাবতেও অবাক হতে হয়। তবে চমক ভাঙ্গতে দেরী হয় না। বুঝে নিতে কষ্ট হয় না ঐ উপনিষদ, উপনিবেশ, নিদিধ্যাসন-মার্কা সব শব্দই ঐ ব্রিটিশ আমলেই বানানো হয়েছে। তার আগে কোনক্রমেই নয়। কারণ পবিত্র ঐ ভাষায় ইংরাজী, ফরাসী বা গ্রীক শব্দের ছায়ায় কম শব্দ তৈরী হয় নি। আর সেসব শব্দ ঐ প্রাচীন কালে বানানো সম্ভব ছিল না। বাঁয়ে উপসর্গ, ডাইনে প্রত্যয়, মধ্যিখানে ধাতু রাখার খেলার সূত্রে শব্দ বানানোর পুরো কর্মকাণ্ডই আধুনিক। প্রাচীন নয়। পণ্ডিতেরা ঐ কাণ্ডকে যতই প্রাচীন বলে চালাবার কসরৎ করুন না কেন ওসব নেহাৎই অর্বাচীন খেলা।

ঋগ্বেদের আগাডুম-বাগাডুম-মার্কা শ্লোক

ঋগ্বেদের কিছু 'ননসেন্স রাইম্‌স্'-এর নমুনা দেওয়া যাক

সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরীতু নৈতোশেব তুর্ফরী পর্ফরীকা।

উদণ্যজেব জেমনা মদেরূ তা মে জরায্বজরং মরায়ু (ঋ ১০, ১০৬, ৬)

দাঁতভাঙ্গা শব্দব্রহ্মের লীলাখেলা-মার্কা একটু অংশ দেখা যাক,

পজ্রেব চর্চরং জারং মরায়ু ক্ষদ্মেবার্থেষু তর্তরীথ উগ্রা

ঋভূ নাপৎখরমজ্রা খরজ্রর্ষায়ুর্ন পর্ফরৎ ক্ষরদ্রয়ীণাম্ ॥ (ঋ ১০, ১০৬, ৭)

ঋগ্বেদের ছন্দোবদ্ধ আগাডুম বাগাডুমের একটু নমুনা দেওয়া যাক,

ঘর্মেব মধু জঠরে সনেরূ ভগেবিতা তুর্ফরী ফারিবারম্

পতরেব চচরা চন্দ্রনির্ণিঙ্ মনঋঙ্গা মনন্যান্ জগ্মী (ঋ ১০, ১০৬, ৮)

শ্লোকগুলোর অনুবাদের অভিনয় কিছু করা হলেও বুঝতে কষ্ট হয় না ভূতাংশ ঋষির লেখা ওইসব ভূতুড়ে শ্লোকের কোনও মানেই হয় না।

ঋগ্বেদে ৩৩৩৯ সংখ্যক দেবতার উল্লেখ

ঋগ্বেদে দেবের সংখ্যা কত ? মাত্র তিন হাজার তিন শ' উনচল্লিশ। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৫২ সূক্তের ৬নং শ্লোকে পাচ্ছি :

"ত্রীণি শতা ত্রী সহস্রাণ্যগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসপর্যন্।"

শত-সহস্রের ছড়াছড়ি বেদে আছে, আছে অযুত-নিযুত অর্বুদও। গোলমাল যে ঐ সংখ্যাবাচক শব্দগুলোর মধ্যেই রয়েছে। শূন্য চিহ্নের আবিষ্কার কি তখন হয়েছিল? লিপিই ছিল না—শূন্য চিহ্নটাই বা থাকে কি করে? প্রশ্ন হল শূন্যের ধারণা সৃষ্টির আগে যে ঐ বিরাট বিরাট সংখ্যার ধারণা আসাটাই আজগুবি। তাহলে ?

ঋগ্বেদে 'শ্বশুর'-মশাইও আছেন

শোশুর বা তার ধারে কাছের উচ্চারণের শব্দ গুজরাত থেকে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে প্রচলিত উত্তর ভারতীয় সব উন্নত-ভাষাতেই আছে। আছে একই অর্থযুক্ত হয়ে। সে-সব শব্দের etymology নেই। থাকার কথাও নয়। লৌকিক কোন শব্দেরই তা থাকে না। ওটা 'মৃত'-ভাষার মনোপলি। সে যাই হোক, ধারে কাছের উচ্চারণের শব্দগুলোর মধ্য থেকে বেছে নেওয়া হল বাংলা 'শোশুর'-উচ্চারণটাকে।

কারণটা বলাই বাহুল্য। ঘষে মেজে সংস্কৃত হয়ে শব্দটার সংস্কৃত আকৃতি দাঁড়াল 'শ্বশুর'। ব্যুৎপত্তি একটা বানিয়ে না নিলে শব্দকে প্রাচীন সাজানো যায় না। সংস্কৃত সাজানো যায় না। তাই সে ব্যবস্থাও হল। ধাতুপ্রত্যয়গত জন্মরহস্য জানানোর যে আয়োজন হল তাতে শব্দটার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দাঁড়ালো—'যিনি খুব তাড়াতাড়ি খান'। ঠিক গুণবাচক না হলেও ব্যুৎপত্তিটাকে পণ্ডিতেরা মেনে নিলেন। সংস্কৃত-নামক মহান ভাষা-সৃষ্টির নেপথ্যশিল্পী আধুনিক বাঙ্গালী পণ্ডিতদের কৃপায় আমাদের 'শোশুর' শ্বশুর হয়ে বসলেন। শ্বশুর শব্দটা ঋগ্বেদেও আছে (১০, ২৮, ১)। আছে একই বানানে—একই অর্থ নিয়ে।

'শতেম-কেন্টুম'-তত্ত্বের মহিমা

ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা 'শতম্'-গোষ্ঠী আর 'কেন্টুম্' গোষ্ঠীর ভাষা নিয়ে অনেক আলোচনাই করেছেন। করেছেন বিভ্রান্তি সৃষ্টির ব্যবস্থা হিসাবেই। যে-যুগের প্রসঙ্গে ঐ তত্ত্বের অবতারণা তাঁরা করেছেন সে-যুগে ঐ শতম্ বা কেন্টুম্ শব্দের কি জন্ম হয়েছিল? আর একটা কথা। 'শতম'-গোষ্ঠীর ঐ সংস্কৃত ভাষায় 'কেন্দ্র'-শব্দটাই-বা চালু হল কোন্ যুক্তিতে? গ্রীক ভাষার কেন্ট্রন্-শব্দ চুরি করে যে আধুনিক সংস্কৃত ভাষার কেন্দ্র শব্দটা বানানো হয়েছে এই তথ্যটাই বা পণ্ডিতেরা প্রকাশ করেননি কেন? সংস্কৃত ভাষার অর্বাচীনত্ব প্রকাশ হয়ে পড়ায় ভয়েই কি ঐ ব্যবস্থা? তাইত আসছে।

এক মিথ্যাকে বাঁচাতে ছত্রিশ গণ্ডা মিথ্যা বানাতে হয়।

বৈদিক শব্দের ব্যুৎপত্তিতত্ত্ব-সম্বন্ধ নিরুক্ত ইত্যাদি বইগুলো যে অর্থহীন তা প্রকাশ করে বসেছিলেন বৈদিক যুগের কৌৎস ঋষি। বেদের শ্লোকগুলোর যে কোনও মানে হয়না—ওগুলো যে নেহাৎ-ই স্ববিরোধী কথায় বোঝাই 'sing-song rhapsodies of eccentric

magical maniacs' তা জানিয়ে দিয়েছিলেন ঐ কৌৎস ঋষি। বেদের অনুস্বার-বিসর্গ-চন্দ্রবিন্দু-লাঞ্ছিত এবং সন্ধির জটাজালে ঢাকা শব্দব্রহ্মের লীলাখেলা দেখে তন্ময় পণ্ডিতেরা গত একশ' বছরের সাধনায় যে সোজা কথাটা বুঝতে পারেননি তা মিথ্যার কারবারীরা তাঁদেরই বানানো একটি চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন। প্রশ্ন হল এই সত্যি কথাটা ওঁরা প্রকাশ করার ব্যবস্থা করে বসলেন কেন? এর দরকার ছিল বৈকি। প্রচণ্ড মিথ্যাকে বাঁচিয়ে রাখার এ-ও এক কায়দা। বৃহত্তর মিথ্যার ধূম্রজালে ঐ ছোট্ট সত্যি কথাটা যে চাপা পড়ে যাবে তা ওঁরা জানতেন। তাছাড়া কিছু সত্যি কথা বলারও দরকার পড়ে। দরকার পড়ে নানা রকম বিভ্রান্তি সৃষ্টির তাগিদে। বেদের ঐ-রকম কঠোর সমালোচনা যেযুগে হয়েছিল সেযুগে ঐ বেদটাই ছিলনা? তাই কি কখনও হয়? বেদ ছিল বলেই ত' তার সমালোচনার প্রশ্ন উঠেছিল। লোকে ত' তাই ভেবে নেবে। ব্যবস্থাটা খারাপ নয়। মজার কথা পণ্ডিতেরাও তাই ভেবে নিয়েছেন।

এ-রকম আর একটি উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। বৈদিক যুগের শেষে নাকি 'ষড়্‌দর্শন' লেখা হয়েছিল। সেসব দর্শনের কোনওটাতে ঐ বেদের মাহাত্ম্য স্বীকৃত হয়েছিল—কোথাও-বা তা হয়নি। প্রশ্ন হল বেদের 'তত্ত্ব' মেনে নিয়ে কিংবা মেনে না নিয়ে দর্শনগুলো লেখা হল আর ঐ বেদটাই ছিলনা? এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? আসলে বেদের প্রাচীন প্রচলনের গল্পটাকে প্রমাণসিদ্ধ বানানোর তাগিদেই যে ষড়্‌দর্শন লেখানোর ব্যবস্থা হয়েছিল এইটাই কেউ বোঝেননি। বোঝেননি প্রচণ্ড সব পণ্ডিতেরাও। অর্থহীন উল্লাসে ভুতুড়ে দর্শনের বন্যা বইয়ে দেওয়ার অভিপ্রায়ও যে ওঁদের ছিল এটা বলে রাখা ভালো। 'ওঁদের' অর্থে মিথ্যার কারবারীদের-ই বুঝতে হবে।

বেদটা লেখা হয়েছে উনিশ শতকে। সিদ্ধান্ত এসেই যায় তথাকথিত ষড়্‌দর্শনের জন্মও ঐ উনিশ শতকে। প্রাচীন যুগে নয়। প্রাচীন যুগে

হয়নি বেদাশ্রয়ী কোন গ্রন্থেরই জন্ম। বলা বাহুল্য জন্ম হয়নি কোন গ্রন্থেরই। কারণ তখন কোন লিপিরই জন্ম হয় নি।

প্রাচীন ভারতে শুধু কি ভাববাদী দর্শনেরই চর্চা হত? বস্তুবাদী দর্শনের কি নামগন্ধও তখন ছিলনা? এ-সন্দেহ আসা স্বাভাবিক। সে-সন্দেহ দূর করার ব্যবস্থা হল। ব্যবস্থা হল তথাকথিত 'চার্বাক দর্শন' লেখানোর। ব্যবস্থাটা বলাবাহুল্য ঐ মিথ্যার চক্রীদেরই। ভাববাদী দর্শনের খণ্ডন-মুণ্ডনের প্রচণ্ড উন্মত্ততার পাশাপাশি কট্টর বস্তুবাদী দর্শনেরও যে প্রকাশ ঐ যুগে ঘটেছিল তা জানানো হল। বানানো কর্মকাণ্ডের দরুন মিথ্যাটা পোক্ত হল। লোকে বুঝে নিল প্রাচীন ষড়্দর্শনত ছিলই—ছিল ঐ বস্তুবাদী দর্শনও। এবং যে বইটাকে ঘিরে দর্শনের এত মাতামাতি সেই বেদটাও ঐ প্রাচীন যুগে না থেকে পারেনা।

এক মিথ্যাকে বাঁচাতে ছত্রিশ গণ্ডা মিথ্যার আমদানি একেই বলে!

'শেষ'-সংবাদ

ছেলেদের জন্য কি কম চিন্তা করতে হয়? ভাবনার একশেষ—চিন্তার একশেষ যে ওদের জন্যই হতে হয়। সত্যি কথা বলতে কি শেষ হয়ে যেতে হয় ওদের কথা ভেবে ভেবেই। ঋগ্বেদ লেখার পশ্চাতে থাকা রসিক বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা son-অর্থে 'শেষ'-শব্দটা চালিয়ে দিলেন ঐ ঋগ্বেদে (১, ৯৩, ৪)। শেষ মানে পুত্র। তা না হয় হল কিন্তু শেষ বোঝানোর দরকারও তো ঋগ্বেদে পড়বে। তার কি হবে? সে-ব্যবস্থাও হল। শেষ-এর ইংরাজী end থেকে বানিয়ে নেওয়া হল আণ্ড বা আণ্ডা। 'শুষ্কস্যাণ্ডানি' বা 'আণ্ডা শুষ্কস্য' ঋগ্বেদে আছে (২।৪০।১০, ১১)। আছে 'শুষ্কের শেষ' অর্থে। হিন্দী 'আণ্ডা' থেকে সংস্কৃত অণ্ড-শব্দ তৈরী হয়েছিল আগেই তাই end অর্থে 'আণ্ডা'র 'সৃষ্টি'।

মূর্ধণ্য ষ চাপিয়ে সংস্কৃত সাজার চেষ্টা করলেও শেষ শব্দটা যে খাঁটি বাংলা এইটাই পণ্ডিতেরা বোঝার চেষ্টা করেন নি। উত্তর এবং পশ্চিম ভারতে শেষ-শব্দের লৌকিক প্রচলন নেই। চালু আছে খতম-শব্দটা। শেষ-শব্দটাকে চালু করার উদ্যোগ-আয়োজন ওখানকার কিছু লেখক যে নেন নি তা নয়। তবে তাতে কিছু কাজ হয়নি। পুরোদমে আগের শব্দটাই চলছে।

'যাজ্ঞবল্ক্য' ঋষির নাম-রহস্য

প্রাচীনকালে ভারতে মুনি-ঋষির অভাব ছিল না। এক ঋষির নাম ছিল যাজ্ঞবল্ক্য। ভদ্রলোক ছিলেন যজ্ঞবল্ক ঋষির পুত্র। পিতাও ছিলেন স্বনামধন্য। যজ্ঞ-অন্ত-প্রাণ ঐ যজ্ঞবল্কের যজ্ঞই নাকি বল্কের মত ছিল। পোষাক ছাড়া থাকা যায় না। যজ্ঞছাড়া যজ্ঞবল্ক ঋষিও থাকতে পারতেন না। বল্ক মানে কি? গাছের ছাল। এ-শব্দটা এল কোত্থেকে? ছাল-বাকল বাংলা ভাষায় ছিল ঠিকই। তবে ঐ বল্ক বা বল্কল কিছুই ছিল না। ছাল থেকে বানানো হলো সংস্কৃত ছল্লি। বাকল থেকে বল্ক বানানো যায় না। ঐ বল্ক বানানো হয়েছে ইংরাজী bark-শব্দ থেকে। রলয়োরভেদর খেলা খেলে ঐ bark সংস্কৃত বল্ক সেজে বসে আছে। যেন কতদিনের পুরানো শব্দ! ইংরাজদের ভারতে আসার আগে ঐ বল্ক শব্দের প্রচলন ভারতে হতেই পারে না। হওয়াটা বিশ্বাসযোগ্য নয় বলেই। যজ্ঞবল্ক শব্দের ওপর son-অর্থে ষ্ণ্য-প্রত্যয়ের খেলাটাও কম আশ্চর্যের নয়। কেউ বোঝেননি —এইটাই আশ্চর্যের। বাপের নামকে দুমড়ে মুচড়ে ছেলের নাম রাখার রেওয়াজ দুনিয়ার কোনও জীবন্ত ভাষায় নেই। আছে শুধু 'মৃত'-ভাষায়। আছে প্রাচীন গ্রীকে—আছে সংস্কৃতে। বলা বাহুল্য দুটোই মিথ্যার কারবারীদের তৈরী করে নেওয়া। ষ্ণ্য-প্রত্যয়ের মহিমা কেউ বোঝেন নি। আর বোঝেন নি বলেই ঋগ্বেদে পার্থিব-অপার্থিব সব শব্দই ঢুকে বসে আছে।

ঃ উপসংহার ঃ

অপৌরুষেয় পরিচয় দিয়ে কোনও কেতাব প্রকাশ করলেই তা সত্যি-সত্যিই অপৌরুষেয় হয়ে যায়না। হয়ে যায়না কারণ কথাটা অর্থহীন। শাশ্বত, সনাতন-মার্কা বিশেষণ চাপিয়ে দিলেও কোনও ধর্ম প্রাচীন বনে যায়না। ভিতরের ফাঁকিটা ধরে ফেললেই ঐতিহ্যের ফাঁপানো ফানুস ফেঁসে যায়। পণ্ডিতদের শত চেষ্টাতেও তা আটকানো যায়না। এমনকি ছুনিয়ার পণ্ডিত একসুরে কথা বললেও নয়। রাষ্ট্রপোষ্য নেপথ্য পণ্ডিতদের তৈরী করে নেওয়া ধর্মের বন্যা বইয়ে দেওয়ার চক্রান্তের নানান নাম। কোনওটা ঐ বাইবেল—কোনওটা ঐ বেদ—কোনওটা ঐ কোরান। মধ্যযুগের তথাকথিত 'শ্রীচৈতন্য', 'কবীর', 'নানক', 'তুকারাম'-দের বাণীগুলোও অন্য কিছু নয়। ওগুলো ঐ একই চক্রান্তের মধ্যযুগীয়-চিহ্নিত সংস্করণ। এত গেল ধর্মসম্পর্কিত চক্রান্তের কথা। মনীষার প্রাচীনীকরণের খেলাও কিছু কম হয়নি। কম হয়নি ইউরোপে। কম হয়নি ভারতেও। আসলে তথাকথিত 'রেনেসাঁস কালপর্ব' পরিচয় দিয়ে ইতিহাসের যে অধ্যায়টি আধুনিককালে সযত্নে রচনা করা হয়েছে সেই অধ্যায়টি গ্রীক এবং কিছুটা রোমক জাতির সেকুলার চিন্তাসমৃদ্ধ 'প্রাচীন' কেতাবের 'উদ্ধার' (আবিষ্কার ?)-এর মধ্য দিয়েই বানিয়ে নেওয়া হয়েছে। মজার কথা এই যে মনীষার প্রাচীনীকরণের উদ্যোগ-আয়োজনের অংশ হিসাবে ঐসব 'প্রাচীন' গ্রন্থের সবই লেখানো হয়েছে। লেখানো হয়েছে আধুনিককালেই। প্রাচীনকালে নয়। লেখানো হয়েছে ভাড়াটে পণ্ডিতদের দিয়ে। প্রাচীন ইতিহাস-দর্শন বা ভূগোল-বিজ্ঞান এবং তথাকথিত ক্লাসিকাল সাহিত্যের ষোল আনা অংশই আধুনিক কালে বানিয়ে নেওয়া। সক্রেটিস-ই বলুন, প্লেটো-অ্যারিস্টটলদের কথাই ধরুন, হোমার-ভার্জিল-দান্তেদের কথাই ধরুন—কেউ-ই ঐ প্রাচীনকালে ছিলেন না। প্রমাণ ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বলে রাখা ভালো তথাকথিত রেনেশাঁস-এর 'আবির্ভাব' ভারতে হয়েছে অনেক পরে। মজার কথা এই যে সে-'রেনেশাঁস'-এর মধ্য

দিয়ে সেকুলার চিন্তা-সমৃদ্ধ কেতাবের আবিষ্কার ভারতে ঘটেনি। ঘটেছিল নেহাৎ-ই ধর্মীয় গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ। উপনিষদ-বেদ-রামায়ণ-মহাভারত ইত্যাদির। সেকুলার চিন্তাসমৃদ্ধ গ্রন্থ বানানোর ব্যবস্থাও যে হয়নি তা নয়। তবে সেগুলো প্রকাশ করতে যথেষ্ট দেরী হয়ে গিয়েছিল। সে-চক্রান্তের ফলে তৈরী হয়েছিলেন 'আর্যভট' "বরাহমিহির" 'ব্রহ্মগুপ্ত'রা! দেরী হয়ে গিয়েছিল তথাকথিত কৌটিল্যের লেখা 'কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র'টা প্রকাশ করতেও। কৃত্রিম ভাষায় ঐসব বানিয়ে নিতে সময় একটু বেশীই নিতে হয়েছিল ভাড়াটে পণ্ডিতদের। জীবন্ত ভাষায় প্রতারণা করতে সময় কম নিলেই চলে। আর তা চলে বলেই সংস্কৃত মহাভারত 'রেডি' হওয়ার কিছু আগেই কাশীদাসী বাংলা মহাভারতটা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা রামায়ণ বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ প্রকাশের আগেই। ১৮০২ সালে কির্তিবাস (Kirttibass)-সাহেবের সম্পাদনায় ইংরাজী রামায়ণ প্রকাশিত হয়েছিল। পরে ঐ কির্তিবাসের নাম চুরি করে বাংলা রামায়ণের কবির নামকরণ হয়েছিল। হয়েছিল ঐ 'কৃত্তিবাস' নামের ব্যুৎপত্তির গল্প বানানোরও ব্যবস্থা। 'কৃত্তি'-র অর্থ নাকি গজাসুরচর্ম—আর 'কৃত্তিবাস' নাকি ঐ-'চর্ম'ধারী মহাদেবের প্রতিশব্দ। কৃত্তি-শব্দঘটিত আর কোনও শব্দ অভিধানে নেই। তা না থাক। মহাদেবের প্রতিশব্দ বানানোর জন্যই যেন শব্দটির জন্ম হয়েছিল! সত্যিইত শব্দের জন্মত ঐজন্যই হয়। ভালো কথা, 'বাল্মীকি'র লেখা সংস্কৃত রামায়ণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪৯ সালে। জনৈক ইটালীয় ভদ্রলোকের সম্পাদনায়। একই খেলা। কোথাও ফরাসী পণ্ডিতের নাম জড়ানোর ব্যবস্থা—কোথাও জার্মান পণ্ডিতের। কোথাও ঐ ইটালীয় পণ্ডিতের। ইংল্যাণ্ডের মিথ্যার কারবারীরা ব্যবস্থাটা ভালোই নিয়েছিলেন। সন্দেহ করে কার সাধ্য!

তথাকথিত বৈষ্ণব সাহিত্যের পুরোটাই ব্রিটিশ শাসনকালে বানানো। মধ্যযুগে নয়। মঙ্গলকাব্য সম্পর্কেও অন্য কিছু বলার উপায় নেই। তথ্য-প্রমাণ থাকবে এ-বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে।

সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনত্বের মিথ

মিথ-প্রচারে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভূমিকা

তিন চারশ' বছরে জীবন্ত একটি ভাষার খোলনলচে বদলে যায়। সংস্কৃত নামক একটি ভাষার সে-বিপদ ছিলনা। অক্ষত খোল আর সুরক্ষিত নলচে নিয়ে অবলীলায় সে-ভাষা তিন-চার হাজার বছর বেঁচেছিল। বাঁচতে পেরেছিল। অন্ততঃ পণ্ডিতদের তাই ধারণা। অক্ষয় অব্যয় শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে কালের ভ্রূকুটিকে তুচ্ছ করে সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরাদি কল্পিত যুগ পেরিয়ে আসাটা এ-ভাষার কাছে কোনও সমস্যাই ছিলনা। এ-ভাষার ক্রমপরিবর্তনের প্রয়োজন হয়নি—হয়নি ক্রমোন্নতিরও। কয়েক হাজার বছরের লিপিহীন নিরালম্ব অস্তিত্বের ম্যাজিকও সাহিত্য-সমৃদ্ধ এ-ভাষা দেখাতে পেরেছিল। পণ্ডিতেরা এই ম্যাজিকের নাম দিয়েছেন শ্রুতি-পরম্পরা। "যীশু খ্রীস্টের পর ১০০০ বৎসর পর্য্যন্ত বেদটা মুখে মুখেই থাকিত। শুধু বেদ নয় তার সঙ্গে যত অঙ্গ, বেদাঙ্গ, যত বেদলক্ষণ সব মুখে মুখেই থাকিত। লিখিলে পাপ হইত। জৈন ও বৌদ্ধদেরও শাস্ত্র মুখে মুখে থাকিত।" (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)

মুখে মুখে থাকতে থাকতেই ঐ ভাষাটা ভারতের মুখ্য ভাষা হয়ে উঠেছিল কিনা বলতে পারবনা। তবে এইটুকু বলা যায় সাক্ষাৎভাবে বেদাশ্রয়ী সাহিত্যই শুধু নয় মনুযাজ্ঞবল্ক্যাদির স্মৃতিগুলোও (আদৌ রচিত হয়ে থাকলে) স্মৃতির মণিকোঠায় রাখার দরকার পড়ত অর্থাৎ মুখে মুখে থাকত। পুরাণ সম্পর্কেও ঐ একই কথা (বলা বাহুল্য, আদৌ সেযুগে রচিত হয়ে থাকলে)। মজার কথা এই যে সেযুগে 'রচিত' হয়েছিল অথচ 'লিখিত' হয়নি এমন 'বই'-এর সংখ্যা প্রচুর। 'লিখিলে পাপ হইত' কথাটা অর্থহীন কারণ আসলে লেখার উপযোগী লিপির জন্মই তখনো হয়নি—তাই লেখা হয়নি। লেখার প্রশ্নটাও ছিল অবান্তর কারণ ওসব

বইয়ের কোনটাই তখনও 'রচিত' হয়নি। বেদ-বেদান্ত-স্মৃতি-পুরাণ মুখস্থ রাখার গল্পটা বানানো হয়েছিল যাতে ইতিহাসের ঐ ফাঁক ও ফাঁকিটা কেউ না ধরে ফেলেন। আধুনিক কালের লেখাকে প্রাচীন বলে চালানোর কাজে এর চেয়ে ভালো গল্প আর কি-ই বা বানানো যেত? বলে রাখা ভালো এ-ধরণের গল্প শুধু ভারতের জন্যই বানানো হয়নি। হয়েছিল অন্য অনেক ইতিহাসগর্বী দেশের জন্যও। হোমারের ইলিয়াড ও ওডিসি 'রচিত' হওয়ার চার শ' বছর পরে 'লিখিত' হয়েছিল। বলা বাহুলা, মুদ্রিত হয়েছিল আরও হাজার খানেক বছর পরে। একই খেলা। একটা ইউরোপীয়। অন্যটা ভারতীয়। ব্যবস্থাটা ভালো। বেদবেদান্তের প্রাচীনত্ব পোক্ত হল—বৌদ্ধ-জৈন ধর্মগ্রন্থেরও বয়সের গাছপাথর থাকল না। গাছপাথর থাকেনি ইলিয়াড-ওডিসিরও। সে যাই হোক, পণ্ডিতেরা 'বৃক্ষপ্রস্তরহীন বয়সবিশিষ্ট' বইগুলোর অনুশীলন-বিশ্লেষণ সবই করলেন। প্রাচীনত্ব সম্পর্কেও সন্দেহ প্রকাশ করলেন। বললেন: না, আরও অনেক বেশী প্রাচীন বলেই মনে হচ্ছে। সে যাই হোক, ভাষার প্রসঙ্গে ফেরা যাক। সংস্কৃত ভাষা কোনও কালে জীবন্ত ছিল না—তাই জীবন্ত ভাষার লক্ষণাক্রান্ত নয়। ভাষা মরে না—সংস্কৃত ভাষা মরার অভিনয় করে। যা কোনও কালে বেঁচে ছিলনা তার মরার প্রশ্ন ওঠেই-বা কি করে? জীবন্তভাষার বয়স যত বাড়ে সমৃদ্ধি তত ফুটে ওঠে। সংস্কৃত অতীতেই সমৃদ্ধ। অতীতেই লক্ষপতি সেজে বসে থাকা ঐ সংস্কৃতের মহিমা অতুল। অতীতে সমৃদ্ধ সংস্কৃত ভাষার মৃত্যুর গল্পটা ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদেরা কাজে লাগালেন। মৃতভাষায় 'অমৃত' পরিবেশন করার দায়িত্ব নিলেন। মৃতভাষার মাধ্যমে জালজালিয়াতি-জোচ্চুরি করার অনেক সুবিধা। এবং সুবিধা আছে বলেই দুনিয়ার অনেক 'মৃত'ভাষার জন্মের ব্যবস্থা তাঁরা করেছিলেন। করেছিলেন ঐসব 'মৃত'ভাষার উত্তরাধিকারী হিসাবে গর্ববোধ-করা কিছু ভাড়াটে পণ্ডিতদের সহযোগিতায়। বলা বাহুল্য, সে-সহযোগিতার বড় শর্ত ছিল গোপনীয়তা রক্ষা। সংস্কৃত নামক 'আজন্ম মৃত'ভাষা-সৃষ্টির আয়োজনও তাঁরাই করেছিলেন। বিশ্বাস

করতে কষ্ট হলেও এইটাই রূঢ় সত্য। এ-প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা এ-বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে 'সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টিরহস্য' 'শীর্ষক একটি পরিচ্ছেদে রাখব।

শাস্ত্রী মহাশয়ের ঐ উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে ফেরা যাক। যীশু খ্রীস্টের জন্মের আগে বা তার এক হাজার বছর পরে যে ঐ সংস্কৃত ভাষাটা লেখার ব্যবস্থা ছিল কিংবা হয়েছিল এমন প্রমাণও ত কিছু পাচ্ছিনা। আর একটা কথা। একজন মহাপুরুষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে একটি ভূখণ্ডের মানুষ প্রচলিত লিপি বাতিল করে বসবেন—এটা এমনই একটা আজগুবি কাকতালীয় গল্প যা বিশ্বাস করার প্রশ্নই ওঠেনা। যীশু খ্রীস্টের ঐতিহাসিকত্ব সম্পর্কে শাস্ত্রী মশাই এতটা স্থিরনিশ্চয় হলেনইবা কি করে? ঐ ভদ্রলোককে মহাকালের গ্রীনিজ বানানোর পশ্চিমী ব্যবস্থাকে এত গুরুত্বইবা তিনি দিতে গেলেন কেন? সবাই করে বসেছেন তাই তিনিও করে বসলেন? আসলে প্রচণ্ড পাণ্ডিত্যের ছদ্মবেশের আড়ালে শাস্ত্রী মশাই যে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছিলেন এটা বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। মিথ্যার কারবারীদের সঙ্গে শাস্ত্রী মশাই-এর যোগসাজস ছিল। আর তা ছিল বলেই 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়'-নামক প্রতারণা-সুনিশ্চয়টাকে নেপাল থেকে বয়ে এনে সজ্ঞানে বাংলা ভাষার আদিরূপ বানানোর কসরৎ তিনিই প্রথমে করেছিলেন। পণ্ডিত ঠকানোর উদ্দেশ্যে তৈরী করে নেওয়া বইটাকে তথাকথিত আলোআঁধারী সন্ধ্যাভাষায় লেখা বলে চালাবার চেষ্টা তিনি করেছিলেন মিথ্যার কারবারীদের সাকরেদ হিসাবেই। ইতিহাস-সম্পর্কে রাজ্যের বিভ্রান্তি আনার চেষ্টা তিনি কিছু কম করেননি। 'কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র'-নামক আর এক মহামহো-পাধ্যায়ের সম্পাদিত বিশশতকীয় প্রতারণাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর উদ্যোগ-আয়োজন নিয়েছিলেন মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মশাই স্বয়ং। বইদুটো যে নিছক প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয় তার প্রমাণ রাখব এ বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে। আসলে মহামহোপাধ্যায়দের ব্রিটিশ-বিরোধী ভূমিকা যে কারুরই ছিলনা এটা লক্ষণীয়।

বলে রাখা ভালো ঐ মহামহোপাধ্যায় নামক উপাধিটা কোনও বেসরকারী বিদ্বজ্জনসভার তরফ থেকে দেওয়া হতনা। দেওয়া হত সাক্ষাৎ সরকার বাহাদুরের তরফ থেকেই। ১৮৮৭ সালে প্রবর্তিত ঐ উপাধি পণ্ডিতদেরই দেওয়া হত—তবে বিশেষ জাতের পণ্ডিতদের। রাজ্যের মিথ্যাসৃষ্টির কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ভদ্রলোকেরাই ঐ উপাধি পেতেন। এঁদের নামডাকের অন্ত ছিলনা। সরকার বাহাদুরের স্ট্যাম্প্‌মারা নানান খেতাবের মধ্যে ঐ খেতাবটার পণ্ডিতি কৌলিন্য একটু বেশীই ছিল। রায়বাহাদুরদের অপকীর্তি-সম্পর্কে আমরা যতটা ওয়াকিবহাল এই মহামহোপাধ্যায়দের 'সুকীর্তি'-সম্পর্কে ততটা নই। আর তা নই বলেই শামা শাস্ত্রী, গণপতি শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীরা পণ্ডিতমহলে আদৃত হন। এঁদের কেউ কৌটিল্য-ঘটিত প্রতারণার সম্পাদনা করেছেন —কেউ ভাস-ঘটিত তঞ্চকতার। কেউ করেছেন কিমাশ্চর্য ঐ চর্যাচর্যের অমূল্যায়নের আয়োজন।

মিথ-প্রচারে ভাষাচার্যের ভূমিকা

ভাষাতত্ত্বসম্পর্কিত বেশ কিছু ইংরাজী বা জার্মান পরিভাষার বাংলা অনুবাদ ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় করেছিলেন। অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, স্বরভক্তি, বিপ্রকর্ষ ইত্যাদি বাংলা পরিভাষা গুলো সবই তাঁর সৃষ্টি। 'শব্দ'গুলো কিভাবে তিনি তৈরী করে নিয়েছিলেন তাও তিনি জানিয়েছিলেন তাঁর বইয়ে। ওসব 'শব্দ' যে তাঁরই তৈরী করা এ-সম্পর্কে কোনও প্রশ্নই ওঠেনা। মজার কথা এই যে তাঁর 'তৈরী করে নেওয়া' ঐ 'স্বরভক্তি'-শব্দটা প্রাচীন কালের লেখা বলে প্রচারিত একটি 'শিক্ষা' (Phonetics) গ্রন্থে ঢুকে বসেছিল। প্রশ্ন আসছেই। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তৈরী করা শব্দটা প্রাচীন কেতাবে কোন্ ম্যাজিকে ব্যবহার করা হল? প্রাচীন ঐ গ্রন্থ থেকে শব্দটা যে তিনি চয়ন করেছিলেন এমন মনে করার কোনও কারণই দেখছিনা। সে-রকম কিছু হয়ে থাকলে তিনি তা স্বীকার

করেননি কেন? প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সন্দেহজনক ব্যাপার সম্পর্কে কোনও কথা বলেননি কেন? তাঁরই তৈরী করা একটি শব্দ প্রাচীন কালের জনৈক উচ্চারণতত্ত্ববিদ্ ব্যবহার করে বসেছিলেন—এই তথ্যটি তিনি প্রকাশ করেননি কেন? তথাকথিত 'শিক্ষা'নামক বইয়ের প্রসঙ্গ পূর্বপ্রকাশিত অন্য বইয়ে আলোচিত হয়েছিল ঠিকই। তবে ঐ বইয়ের বস্তুত পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ঘটেছিল এই শতকের তিরিশের দশকে। তার আগে নয়। প্রশ্ন আসছেই। তবে কি ঐ 'শিক্ষা'র কিছু পরিভাষা রচনার দায়িত্ব ভাষাচার্য নিজেই নিয়েছিলেন? তাইত আসছে। আর একটা কথা। তাঁরই সম্পাদিত The Cultural Heritage of India-গ্রন্থের ভি. এম. আপ্তে-রচিত The Vedangas-প্রবন্ধে 'স্বরভক্তি' শব্দের প্রাচীন প্রয়োগের তথ্যটি পরিবেশিত হতে দেখেও তিনি কোনও মন্তব্য করেননি কেন? তবে কি মিথ্যার চক্রীদের সঙ্গে তাঁরও যোগসাজস ছিল? জানিনা। তবে এইটুকু বলতে পারি মিথ্যার কারবারীদের চক্রান্তে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন বড় মাপের পণ্ডিত। সকলেই ছিলেন দিক্‌পাল। বপ্, রাস্ক, ম্যাক্সমুলার কেউই কিছু কম ছিলেন না। সে যাই হোক, আসল কথায় আসা যাক। তথাকথিত সংস্কৃত বা বৈদিক ভাষাকে প্রাচীন বলে প্রচার করার কাজে ভাষাচার্যের ব্যক্তিগত অবদানও কিছু কম ছিলনা। বাংলা, ওড়িয়া বা হিন্দী লৌকিক শব্দ থেকে 'অলৌকিক' বৈদিক বা সংস্কৃত শব্দ বানানোর খেলার পরিচয় না দিয়ে ব্যুৎপত্তি-নির্দেশক তীরচিহ্নগুলোকে উল্টো মুখে রাখার ব্যবস্থা তিনিও কিছু কম করেননি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত ভাষাকে ভারতীয় আর্যভাষাগুলোর 'বৃদ্ধ বৃদ্ধ বৃদ্ধ বৃদ্ধ বৃদ্ধ বৃদ্ধ প্রপিতামহী' বলে চালাবার চেষ্টা করেছিলেন। সে-চেষ্টা করেছিলেন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও। সত্য হচ্ছে এই: সংস্কৃত ভাষাটা ঐসব ভাষার নেহাৎই দত্তককন্যা। মাতাও নয়—মাতামহীও নয়। বৃদ্ধ৬ প্রপিতামহী ত দূরের কথা। ভারতের অর্বাচীনতম

সংগঠিত ভাষার নাম ঐ সংস্কৃত। তুলনামূলকভাবে কিছুটা অসংগঠিত অর্বাচীন ভাষা আছে বেশ কয়েকটি—ঐ বৈদিক, পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ সবই। বুঝতে কষ্ট হয়না ভারতের 'মৃত' ভাষাগুলোকে প্রাচীন কালের জীবন্ত ভাষা বলে প্রচার করার মহান ব্রতে দুজনেই সামিল হয়েছিলেন। সামিল হয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদীদের তৈরী করা প্রচণ্ড মিথ্যাটাকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে। সামিল হয়েছিলেন—হয়ে আছেন দুনিয়ার তাবৎ ভাষাতাত্ত্বিক। কেউ বুঝে—কেউ না বুঝে। তৈরী করে নেওয়া আধুনিক বইগুলোর ওপর সাহেব পণ্ডিতেরা ABCD আরোপ করার খেলা খেলেছিলেন। কোনওটা অমুক ADর-কোনও-টা তমুক BCর বলে চালিয়ে দিয়েছিলেন। ভাবতে অবাক লাগে ওঁদের সেই খেলার ভাষাতত্ত্বগত সাক্ষ্যদানের ভূমিকা চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছিলেন। 'বৈদিক'-ভাষার রূপবৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করে সে-ভাষার প্রচলনের কালনির্ণয়ের ব্যবস্থাও তিনি করে-ছিলেন। করেছিলেন প্রচণ্ড মিথ্যাটাকে বিশ্বাসযোগ্য করার পণ্ডিতি খেলা দেখিয়ে। খেলাটা কেউ বোঝেননি এইটাই আশ্চর্যের।

মিথ-প্রচারে উইলিয়াম জোন্সের ভূমিকা

সতেরো শ' ছিয়াশি সালে এসিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশনে উইলিয়াম জোন্স সংস্কৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য (এবং প্রাচীনত্ব ?) সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রেখেছিলেন। বহুল-উদ্ধৃত সেই বক্তব্যের একটি অংশ রাখছি :

"The Sanscrit language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure ; more perfect than the Greek, more copious than the Latin and more exquisitely refined than either ; yet bearing to both of them a stronger affinity, both in the roots of verbs, and in the forms of grammer, than could possibly have been produced by accident ; so strong,

indeed, that no philologer could examine them all three, without believing them to have sprung from some common source, which, perhaps, no longer exists.……"

বক্তব্যটিকে ভারতের পণ্ডিতেরা লুফে নিয়েছেন। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে উদ্ধৃতিটা ব্যবহার করেননি এমন পণ্ডিতের সংখ্যা খুবই কম। সে যাই হোক, প্রণিধানযোগ্য ঐ বক্তব্য-সম্পর্কে কোনও পণ্ডিতই প্রশ্ন তোলেননি এইটাই আশ্চর্যের। বেশ কয়েকটি প্রশ্ন ত' এসেই যাচ্ছে। এক, সংস্কৃতভাষার রূপবৈচিত্র্য বা ঐশ্বর্য সম্পর্কে জোন্স-সাহেব এত সব 'তত্ত্ব' আবিষ্কার করলেন কি করে? ১৭৮৬ সালের আগে কি একখানা সংস্কৃত বই-ও প্রকাশিত হয়েছিল? এমনকি সংস্কৃত থেকে অনূদিত বলে প্রচারিত কোনও বই-ও কি ঐ সালের আগে প্রকাশিত হয়েছিল? তথাকথিত কিছু পুঁথির দুর্বোধ্য লেখা পড়ে তিনি এত সব সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন কি করে? দুই, ল্যাটিন, গ্রীক, গথিক বা কেল্টীয় ভাষার সঙ্গে ঐ সংস্কৃত ভাষার প্রচণ্ড মিল থাকার 'তত্ত্বে'র সমর্থনে দু-চারটে উদাহরণ দেওয়ার প্রয়োজনও তিনি বোধ করেননি কেন? 'তত্ত্ব' খাড়া করলেন অথচ তথ্য কিছুই দিলেননা—এরই-বা কারণ কি? তিন, ঐ 'তত্ত্বে'র সমর্থনে কিছু তথ্য সরবরাহ করার দায়িত্ব রাস্ক-সাহেব নিয়েছিলেন। প্রচণ্ড মিলযুক্ত শব্দের তালিকা তিনি হাজির করেছিলেন ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে; তার আগে নয়। প্রশ্ন আসছেই। তবে কি মিলযুক্ত ঐ সব শব্দ ১৭৮৬ থেকে ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ভাড়াটে পণ্ডিতদের দিয়ে বানিয়ে নেওয়া হয়েছিল? ইংরাজী ox থেকে উক্ষ বা জার্মান nocth থেকে নক্ত ইত্যাদি শব্দগুলো কি ঐ সময়েই বানানো হয়েছিল? চার, বক্তব্যটির প্রথমাংশে 'whatever be its antiquity'—এই বাক্যাংশটি লেখার প্রয়োজন জোন্স-সাহেব কেন বোধ করেছিলেন? তবে কি ঐ ভাষার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে তাঁর নিজেরই কিছু সংশয় ছিল? আর তা ছিল বলেই কি জ্ঞানপাপী ভদ্রলোক

সত্যিকথাটা বক্রভাবে ব্যবহার করেছিলেন ? পাঁচ, বেশ কিছু পণ্ডিত ঐ মূল্যবান উদ্ধৃতিটা ব্যবহার করার সময় প্রয়োজনীয় ঐ বাক্যাংশটা সযত্নে বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা কেন করেছিলেন ? ছয়, সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রীক ইত্যাদি ভাষার কল্পিত 'common source'-এর 'তত্ত্ব' জোন্স-সাহেব ঐ অভিভাষণে খাড়া করার চেষ্টা করলেও ঐ 'source'-এর নামটা তিনি প্রকাশ করেননি কেন ? তবে কি ঐ source-এর 'আর্য'-নামকরণ ঐ ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে হয়নি ? তবে কি প্রচলিত অর্থে 'আর্য'-শব্দের প্রয়োগ ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দের আগে হয়নি ? তাইত আসছে। 'আর্য'-শব্দটা জোন্স সাহেব ঐ সালের আগে ব্যবহার করেছিলেন ঠিকই। তবে তা করেছিলেন বিচিত্র একটি অর্থে। Aryavarta শব্দের ইংরাজী অর্থ তিনি করেছিলেন 'land of the virtuous men'। নিঃসন্দেহে মজার ব্যাপার। তবে কি land (=area ?) এবং virtuous (→ বর্ত ?) বানানোর খেলায় শব্দটা তৈরী হয়েছিল ? উচ্চারণানুগ সংস্কৃতীকরণের সূত্রেই কি ঐ 'আর্যাবর্ত' শব্দসৃষ্টির আয়োজন হয়েছিল ? তাই যদি না হবে তবে শব্দটির ওপর ঐ ধরণের উদ্ভট অর্থ চাপানোর আয়োজন হল কেন ? কোনও প্রশ্নেরই উত্তর পাচ্ছিনা। Scandinavia-থেকে স্কন্দনাভি বানানোর খেলা কি ১৭৮৬ সালেই শুরু হয়েছিল ? দিল্লীর ফিরোজশাহ স্মৃতিস্তম্ভের শিলালিপিতে 'আর্যাবর্ত' শব্দটি ছিল। তার অর্থ করা হয়েছিল 'The land of virtue or India'. উদ্ভট অর্থ আরোপের বহর এক্ষেত্রেই বা চাপানো হল কেন ? জাতি বা ভাষা-বোধক 'আর্য' শব্দ যদি তৈরী হয়েই থাকবে তবে ঐ ধরণের অর্থ চাপানোর দরকার পড়ল কেন ?

সিদ্ধান্ত নিতেই হয় আর্য-তত্ত্বের ইঙ্গিত ঐ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পরোক্ষ ভাবে জোন্স-সাহেব দিয়েছিলেন ঠিকই। তবে কল্পিত ঐ উৎস-জাতির (বা ভাষার) নামকরণ ঐ ১৭৮৬ সালেও হয়নি।

আসলে ইতিহাস-ঘটিত রাজ্যের মিথ্যাসৃষ্টির চক্রান্তের কেন্দ্র

হিসাবেই ঐ 'এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল'-এর জন্ম হয়েছিল। আর জোন্স-সাহেব ছিলেন ঐ চক্রান্তেরই একজন সরিক। সরিক ছিলেন ঐ উইলকিন্স, উইলফোর্ড, হ্যামিলটন ইত্যাদি অনেক পণ্ডিতই। এঁদের কর্মকাণ্ড-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা এ-বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে থাকবে।

স্বীকার করে নেওয়া ভালো বিরাট বিশাল সংস্কৃত (তথা পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ) সাহিত্যের অর্বাচীনত্ব সম্পর্কে তথ্যপ্রমাণ এ-বইয়ের ক্ষুদ্র পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়। কিছু ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করেছি। বিস্তৃত প্রমাণ এ-বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে থাকবে। সংস্কৃত ভাষার জন্মের ইতিহাস, শব্দসৃষ্টির রহস্য এবং গঠনতত্ত্ব-সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনার প্রয়োজন অস্বীকার করার উপায় নেই। সে-আলোচনা থাকবে দ্বিতীয় খণ্ডে। সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনত্বের মিথটাকেই প্রকাশ করব। ঐ ভাষা থেকে উদ্ভূত কিংবা ঐ ভাষার উৎস বলে প্রচারিত অন্যান্য মৃত-ভাষার প্রচলনের প্রচলিত তথ্যগুলো যে নেহাৎ-ই আজগুবি তা ঐ সংস্কৃত ভাষা-সম্পর্কিত আলোচনার মধ্য দিয়েই প্রকাশ করব।

———

পরিশিষ্ট

A থেকে ব্রাহ্মীলিপির অ

A → A → H → H

B থেকে ঐ লিপির ব

B → B → □

C থেকে ঐ লিপির চ

C → d → d

D থেকে ঐ লিপির দ

D →) →)

E থেকে ঐ লিপির এ

E → ⊏ → ⊏ → ▷

F থেকে ঐ লিপির ফ

F → ⊢ → b → b

(লিপিচিত্র ১)

রোমক লিপিমালার প্রথম ছটা অক্ষর থেকে তথাকথিত ব্রাহ্মীলিপির ছটা অক্ষরের ক্রমপরিবর্তনের ছক। রোমক লিপি থেকে সমউচ্চারণবিশিষ্ট ব্রাহ্মী অক্ষর সৃষ্টি করা হয়েছে ঐ কটাই। অন্য ক্ষেত্রে চুরি করা 'ব্রাহ্মী' অক্ষরের সঙ্গে রোমীয় উৎসলিপির উচ্চারণগত ঐক্য নেই। উৎস : ভারতীয় প্রাচীন লিপিমালা (হিন্দী) লেখক—গৌরীশংকর হীরাচাঁদ ওঝা। (দেখুন—পৃষ্ঠা ৪১)

(লিপিচিত্র ২)

অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	ৠ	ঌ	এ	ঐ	ও	ঔ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ

ঝ	ঞ	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন	প	ফ	ব	ভ	ম	য	র	ল	ব	শ	ষ	স	হ	ং

ব্রাহ্মী লিপির স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ। (উৎস : সংস্কৃত বর্ণমালার ইতিহাস—লেখক—রবীন্দ্রনাথ ঘোষঠাকুর।)

(লিপিচিত্র ৩)

সাবীয়	ব্রাহ্মী	খরোষ্ঠী	আরামিক	আধুনিক ইউরোপীয়

আধুনিক ইউরোপীয়: A B C D E F(W) Z H TH I K L M N X(SH) O P S Q R S T

রোমকলিপির সম-উচ্চারণপ্রকাশক সাবীয়, ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী ও অ্যারেমিক প্রতিরূপ। বলা বাহুল্য প্রথম চারটি লিপির সবই মিথ্যার চক্রীদেরই সৃষ্টি। [উৎস : বিজ্ঞানের ইতিহাস (১ম খণ্ড)। লেখক—সমরেন্দ্রনাথ সেন।]

রোমক লিপির J=গুপ্ত-লিপির ৮
„ „ C= „ „ ৫০
„ „ O= „ „ ২০

'পাল'-যুগের ২=রোমক লিপির 3
„ „ ৪= „ „ G
„ „ ৫= „ „ 5 (একটু কায়দা করা)
„ „ ৭= „ „ 7
„ „ ৯= „ „ 5
„ „ ১০= „ „ O

'সেন' যুগের ২ =রোমক লিপির 3
„ „ ৪ =„ „ G বা S বা C
„ „ ৫ =„ „ 5
„ „ ৭ =„ „ Y

বুঝতে কষ্ট হয় না বাঙ্গালী জাতির প্রাচীনযুগের মহিমার বাহনগুলোও ধৌত তুলসীপত্র নয়। ভেবে অবাক হতে হয় ঐসব প্রামাণ্য (?) লিপির ওপর নির্ভর করেই আমাদের বিশ্বাসভাজন ঐতিহাসিকেরা মূল্যবান সব তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছেন।

'প্রাচীন লিপি প্রসঙ্গ'—অধ্যায়ে ৩৯ পাতায় লিখেছি, 'ব্রহ্মার হামলার হাত থেকে বেঁচেছিল রোমক লিপির মাত্র পাঁচটা অক্ষর'। এই তালিকা দেখার সূত্রে বক্তব্যটিতে কিছু সংযোজনের প্রয়োজন এসে যাচ্ছে। সংযোজনটা এই রকম : ব্রহ্মার হাত থেকে বাঁচলেও রোমক লিপির G এবং R অক্ষর দুটো তাঁর 'উত্তরসূরী'দের কাছ থেকে রেহাই পায়নি।

ব্রাহ্মীলিপি থেকে উদ্ভূত বলে প্রচারিত লিপিমালাগুলোর সংখ্যা-চিহ্ন হিসাবে বাংলা লিপিও কিছু কম ব্যবহার করা হয়নি। বাংলার এ, ও, উ, ঔ, ক, খ, ড, থ, ক্ষ, ক্ষ্‌, ১, ২, ৬, ৭, ৯ সবই ব্যবহার করা হয়েছে। লিপিঘটিত জালিয়াতির নেপথ্যকাণ্ডে বাঙ্গালী 'শিল্পী' কি কিছু বেশী ছিলেন? তাই ত' মনে হচ্ছে।

(লিপিচিত্র ৫)

অ অ ই উ উ এ এ ও অং ক খ

খ গ গ ঘ চ চ চ ছ জ জ ঝ

ঝ ঞ ঞ ট ট ট ঠ ঠ ড ঢ ঢ

ণ ণ ত থ দ দ ধ ন ন ন ন

প প প ফ ফ ব বঁ ভ ম ম ম

য য র র ল ল র র শ শ শ

ষ স হ হ হ কি পি মি শি সি গু

খরোষ্ঠী লিপিমালা (পৃষ্ঠা ৫৫ দেখুন)
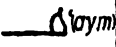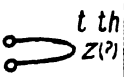
বলে রাখা ভালো খরোষ্ঠী লিপির যথার্থ প্রতিফলন এই তালিকায় হয়নি। মোটামুটি একটা ধারণা আনার জন্যই তালিকাটা দিয়েছি। ঐ লিপি-সম্পর্কে নিখুঁত ধারণার জন্য মৌলিক গ্রন্থ দেখে নেওয়ার দরকার আছে। এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকার খরোষ্ঠী লিপি-সম্বলিত খণ্ডগুলোতেই ঐ লিপির আলোকচিত্র পাওয়া যাবে। (উৎস : অশোকের বাণী। লেখক—ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার।)

(লিপিচিত্র ৬)

আহো খ্রীঃ পূঃ ১৮শ শতাব্দী	শাফাৎবাল খ্রীঃ পূঃ ১৭শ শতাব্দী	আসদ্রুবাল খ্রীঃ পূঃ ১৪শ শতাব্দী	অহিরাম খ্রীঃ পূঃ ১৩শ শতাব্দী	ইয়েহিমিল্ক খ্রীঃ পূঃ ১২শ শতাব্দী	আবিবা'ল খ্রীঃ পূঃ ১০ম শতাব্দী	এলিবা'ল খ্রীঃ পূঃ ১০ম শতাব্দী	মোয়াবাইট-ফলক খ্রীঃ পূঃ ৯ম শতাব্দী	ফিনিশীয় (সাইপ্রাস) খ্রীঃ পূঃ ৭ম শতাব্দী	প্রাথমিক গ্রীক বর্ণমালা	আধুনিক ইউরোপীয়
										A
										B
										G
										D
										H
										W
										Z
										KH
										TH
										Y
										K
										L
										M
										N
										S
										O
										P
										TS
										Q
										R
										SH
										T

ফিনিশীয় লিপির শতাব্দীওয়ারী রূপভেদ। গ্রীকলিপির সামান্য কিছু রূপ-বদল করে 'লিপি'-গুলো বানিয়ে নেওয়া হয়েছে। দুনিয়ার লিপিতাত্ত্বিকদের অনেকেই এই সোজা কথাটা চেপে গিয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত সেজে বসে আছেন।

(লিপিচিত্র ৭)

(হায়রোগ্লিফিক লিপির নমুনা। বিশেষণে সবিশেষ নামের ঐ লিপিতে লেজ-ওলা পাখীর সুদৃশ্য সম্মুখচিত্র আছে। আছে পার্শ্বচিত্রও। আছে লেজ-কাটা পাখীর ছবিও। আধুনিক উদ্ভাবন ঐ লিপিতে আছে ত্রিভুজ, আছে বর্গক্ষেত্র, আছে অর্ধচন্দ্র-চিহ্নও। লিপিটা যে জালিয়াতি তা কি বুঝে নিতে কষ্ট হয় ?) একই অক্ষর দিয়ে দু-রকম বা তিনরকম উচ্চারণ প্রকাশ করার বিচিত্র ব্যবস্থাও আছে বৈকি।

(লিপিচিত্র ৮)

হায়রোগ্লিফিক
হায়রেটিক
ডিমোটিক

(তথাকথিত ইজিপ্টীয় লিপির সার্থকনামা রূপভেদের আয়োজনও হয়েছিল। ‘সুপ্রাচীন’ ঐসব লিপিতে রোমক লিপির P B I h F N 3 ও ছোট হাতের টানা লেখার উল্টো L সবই ছিল যেমন ছিল ওঁদের তৈরী করে নেওয়া সুপ্রাচীন তাবৎ লিপিতেই।)

(লিপিচিত্র ৯)

প্রাচীন ফিনিশীয়	l	m	n	s	c	p	ts	q	r	sh	t

প্রাচীন ফিনিশীয়	ʔ	b	g	d	h	w	z	kh	lh	y	k

প্রাচীন ফিনিশীয় লিপির নমুনা

(লিপিচিত্র ১০)

	অশোক লিপি	নানাঘাট লিপি	নাসিক লিপি
১	I	—	—
২	II	=	=
৩			≡
৪	+	¥¥	¥
৫			
৬			
৭		?	7
৮			
৯			
১০		∝∝∝	∝∝
২০		O	θ
৩০			
৪০			
৫০			
৬০			
৭০			

	অশোক লিপি	নানাঘাট লিপি	নাসিক লিপি
৮০			
৯০			
১০০			
২০০			
৩০০			
৪০০			
৫০০			
৭০০			
১০০০		T	
২০০০			
৩০০০			
৪০০০			
৬০০০			
৮০০০			
১০০০০			
২০০০০			

ব্রাহ্মীলিপির সংখ্যাচিহ্ন (পৃষ্ঠা ৬২ দেখুন)

(লিপিচিত্র ১১)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
I	II	III	X	IX	IIX	IIIX	XX
১০	২০	৪০	৫০	৬০	৭০	৮০	
?	3	33	?33	333	?333	3333	
১০০	২০০	৩০০	১২২	২৭৪			
?I	?II	?III	II3?I	X?333?II			

খরোষ্ঠী লিপির সংখ্যাচিহ্ন (পৃষ্ঠা ৬২ দেখুন)

লিপিচিত্র (৭ থেকে ১১) সমরেন্দ্রনাথ সেন লিখিত বিজ্ঞানের ইতিহাস (১ম খণ্ড) থেকে গৃহীত।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

(লিপিচিত্র ১২)

মোহেন-জো-দড়ো এবং নানান দেশের রূপগত সাদৃশ্যযুক্ত কিছু প্রাচীন অক্ষর।

নির্দেশিকা :

১ ব্রাহ্মী, ২ মোহেন-জো-দড়ো, ৩ ইষ্টার আইল্যাণ্ড ৪ প্রাচীন এলাম, ৫ মিশর, ৬ সুমের, ৭ক্রীত।

(আলোচনা-দ্রঃ পৃঃ ৯১)

(উৎস : প্রাগৈতিহাসিক মোহেন্ - জো - দড়ো — লেখক : কুঞ্জ গোবিন্দ গোস্বামী।)

(লিপিচিত্র ১৩)

তামিল-ব্রাহ্মী লিপির স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ

(উৎস : Tamil Epigraphy—লেখক : এন্ সুব্রাহ্মনিয়ান ও আর ভেঙ্কটরামন।)

VOWELS

a ā i,ī i,ī u ū e o

CONSONANTS

k ṅ c ñ ṭ ṇ t n p m

y r l v ḻ ḷ ṟ ṉ dh s

কিছু সংযোজন

‘ভগবান’-এর সৃষ্টিরহস্য

ভগবান শব্দটা অর্বাচীন। তৈরী করে নেওয়া ভগ-শব্দের অর্থ যা তাতে ঐ ভগবান শব্দটা অর্থহীন হয়ে পড়ে। আর তা অর্থহীন হয়ে পড়ে বলেই God শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ হিসাবে অভিধানে দেব, ঋভু, পরমেশ্বর ইত্যাদি নানান শব্দ রাখা হলেও ঐ ভগবান শব্দটা রাখা হয়নি। রাখা হয়নি কারণ শব্দটা রাখার কিছু অসুবিধা ছিল। রাখা হয়নি ঈশ্বর-শব্দটাও। কারণ ঐ শব্দটা ১৭৮৪ সালেও তথাকথিত শিব বা মহাদেবের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। অবশ্য Goddess-অর্থে ভগবতী শব্দটা অভিধানে আছে। কারণটা বলাই বাহুল্য। আসলে ভগবান-এর ধারণা মোটেই পুরানো নয়। ধারণাটা যদি সত্যিই পুরানো হত তবে ঐ অর্থজ্ঞাপক লৌকিক শব্দ ভাষাগুলোতে নিশ্চয়ই থাকত। লৌকিক শব্দ কোনও ভাষাতে নেই বলেই কি বরচ্ বা বতুপ্-প্রত্যয়-সমৃদ্ধ সংস্কৃত শব্দ বানানোর তোড়জোড় শুরু হয়েছিল? ভারতের তাবৎ ভাষায় ঐ ভাব প্রকাশ করার তাগিদে সংস্কৃত শব্দের শরণাপন্ন হওয়ারই বা দরকার পড়ল কেন? প্রত্যয়সমৃদ্ধ সব শব্দই-যে অর্বাচীন। তাহলে? সিদ্ধান্ত নিতেই হয় ভগবান-এর ধারণা নিতান্তই আধুনিক। আর তা ঐ ইউরোপীয় ভাড়াটে পণ্ডিতদের মস্তিষ্ক-প্রসূত। দেশে দেশে ধর্মের বন্যা বইয়ে দেওয়ার চক্রান্তের অংশ হিসাবেই ঐ ভগবান-ভাবনার ‘উদ্ভব’।

স্বর্গ-নরকের ধারণার জন্ম কবে?

স্বর্গ-নরকের ধারণাটা ভারতের মানুষের ছিল না। ইউরোপ থেকে আমদানী-করা ঐ ‘তত্ত্ব’ ইউরোপের ভাড়াটে পণ্ডিতদের তৈরী করে নেওয়া নানান সব ধর্মের উপাদান হিসাবে ভারতে এসে হাজির হয়েছিল। হাজির হয়েছিল আধুনিক কালেই। প্রাচীন কালে নয়। তত্ত্ব এলেই হয়না। তত্ত্বের নাম দেওয়ার দরকার পড়ে। সে-ব্যবস্থাও হল। ‘দিব্বি’ আরামের জায়গা কল্পিত

heaven শব্দের সংস্কৃতায়ন হল দিব্ (স্ত্রীং), দ্যাবা ইত্যাদি শব্দসৃষ্টির মধ্য দিয়ে। সংস্কৃত ভাষা বলে কথা। শব্দের বেশ কিছু প্রতিশব্দ না থাকলে সংস্কৃত বলে মনেই হয়না। আরও কিছু বানিয়ে নিতে হল। বানানো হল স্বর্গ। বানানো হল শব্দটির ব্যুৎপত্তির বহরও। ব্যুৎপত্তি যাই বানানো হোক না কেন বুঝতে কষ্ট হয়না ঐ স্বর্গ শব্দটা একটা বাংলা লৌকিক অশ্লীল শব্দের সংস্কৃত ছদ্মবেশ। বলে রাখা ভালো ইংরাজী heaven শব্দের ব্যুৎপত্তি বানানোর কসরৎও ওদেশের পণ্ডিতেরা করেছেন। আধুনিক ঐ শব্দের প্রাচীন উৎস খোঁজার খেলা ওঁরা খেলেছেন একই পরিকল্পনায়। নরক-শব্দটা বাংলায় চালু ছিল। চালু ছিল মনুষ্যবিষ্ঠা-অর্থে। 'নরক কুন্ডু' শব্দটা আগেও চালু ছিল। এখনও চালু আছে। চালু আছে ঐ অর্থে। The most wretched place-মার্কা অর্থবহ hell-এর সংস্কৃত প্রতিশব্দ তৈরী হল নরক। 'নরককুন্ডু' শব্দের অদ্ভুত বানানটা লেখার কারণ আছে বৈকি। ণ্ড-অক্ষরটা আদিতে বাংলা লিপিতে ছিলনা। ছিলনা উত্তর ভারতের কোনও ভাষার লিপিতেই। ছিলনা কারণ মূর্ধন্য-ণ-ঘটিত উত্তর ভারতীয় সব শব্দই আধুনিক। সংস্কৃত ভাষা বানানোর কাজে ঐ 'ণ'-এর অবদান কম নয়। বলে রাখা ভালো মূর্ধন্য-ণ-এর উচ্চারণ দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলোতে ছিল এবং আছে। আছে ঐ উচ্চারণ বোঝানোর অক্ষরও ঐসব ভাষার লিপিতে। ভাবতে অবাক লাগে সংস্কৃত ভাষার বিদিগিচ্ছিরি বিকৃতির মাধ্যমে তৈরী করে নেওয়া তথাকথিত প্রাকৃত ভাষাগুলোতে ঐ মূর্ধন্য-ণ-এর ছড়াছড়ি। ভাষাগুলো যে কত প্রাচীন তা কি বুঝে নিতে কষ্ট হয়? আর একটা কথা। ১৮৪৩ সালের আগে একটি প্রাকৃত বই-ও প্রকাশিত হয়নি কেন? বিস্তৃত আলোচনা এ-বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে করা যাবে।

সিন্ধুলিপিতে 'ভয়'-শব্দের ব্যবহার হয়েছে !!

সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার করার চেষ্টায় তৎপর পণ্ডিতের সংখ্যা কম নয়। এঁদের উদ্যমের প্রশংসা করতেই হয়। শ্রীশঙ্কর হাজরা ঐ লিপির মধ্য থেকে বেশ কিছু সংস্কৃত শব্দ আবিষ্কার করে নিয়েছেন। আবিষ্কার করেছেন 'ভয়'-শব্দটাও। মজার কথা এই যে ঐ 'ভয়'-শব্দটা খাঁটি বাংলা শব্দ। গোমোর পশ্চিমের কোনও ভাষায় ঐ শব্দের লৌকিক ব্যবহার নেই। আভিধানিক অস্তিত্ব আছে ঠিকই। ওসব ভাষায় দু-একজন যে শব্দটা ব্যবহার করেননা তাও নয় তবু বলব

ওসব ভাষায় 'ডর' শব্দটাই চালু। ভয় নেই—আছে ডর। ডর শব্দ বাংলা ভাষায় আছে। আছে ভয়ডর যুগ্মশব্দ হিসাবে। শুধু ডরও চলে। এমনকি চট্টগ্রামে ঐ ডর-শব্দেরই চল বেশী। সে যাই হোক, ডর শব্দ সংস্কৃত ছদ্মবেশে হল 'দর'। বলে রাখা ভালো ভয় শব্দটাও সংস্কৃতে আছে । সর্বভারতীয় ভাষা বলে কথা। নানান অঞ্চলের লৌকিক শব্দের 'শঙোশ্‌কার'-এর মধ্য দিয়েই যে ঐ ভাষার সুবিপুল শব্দভাণ্ডার গড়ে উঠেছে। ডর-কে 'দর' না বানালে কি চলে? প্রশ্ন হল মোহেন্-জো দড়োর সুপ্রাচীন অধিবাসীরা কি সংস্কৃত-ভাষী ছিলেন? ঐ ভাষার জন্মই যে তখনও হয়নি। তাহলে?

দুটি প্রাচীন (?) সংস্কৃত শব্দের জন্মরহস্য

প্রাচীন ভারতে নাকি 'চতুরাশ্রম'-এর ব্যবস্থা ছিল। পণ্ডিতেরা সকলেই তা মেনে নিয়েছেন। দিকপাল সব ঐতিহাসিকও ঐ আজগুবি তথ্যটির ওপর নানান কায়দায় আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। এক প্রস্থ বনে অবস্থান করার কল্পিত ব্যবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে 'বানপ্রস্থ'। এক পোশ্‌তো (→ প্রস্থ) থাকা বা খাওয়া বাংলা বাগ্বিধি-সম্মত। বাংলার বাইরে ওই ধরণের বাগ্বিধি কেউই অনুসরণ করেননা। ওটা একান্তভাবেই বাঙ্গালীর নিজস্ব। বুঝে নিতে কষ্ট হয়না তথাকথিত মনু বা বৈবস্বত ছদ্মনামের আড়ালে থাকা কোনও ভাড়াটে পণ্ডিত বানপ্রস্থ শব্দ বানিয়ে নিয়ে নিজের বাঙ্গালীয়ানাই জাহির করে বসেছেন। তথাকথিত 'সভ্য আর্যসন্তানেরা' কস্মিনকালেও বনেজঙ্গলে থাকতেননা। এখনও থাকেননা। একপ্রস্থ থাকার প্রশ্নটা নেহাৎ-ই আজগুবি।

অরাজকতা-বোধক 'মাৎস্যন্যায়' শব্দসৃষ্টির পিছনেও যে বাঙ্গালী পণ্ডিতের অবদান ছিল তা বুঝে নিতে কি কষ্ট হয়? বাংলা 'মাছ' সংস্কৃত কলেবরে হল 'মৎস্য'। মতন বা সদৃশ অর্থে ন্যায়-শব্দটা খাঁটি বাংলা। এ-শব্দের লৌকিক ব্যবহার বাংলামুলুকের অন্যত্র না থাকলেও বা কমে গেলেও নৈহাটী-ভাটপাড়া বা চুঁচুড়া-চন্দননগরে এখনও চালু আছে। সাধু বাংলায় ন্যায়-শব্দটা অনেকেই ব্যবহার করেছেন। করেছেন অন্যায়-এর বিপরীত শব্দ হিসাবে—এমন কি সদৃশ অর্থেও। বিদ্যাসাগরের লেখাতেও ঐ দ্বিতীয় অর্থে শব্দটির ব্যবহার পাচ্ছি। প্রশ্ন হল এ-হেন খাঁটি বাংলা শব্দ দিয়ে তৈরী মাৎস্যন্যায়-শব্দটা কোন্ যাদুবলে কৌটিল্য ব্যবহার করে বসলেন? তিনি কি বাঙ্গালী ছিলেন? ইতিহাসে সে-

রকম কোনও তথ্য নেই। সিদ্ধান্ত এই: অর্থশাস্ত্র নামক মতলবের রচয়িতাদের মধ্যে বেশ কিছু বাঙ্গালী ভাড়াটে পণ্ডিত ছিলেন। এবং তাঁরা কেউই ঐ প্রাচীন কালের নন। আধুনিক যুগেরই। কারণ ঐ সংস্কৃত ভাষাটাই তৈরী হয়েছে আধুনিক যুগে। প্রাচীন যুগে নৈব নৈব চ। (সদৃশার্থক 'ন্যায়'-শব্দ সংস্কৃতে নেই)

জোন্স-সাহেবের কীর্তি

ব্যাসের লেখা সংস্কৃত কাব্য প্রসঙ্গে জোন্স সাহেব এক জায়গায় লিখেছেন:

"If we may form a just opinion of the Sanscrit poetry from the specimens already exhibited, (though we can only judge perfectly by consulting the originals,) we can not but thirst for the whole work of Vyasa, with which a member of our Society, whose presence deter me from saying more of him, will in due time gratify the public."

ব্যাসের লেখার কিছু নমুনাই দেখেছিলেন জোন্স-সাহেব। তাও 'অরিজিনাল' নয়। তাতেই তিনি ব্যাসের পুরো লেখা দেখার জন্য অধীর আগ্রহ প্রকাশ করে বসেছিলেন। আগ্রহ প্রকাশ করা ছাড়া আর কিই-বা তিনি করতে পারতেন? ওসবের কিছুই যে তখনও পর্যন্ত লেখা হয়ে ওঠেনি। সোসাইটির অন্য এক সভ্যের পরিচালনায় ওসবই যে তখন 'তৈরী করা' শুরু হয়েছে। ১৮৩৬ সালের আগে যে সংস্কৃত মহাভারতের প্রথম অংশও প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশিত হয়েছিল ভীষ্ম-পর্বের শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা অংশটা। তাও সংস্কৃতে নয়। ইংরাজীতে। ১৭৮৪ সালে জোন্স সাহেব গীতার ফারসী অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন—এমন একটা তথ্য পাচ্ছি তাঁরই লেখা থেকে। তারপরে তস্য ইংরাজী 'অনুবাদ'। পরে সংস্কৃত অনুবাদের ব্যবস্থা!

ব্রজভাষা সম্পর্কে জোন্স-সাহেব এক জায়গায় লিখেছেন:

"Five words in six, perhaps, of this language were derived from the Sanscrit."

প্রচণ্ড মিথ্যাটা লিখতে জোন্স-সাহেব সম্ভবত কিছু সংকোচ বোধ করেছিলেন। আর সে-সঙ্কোচেরই প্রতিফলন হয়েছে ঐ perhaps শব্দের মধ্য দিয়ে।

আসলে ব্রজভাষায় সংস্কৃত বা সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন শব্দ ঐ অনুপাতে ছিলনা। থাকার প্রশ্নটাই ছিল অবান্তর। ছিল ঠিক ততটুকুই যতটুকু আধুনিক সংস্কৃত ভাষায় রূপ বদলে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। ঐ অনুপাতে তথাকথিত তৎসম বা তদ্ধিত শব্দের ব্যবহার আশা করা যায় কেবল বাংলা এবং ওড়িয়া ভাষায়। অন্য কোনও ভাষায় নয়। কারণটা বলে নিই। সংস্কৃত ভাষার শব্দসম্পদের বেশীর ভাগই তৈরী হয়েছিল বাংলা বা ওড়িয়া লৌকিক শব্দের অবিকৃত আত্মীকরণ বা সংস্কার-সাধনের মধ্য দিয়ে। কিছু অংশ যুৎসই হিন্দী শব্দ থেকেও যে বানানো হয়নি তা নয়। দু-একটা উদাহরণ দেওয়া যাক √ পুছ্ (হি) → √ প্রচ্ছ্ (সং); উতর্না (হি) → অবতরণ (সং); হিন্দী কুন্‌জি (=চাবি) → কুঞ্চিকা (সং); ধেয়ান (হি) → ধ্যান (সং) ইত্যাদি।

সংস্কৃত ভাষায় পর্তুগীজ শব্দ ঢুকল কি করে ?

বাংলা শব্দের সংস্কার করতে গিয়ে পর্তুগীজ ভাষা থেকে আসা কিছু বাংলা শব্দকেও সংস্কৃত সাজানো হয়েছিল : Kerane (পঃ) → কেরানী (বাং) → করণিক (সং); Veranda (পঃ) → বারান্দা (বাং) → বরংড (সং) ইত্যাদি। পর্তুগীজ শব্দ ভারতে প্রাচীনকালেই এসে হাজির হয়েছিল এটা বিশ্বাস করতে কিছুটা কষ্ট হয়। সিদ্ধান্ত এসেই যায় সংস্কৃত শব্দ বানানোর পুরো খেলাটাই আধুনিক। খেলাটাকে প্রাচীন বলে চালাবার কাজে পণ্ডিতেরা যত পাণ্ডিত্যই দেখাননা কেন সত্য প্রকাশ হয়েই পড়ছে। সত্য হচ্ছে এই : সংস্কৃত ভাষাটা আদৌ কোনও প্রাচীন ভাষা নয়।

প্রাচীন পুঁথি নাকি ভূর্জপত্রে লেখা হত। ভূর্জ শব্দটা এল কোত্থেকে? ইংরাজী birch-শব্দের সংস্কৃত ছদ্মবেশ যে ঐ ভূর্জ-শব্দটা। তাহলে? প্রাচীন বলে সাজালেই কিছু প্রাচীন হয়ে যায়না। Curling hair → কুরল (সং) !!!

আসলে বিক্রীতমস্তিষ্ক বেশ কিছু পণ্ডিতের যৌথ প্রয়াসে এবং নানান রাষ্ট্রের আর্থিক সহযোগিতায় প্রাচীন যুগের ইতিহাস নামক রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন হয়েছিল। সে-যজ্ঞের একটি বাইপ্রোডাক্ট ঐ সংস্কৃত নামক ভাষা। চোখ ধাঁধানো তার রূপ কিন্তু পুরোটাই জাল। প্রাচীন সাজানো আধুনিক প্রতারণা। বিপ্রলব্ধ পণ্ডিতেরা বোঝেননি এইটাই দুঃখের।

গ্রন্থপঞ্জী (২য় অংশ)

India and the Pacific World—Kalidas Nag
The Scholar Extraordinary
—Nirod C. Choudhury
A History of Bengal Before and After the
Plassey (1739—1758)—Luke Scraffton
Rig-Veda-Samhita—H. H. Wilson
Asiatic Researches (Vol. I)
Publisher—BHARAT BHARATI, Baranasi
English Sanskrit Dictionary—V. S. Apte
সংস্কৃত বর্ণমালার ইতিহাস—রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর
বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি—নৃপেন্দ্র গোস্বামী
অশোকের বাণী—দীনেশচন্দ্র সরকার
বঙ্গীয় শব্দকোষ (১ম ও ২য় খণ্ড)—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাগৈতিহাসিক মহেঞ্জোদাড়ো—কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী
শব্দকল্পদ্রুম—স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব
ঋগ্বেদ সংহিতা (১ম ও ২য় খণ্ড)—রমেশচন্দ্র দত্ত
বিজ্ঞানের ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড)—সমরেন্দ্রনাথ সেন।
হিন্দুসভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য—ডঃ অতুল সুর
সিন্ধুসভ্যতার স্বরূপ ও অবদান—ডঃ অতুল সুর
বাংলার ইতিহাস (১ম খণ্ড)—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
বিশ্বকোষ—নরেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত
প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
ভাষার ইতিহাস—মুরারীমোহন সেন
অশোক লিপি—অমূল্যচন্দ্র সেন
বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১২	কেরলপুত্র*	এই শব্দটি বাদ যাবে
৩	১	অণ্বেষণের	অন্বেষণের
৫	৮	উপনিষদ	উপনিষদ কি লেখা হয়নি ?
১৫	২৫	নিঃছিদ্র	নিশ্ছিদ্র
২৪	৫	নিশ্চদ্র	ঐ
৩০	১৩	সুপ্রাচীন	প্রাচীন
৬৩	২১	'ইকা'র	'মিকা'র
৩৮	২২	• =	⊙ =
৪৯	৩	ব্রাহ্মী	দক্ষিণী ব্রাহ্মী
„	৫	ব্রাহ্মী 'য'	ঐ লিপির 'য'
৫৮	৫	বানানো	ওসব লিপির সবই বানানো
৫৯	১৪	ব্রাহ্মী-খরোষ্ঠী ও	ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী
৭০	২৩	হায়েরোগ্লিফিক	ইজিপ্টীয়
৭৯	৩	আঁকতে গেলেন	আকতে গেলেন কেন ?
৮১	১৫	যাদুঘর	যাদুঘর ?
৮৮	২১	':ষিশ্লেষণ'	'বিশ্লেষণ'
৯৭	৬	monosyllafic	monosyllabic
১০৭	২১	তিবির	টিবির
১০৯	১০	বাইরের	বাইরের দেশগুলোর
	১২	কাজ করেছিল	ছিল
১২৪	১৬	বিকল্পে	বিকারে
১৩০	২	নক্তম্…ঋতম্… ঋতম্	নক্ত…ঋত…ঋত
১৪৩	৮	ঐ ঋগ্বেদে	অথর্ববেদে
১৫৭	১৮	Neo	New
১৯২	২৩	nocth	nacht
VI	8	S. Know	S. Konow